বিশ্ব নবীর সাহাবী

৬

তালিবুল হাশেমী

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর সাহাবী

৬ষ্ঠ খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশ্‌দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৩৫

১ম সংস্করণ

রবিউস সানি	১৪১৮
ভাদ্র	১৪০৪
আগষ্ট	১৯৯৭

বিনিময় ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHA NABIR SAHABI 6th Volume by Talibul Hashemy. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Taka 110.00 Only.

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

'বিশ্বনবীর সাহাবী' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি বিনয়াবনত চিত্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদের এই প্রয়াস কবুল করেন।

সাহাবী কারা ছিলেন ? এবং তাদের মর্যাদাই বা কি ? বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী-সাথীরা ছিলেন সাহাবী। তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা) স্বয়ং বলেছেন, "আসহাবী কাননুজুম বিআইয়্যিহিম ইকতাদাইতুম ইহতাদাইতুম" অর্থাৎ আমার সব সাথী তারকা সদৃশ। অতএব, তোমরা তাদের কাউকে অনুসরণ করলে হেদায়াত পাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিশ্বনবীর সাহাবীদের জীবনী অনুসরণ করার তৌফিক দিন এবং হেদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ দিন।

'বিশ্বনবীর সাহাবী' গ্রন্থের ছ'টি খণ্ডে ২২০জন সাহাবীর (রা) জীবনী স্থান পেয়েছে। পূর্ববর্তী পাঁচটি খণ্ড পাঠকদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এই খণ্ডটিও সমাদৃত হবে। গ্রন্থটির মূল লেখক তালিবুল হাশেমীকে আল্লাহ তা'য়ালা মহান প্রতিদান দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তা অবশ্যই আমাদের গোচরীভূত করবেন। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করা হবে।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

ঢাকা, ১২ই ভাদ্র, ১৪০৪ সাল
২৩শে জমাদিউস সানি, ১৪১৮
২৭শে আগষ্ট, ১৯৯৭ সন।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. হযরত ইকরামা (রা) বিন আমর মাখযুমী	১১
২. হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ ছাকাফী	২৭
৩. হযরত ফিরাসুল (রা) আকরা' তামিমী	৩৪
৪. হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়ের মুযনি	৪৪
৫. হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ আমেরী	৫৭
৬. হযরত মিহজা' (রা) বিন সালেহ	৬১
৭. হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী	৬২
৮. হযরত খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ সাহমী	৬৩
৯. হযরত দিমাদুল আযদী (রা)	৬৪
১০. হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ তামিমী	৬৬
১১. হযরত যাহির (রা) বিন হারাম আশজায়ী	৬৮
১২. হযরত আমর (রা) বিন সুরাকাহ আদভী	৬৯
১৩. হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারী	৭০
১৪. হযরত জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসুজ জুরকি আনসারী	৮৯
১৫. হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত আনসারী	৯১
১৬. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) আনসারী	১০৪
১৭. হযরত নুমানুল আ'রাজ (রা) আনসারী	১২৪
১৮. হযরত বারা' (রা) বিন মা'রুর আনসারী	১২৫
১৯. হযরত বিশর বিন বারা' আনসারী (রা)	১২৯
২০. হযরত আওস (রা) বিন ছাবিত আনসারী	১৩১
২১. হযরত আনাস (রা) বিন মালিক আনসারী	১৩২
২২. হযরত মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী	১৫৪
২৩. হযরত নুমান (রা) বিন মালিক আনসারী	১৫৬
২৪. হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারী	১৫৭
২৫. হযরত হারিছ (রা) বিন সিমমা আনসারী	১৭৪
২৬. হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারী	১৭৭
২৭. হযরত আনাস (রা) বিন নযর আনসারী	১৮৬
২৮. হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর আনসারী	১৮৯
২৯. হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখার আনসারী	১৯৪
৩০. হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ আনসারী	১৯৬

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩১. হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর আনসারী	২০০
৩২. হযরত মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ আনসারী	২০৪
৩৩. হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী	২০৫
৩৪. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের আনসারী	২১১
৩৫. হযরত খাওয়াত (রা) বিন জুবায়ের আনসারী	২১৩
৩৬. হযরত কুতবাহ (রা) বিন আমের আনসারী	২১৪
৩৭. হযরত খাল্লাদ (রা) বিন সুয়ায়েদ আনসারী	২১৬
৩৮. হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারী	২১৮
৩৯. হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক আনসারী	২২০
৪০. হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযার আনসারী	২২৪
৪১. হযরত জালবিব (রা) আনসারী	২২৬
৪২. হযরত সালমাহ (রা) বিন সালামাহ আনসারী	২২৯
৪৩. হযরত হানজালা (রা) বিন আবি আমের আনসারী	২৩৩
৪৪. হযরত মুনযির (রা) বিন আমর আনসারী	২৩৪
৪৫. হযরত আমর (আল উছাইরিম) (রা) বিন ছাবিত আশহালী	২৩৬
৪৬. হযরত মায়ান (রা) বিন আদি বালবী	২৪০
৪৭. হযরত তালহা (রা) বিন আল বারা' আনসারী	২৪৩
৪৮. হযরত কায়েস বিন সায়াদ সায়েদী (রা)	২৪৬
৪৯. হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) আনসারী	২৫৬
৫০. হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনা আনসারী	২৫৮
৫১. হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ বালবী	২৬০
৫২. হযরত সায়াদ্র (রা) বিন হাবতা (রা) বাজলী	২৬৪
৫৩. হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ আনসারী	২৬৬
৫৪. হযরত ইবাদ (রা) বিন কায়েস আনসারী	২৭০
৫৫. হযরত আমর (রা) বিন আখতাব আনসারী	২৭১
৫৬. হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ বালবী	২৭৩
৫৭. হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম আনসারী	২৭৭
৫৮. হযরত যিয়াদ (রা) বিন সাকান আশহালি	২৭৯
৫৯. হযরত আম্মারাহ (রা) বিন যিয়াদ (রা) আশহালি	২৮০
৬০. হযরত ছা'লাবা (রা) বিন গানমাহ আনসারী	২৮১
৬১. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ (রা) আনসারী	২৮২
৬২. হযরত আবু উসায়েদ (রা) আনসারী	২৮৬
গ্রন্থপুঞ্জি	২৮৭

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত ইকরামা (রা) বিন আমর মাখযুমী

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযানে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। সেই সময়ের কথা। একদিন অর্ধবয়েসী এক ব্যক্তি সংশয় চিত্তে বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র আবাসস্থলে হাজির হলেন। তাঁর ওপর দৃষ্টি পড়তেই প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র চেহারা হাস্যোজ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির দিকে এত দ্রুততার সাথে অগ্রসর হলেন যে, পবিত্র চাদর শরীর থেকে পড়ে গেল। অতপর তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন ঃ

"হে বিদেশী সওয়ার সুস্বাগতম
হে বিদেশী সওয়ার সুস্বাগতম।"

সেই ব্যক্তি পাশে দন্ডায়মান এক নিকাব পোশ মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ ! সে জানতে পেরেছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ " সে সত্য বলেছে। তোমার জন্য নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।"

হুজুরের ইরশাদ শুনে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। তিনি লজ্জায় মাথা নীচু করলেন এবং কোমল স্বরে এই আরজ করলেন ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক। তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আপনি তার বান্দাহ ও রাসূল। আল্লাহর কসম, আপনি সকল মানুষের মধ্যে উত্তম, সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী ও আমানতদার এবং সবচেয়ে বেশী কথা ও প্রতিশ্রুতি পূরণকারী। নিসন্দেহে আপনি আমাদেরকে সবসময় হকের প্রতি আহ্বান করেছেন। হে আল্লাহর রাসূল! এর পূর্বে আমি বহুবার নিজের কঠোরতা ও ইসলাম দুশমনীর প্রমাণ দিয়েছি। আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও নির্যাতনের জন্য আমি সকল কিছুই করেছি। এখন আমার আশা, আজ পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যে শত্রুতা করেছি, যত যুদ্ধ আপনার বিরুদ্ধে লড়েছি, হক পথে যত বাধা আরোপ করেছি এবং যেসব অকথ্য কথা আপনার সামনে ও পেছনে বলেছি তা সব আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করুন।"

www.bjilibrary.com

রহমতে আলম (সা) সেই সময়ই হাত তুললেন। আসমানের দিকে তাকালেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যত ধরনের শত্রুতা আমার সাথে করেছে তার সেই সকল প্রচেষ্টা ও সেনা অভিযান যা তোমার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য করেছে এবং তার সেই সকল কথা যা সে আমার সামনে ও পেছনে আমার সম্মান হানির জন্য বলেছে তা সব ক্ষমা করে দাও।"

প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র মুখে এই দোয়া শুনে সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জানামতে যে কথা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, আল্লাহর ওয়াস্তে তা আমাকে শিখিয়ে দিন। যাতে আমি সবসময় তার ওপর আমল করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "সত্য অন্তরে (অর্থাৎ নিজের কথা ও কাজে) আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ ও আমার আবদিয়াত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকো।"

সেই ব্যক্তি অত্যন্ত আবেগের সাথে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি আজ পর্যন্ত যত সম্পদ দাওয়াতে হক প্রসারে বাধা দানের জন্য ব্যয় করেছি তার চেয়ে দ্বিগুণ এখন আল্লাহর পথে ব্যয় করবো এবং যত লড়াই আমি হকের বিরুদ্ধে লড়েছি এখন আল্লাহর পথে তার থেকে দ্বিগুণ জিহাদ করবো।"

প্রিয় নবী (সা) তাঁর এই প্রতিশ্রুতি ও আবেগের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর ধৈর্য ও স্থৈর্যের জন্য পুনরায় দোয়া করলেন। যখন সেই ব্যক্তি রাসূলের (সা) নিকট থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে বিগলিত ধারার অশ্রু এবং তার চেহারা ঈমানী নূরে এমন উজ্জ্বল ছিল যে তার ওপর দৃষ্টি রাখা যাচ্ছিল না।

এই ব্যক্তি যাঁর ইসলামের আস্তানায় উপস্থিতিতে প্রিয় নবীর (সা) সীমাহীন আনন্দ ও খুশীর কারণ হয়েছিল এবং যার মাগফিরাতের জন্য সাকিয়ে কাওসার (সা) নির্ভাবনায় দোয়ার হাত প্রসারিত করেছিলেন—তিনি ছিলেন ইসলামের মশহুর দুশমন আবু জেহেল তনয় ইকরামা (রা)।

হযরত ইকরামা (রা) সেইসব সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন যারা জাহেলী যুগে ইসলামের শত্রুতায় নজিরবিহীন ছিলেন। কিন্তু

www.bjilibrary.com

ইসলাম গ্রহণের পর নিজের ঈমানী আবেগ, আন্তরিকতাপূর্ণ আমল এবং ত্যাগ ও কুরবানীর এমন চিহ্ন বা ছাপ ইতিহাসের পাতায় এঁকে দিয়েছেন যে তার আলো আজ পর্যন্ত বিশ্বে ঝলমল করছে।

কুরাইশের মশহুর শাখা বনু মাখযুমের সাথে হযরত ইকরামা (রা) সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। জাহেলী যুগে কুরাইশরা যে সামরিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল তাতে সেনাবাহিনীর সৈনাপত্য এবং সামরিক ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনা করার দায়িত্ব বনু মাখযুমের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল। এদিক থেকে ইমারাত ও হুকুমাত হযরত ইকরামার (রা) ঘরের বাদী ছিল। নসবনামা হলো ঃ

ইকরামা (রা) বিন আমর (আবু জেহেল) বিন হিশাম বিন মুগিরা বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখজুম বিন ইয়াকজা বিন মুররা বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত ইকরামা (রা) ইসলামের সেই দুশমনের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন যে ছিল কুরাইশ মুশরিক নেতা। মুশরিকদের পক্ষ থেকে 'আবুল হিকাম' লকব শুনে সেই দিমাগী ব্যক্তির গর্ব এবং অহংকার আরো বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বদ দিমাগ, গর্ব, অহংকার এবং ইসলামের শত্রুতার কারণে হক পন্থীরা তাঁকে "আবু জেহেল" খিতাব দিয়েছিলেন। সেই খিতাব এমনভাবে মশহুর হয় যে, আবু জেহেলের আসল নাম আমর বিন হিশাম সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবহিত। আবু জেহেল মহানবীর (সা) ওপর নির্যাতন চালানো এবং হকের আওয়াজ দাবিয়ে দেয়ার জন্য অব্যাহতভাবে তেরটি বছর পর্যন্ত যে ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়েছিল তা তার কঠোর হৃদয় ও দুর্ভাগ্যের বাস্তব প্রমাণ এবং ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়। আবু জেহেলের জীবনের এই পটভূমি ছিল যে, বদরের যুদ্ধে যখন সে নিহত হলো এবং তার অপবিত্র মাথা হুজুরের (সা) সামনে আনা হলো তখন তিনি অকৃতিমভাবে তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আখযাকা ইয়া আদুয়াল্লাহ (সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি হে আল্লাহর দুশমন তোকে অপমানিত করেছেন।)" তারপর তিনি বললেন ঃ "মাতা ফিরআ'উনু হাজিহিল উম্মাতি" অর্থাৎ এই উম্মাতের ফিরআ'উন মারা গেছে। হযরত ইকরামা (রা) সেই আল্লাহর দুশমন পিতার প্রশিক্ষণে লালিত পালিত হয়েছিলেন। স্পষ্টত তিনি কুফর ও শিরকপূর্ণ পরিবেশে অবধারিতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতা শুধুমাত্র স্বগোত্রের সরদারই ছিল না বরং একজন সফল ব্যবসায়ীও ছিলো এবং তার গৃহে ছিল চিত্ত-বৈভবের ছড়াছড়ি। সে ইকরামাকে (রা) অত্যন্ত আদর যত্নে লালন পালন

www.bjilibrary.com

করলো এবং তাঁকে নিজের রঙে রঞ্জিত করার জন্য সামান্যতম ত্রুটিও করলো না। সেই সঙ্গে সে তার পুত্রের দৈহিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করলেন যে, যখন তিনি বড় হলেন তখন পাহলোয়ানী, তীরন্দাজী, তরবারী চালনা, বর্শা চালনা এবং অশ্বারোহণে নিজের গোত্রের গর্ব হিসেবে পরিগণিত হতেন। ইসলাম দুশমনিতেও তিনি নিজের পিতার বাহু হিসেবে প্রমাণিত হলেন এবং বছরের পর বছর পর্যন্ত তাঁর দৈহিক শক্তি, বীরত্ব এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শীতা হক উৎখাতে ব্যয় হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে তিনি পিতার সাথে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় হযরত মুয়াজ (রা) বনি হারিছ আনসারী [যাঁকে মুয়াজ (রা) বিন আফরাও বলা হয়] আবু জেহেলকে গুরুতরভাবে আহত করলেন। এ সময় ইকরামা (রা) পিতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হযরত মুয়াজের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারী দিয়ে তার বাহু কেটে ফেললেন। হযরত মুয়াজ (রা) সেই অবস্থায় ইকরামার মুকাবিলায় রুখে দাঁড়ালেন। ইকরামা তাঁর ঈমানী আবেগ সহ্য করতে না পেরে নিজের ঘোড়া দৌড়িয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

বদরের যুদ্ধের পর যারা মক্কার মুশরিকদেরকে বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উত্তেজিত করেছিল তাদের মধ্যেও ইকরামা (রা) অগ্রগামী ছিলেন। বস্তুত ওহোদের ময়দানে তিনি মুশরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় অফিসারদের অন্যতম ছিলেন। ওহোদের গিরিপথে হুজুর (সা) পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে এই লক্ষ্যে মোতায়েন করেছিলেন যে, মুশরিকরা সেই পথ অতিক্রম করে মুসলমানদের পেছনের দিক থেকে যাতে হামলা করে বসতে না পারে। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুশরিকরা পরাজিত হলো এবং গিরিপথে মোতায়েন অধিকাংশ তীরন্দাজ স্ব স্ব স্থান ছেড়ে দিল। তখন এই ইকরামা (রা) ও খালিদই (রা) ছিলেন যারা মুসলমানদের সেই দুর্বলতাকে আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং স্ব বাহিনীসহ সেই গিরিপথ অতিক্রম করে মুসলমানদের ওপর প্রচন্ডবেগে হামলা করে বসলো। সেই হঠাৎ হামলার কারণে হকপন্থীদেরকে মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। কথিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে ইকরামা (রা) মুশরিকদের বাম দিকের অফিসার ছিলেন এবং তিনি নিজের স্ত্রীকেও হাওদায় সওয়ার করিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সঙ্গে এনেছিলেন।

পঞ্চম হিজরীতে আরবের মুশরিক ও ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করে ইসলামের কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসলো। তখন ইকরামাও (রা) বনু কিনানাকে উত্তেজিত করে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুব উৎসাহের সাথে অংশ নিলেন।

www.bjilibrary.com

৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (সা) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখিত হয়। সেই সন্ধিপত্রের একটি শর্ত এও ছিল যে, কোন কবিলা যদি উভয় পক্ষের মধ্য থেকে কারোর মিত্র হয়ে যায় তাহলে অপর পক্ষ তাকে কোন ক্ষতি করবে না এবং মুকাবিলায় তার দুশমনেরও সাহায্য করবে না। এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বনু খাযায়া মহানবীর (সা) সমর্থন লাভ করলো এবং বনু বকর সমর্থন পেলো কুরাইশের। এই দুই গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিলো। ১৮ মাস তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অতিক্রম করলো। কিন্তু তারপর বনি বকর একদিন হঠাৎ করে বনু খাযায়ার উপর হামলা করে বসলো এবং অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে তাদের শিশু ও মহিলাদের পর্যন্ত হত্যা করলো। এমনকি হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকেও তারা তরবারীর আঘাত থেকে রেহাই দিল না। এই হত্যা ও লুটতরাজে কুরাইশের কয়েকজন সরদার বনু বকরকে সাহায্য করলো। এই সরদারদের মধ্যে ইকরামাও (রা) ছিলেন। এমনিভাবে তারা হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা বাস্তবত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তাদের এই তৎপরতা মক্কায় মুসলমানদের আক্রমণ করার কারণ হয়েছিল। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মহানবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জামাতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তখনো ইকরামা (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ একত্রিত হয়ে মুসলমানদের একটি দলকে বাধা দান করে। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর প্রবল স্রোতের সামনে তারা টিকতে পারলো না এবং নিজেদের ২৪ জনের লাশ ফেলে রেখে পিছু হটে গেল। মক্কা মুয়াজ্জামা জয়ের পর হুজুর (সা) চাইলে কুরাইশ মুশরিকদেরকে কেটে কুচি কুচি করাতে পারতেন। কারণ, এরাতো সেই লোকই ছিলো যারা বিশ্বনবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর নির্যাতন চালানোর প্রশ্নে সামান্যতম দ্বিধাও করেনি। বিশ্বনবীকে (সা) দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল। তারপর মদীনাতেও সাত বছর পর্যন্ত হকপন্থীদেরকে শান্তির সাথে বসতে দেয়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন দয়ার সাগর এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর দয়ার আত্মা তাদের ধ্বংস করাকে সহ্য করতে পারলো না। বরং তাঁর করুণা তাদের ওপর এমনভাবে বর্ষিত হলো যে, সাধারণ ও অসাধারণ সকলেই সামর্থ অনুযায়ী ফয়েজ প্রাপ্ত হলেন। এসব লোকের মধ্যে ইকরামার (রা) স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা) বিনতে হারিছও ছিলেন। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরই তিনি রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্বয়ং ইকরামা (রা) হুজুরের (সা) সামনে আসতে সাহস পাননি। নিজের অতীতের প্রেক্ষাপটে কোনক্রমেই তাঁর এই আশা ছিল না যে, বিশ্বনবী (সা) তাঁকে জীবিত ছেড়ে দেবেন। সুতরাং নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি মক্কা থেকে পালানোর রাস্তা গ্রহণ করলেন এবং ইয়েমেন যাওয়ার নিয়তে সমুদ্রোপকূলে পৌঁছে গেলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ইকরামার (রা) স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা) বিনতে হারিছ তাঁর চাচার কন্যা ছিলেন এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলামের অলংকারে অলংকৃত হলেন। তখন তিনি ইকরামার (রা) চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। ইকরামা (রা) কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ঘুরতে থাকুক এটা যেমন তিনি চাইতেন না তেমনি জিল্লতীর মৃত্যুবরণ করুন তাও চাইতেন না। তিনি রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচার পুত্র ও স্বামী জীবনের ভয়ে আত্মগোপন করেছে। আপনি যদি তার নিরাপত্তা দেন তাহলে আমি খুঁজে তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসতে পারি।"

হুজুরের (সা) রহমতের দরিয়ায় তখন ঢেউ খেলছিল। তিনি বললেন ঃ "তোমার স্বামীর নিরাপত্তা দিলাম। তাকে নিয়ে এসো।"

ওদিকে হযরত ইকরামা (রা) একটি কিশতিতে সওয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে এই কিশতী উল্টোমুখী প্রবল বাতাসের মুখে পড়লো এবং সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পিছু হটতে লাগলো। প্রচন্ড বাতাস তাকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগলো। মনে হচ্ছিল এই ডুবে আর কি। এই নাজুক মুহূর্তে হযরত ইকরামা (রা) লাত ও উজ্জাকে ডাকা শুরু করে দিলেন। মাঝি ও কিশতীর অন্যান্য লোকেরা বললো, লাত ও উজ্জা এখানে কোন কাজে আসবে। এখনতো আল্লাহকে ডাকার সময়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, মাঝিদের কথায় হযরত ইকরামার (রা) অন্তরের ওপর খুব প্রভাব ফেললো। তার দিব্যচক্ষু খুলে গেল এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লো ঃ

"হে আল্লাহ! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি এই তুফান থেকে বাঁচি তাহলে আমি নিজেকে মুহাম্মাদের (সা) সামনে পেশ করবো। সে খুব দয়ালু। আমার নিকট কোন জবাবদিহি চাইবে না।"

আল্লাহর কুদরত, তাঁর কিশতী পিছু হটতে হটতে কিনারের ঠিক সেই স্থানে এসে লাগলো যেখান থেকে রওয়ানা দিয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত উম্মে হাকিমও (রা) স্বামীর অনুসন্ধানে উপকূলে এসে পৌছলেন। অন্য আরেক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ইকরামার কিশতী ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হলো এবং তিনি মাঝিদের পরামর্শে আল্লাহকে ডাকলেন। তখন কিশতী ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে এলো। ঠিক তক্ষুণি হযরত উম্মে হাকিমও (রা) উপকূলে পৌঁছে গেলেন। তিনি তীরে দাঁড়িয়ে নিজের চাদরকে ঝান্ডা বানিয়ে তা দুলিয়ে দুলিয়ে কিশতী ফিরে আসার আহ্বান জানাতে লাগলেন। কিশতী নোঙ্গর ফেললো

www.bjilibrary.com

এবং হযরত ইকরামা (রা) একটি ছোট নৌকাতে চড়ে তীরে ফিরে এলেন। হযরত উম্মে হাকিম (রা) তাঁকে বললেন, "আমি সেই ব্যক্তির (সা) নিকট থেকে আসছি যিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার বন্ধন মজবুতকারী। তুমি অন্যায়ভাবে নিজেকে দেশ থেকে বহিষ্কারের মুসিবতে নিক্ষেপ করেছ। আমি তাঁর নিকট থেকে তোমার নিরাপত্তা লাভ করেছি। এখন আমার সাথে তাঁর খিদমতে চলো।" বস্তুত হযরত ইকরামা (রা) নিজের ভাগ্যবতী স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর আগমনে হুজুর (সা) সীমাহীন খুশী হলেন এবং তিনি তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানালেন। তখন হযরত ইকরামা (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সত্য অন্তরে অতীতের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। তার বিস্তারিত ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হাকিম (র) 'মুসতাদরাকে' লিখেছেন যে, হযরত ইকরামা (রা) যদিও সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ এবং রহমতে আলম (সা) তাঁর ক্ষমার জন্য দোয়াও করেছিলেন। কিন্তু লোকজন তাঁর পিতা ও তাঁর ইসলাম দুশমনীর সময়ের কথা কোনক্রমেই ভুলতে পারতো না এবং তারা হযরত ইকরামাকে (রা) আল্লাহর দুশমনের পুত্র বলে ডাকতো। হুজুরের (সা) পবিত্র কানে একথা পৌঁছলে তিনি লোকদেরকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "হে লোকেরা! শুনে নাও, জাহেলী যুগে যে সম্মানিত ছিল ইসলামেও সে সম্মানিত। কোন কাফেরের কারণে কোন মুসলমানের অন্তরে দুঃখ দিও না।" হুজুরের (সা) এই ভাষণের পর লোকজন সতর্ক হয়ে গেল এবং আর কখনো কেউ তাঁকে "আল্লাহর দুশমনের পুত্র" হওয়ার গালি দেয়নি ও বিদ্রূপ করেনি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ইকরামার (রা) জীবনে সম্পূর্ণ রূপে বিপ্লব এসে গেল এবং তিনি উদাহরণ যোগ্য চরিত্র ও কর্মের সুন্দর চিত্র হয়ে গেলেন। জিহাদের শওক, আল্লাহর পথে ব্যয়, ভক্তি ও ইবাদাত এবং কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক জীবনের এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। তখন তার একমাত্র চিন্তাই দাঁড়িয়েছিলো যে, কি করে জাহেলী যুগের ক্ষতিপূরণ করা যায়। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বেশী বেশী নামায পড়তেন এবং প্রায় সময়ই তাওবা ও ইসতেগফারে ব্যাপৃত থাকতেন। অন্তরে এমন পেলবতা ও কোমলতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, কাউকে দুঃখ কষ্টে দেখলে চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠতো। কুরআনে হাকিমের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে, গভীর আকর্ষণের কারণে অস্থির চিত্তে মুখের ওপর রাখতেন এবং আমার আল্লাহর কিতাব, আমার আল্লাহর কিতাব বলে কাঁদতেন। অত্যন্ত গভীরতার সাথে

www.bjilibrary.com

কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াতের সময় চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়তো।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রা) প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিবরানীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী দশম হিজরীতে হুজুর (সা) হযরত ইকরামাকে (রা) সাদকা আদায়ের জন্য রাজস্ব আদায়কারী বানিয়ে হাওয়াযিন গোত্রে প্রেরণ করেছিলেন। একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ওফাত হলো। এ সময় হযরত ইকরামা (রা) ইয়েমেনের একটি শহর তাবালাতে ছিলেন। রিসালাত সূর্যের আল্লাহর রহমতের ছায়ায় ডুবে যাওয়া এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার খবর দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে একবারে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। সেই ভয়ংকর সময়ে শুধুমাত্র মুহাজির ও মদীনার আনসার, মক্কার কুরাইশ ও বনু ছাকিফ সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত মজবুতভাবে ঈমানের ওপর কায়েম রলো। পরিস্থিতি যদিও খুব নাজুক ছিল তবুও খলিফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ধৈর্য, স্থৈর্য দৃঢ়তা এবং ঈমানী শক্তির অটল পাহাড় ছিলেন। তিনি মুরতাদেরকে কোন প্রকারের কনসেশন বা রেয়ায়াত দানের ব্যাপারে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১১টি সেনা বাহিনী তৈরী এবং তাদেরকে বিভিন্ন এলাকার মুরতাদদেরকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করলেন। তাদের মধ্যে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত ইকরামার (রা) হাতে সোপর্দ করা হলো। তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ইতিমধ্যেই মদীনা পৌছে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত ইকরামাকে (রা) মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাতের জন্য ইয়ামামার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলে হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানাকে তার সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। হযরত ইকরামা (রা) মুসায়লামার শক্তির সঠিক আন্দাজ না করেই বীরত্বের আবেগে সাহায্যকারী সৈন্য না পৌছতেই তার সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিল। মুসায়লামার বিরাট সংখ্যক সৈন্য তার ওপর এমন প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো যে, হযরত ইকরামা (রা) পিছু হটে যেতে বাধ্য হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই খবর পেয়ে অসন্তুষ্ট হলেন এবং শুরাহবিল (রা)-এর পৌছার পূর্বে তাঁর যুদ্ধ শুরু করাটা ঠিক হয়নি বলে লিখে পাঠালেন। তবে যা হবার তা হয়েছে একথা বলে তিনি তাঁকে সামনে অগ্রসর হয়ে হুজায়ফা (রা) বিন মিহসান এবং আরফাজা (রা) বিন হারছুমার সঙ্গে মিলিত হতে আম্মান ও মিহরার মুরতাদদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন।

www.bjilibrary.com

সেখানকার কাজ শেষ করে নিজের বাহিনীসহ মুহাজির (রা) বিন ওমাইয়ার নিকট ইয়েমেন ও হাজারে মাওত চলে যাওয়ার কথাও বললেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নির্দেশ পেতেই হযরত ইকরামা (রা) আম্মান পৌঁছে হযরত হুজায়ফা (রা) ও হযরত আরফাজার (রা) সঙ্গে মিলিত হলেন। আম্মানের মুরতাদের (বনু ইযদ) সরদার লকিত বিন মালিক একটি বিরাট বাহিনীসহ দবা শহরে অবস্থান করছিলো। সুতরাং ইসলামী বাহিনীও দবার দিকে অগ্রসর হলো। এই বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত ইকরামা (রা)। যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানরা ছিলো নীচু ভূমিতে। আর মুরতাদরা ছিল উঁচুতে। এজন্য মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। কিন্তু হযরত ইকরামা (রা) সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। লকিত বিন মালিক মুসলমানদের এই সাহস দেখে সেও নিজের ঘোড়া সামনের দিকে অগ্রসর করালো। সে সময় তার এক হাতে ঝান্ডা এবং অন্য হাতে ছিল বর্শা এবং নিজের বাহিনীকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। অতপর উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ঠিক তক্ষুণি নাখিয়া ও আবদুল কায়েস গোত্রের মুজাহিদরা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছলেন। ফলে মুসলমানদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেল এবং তাঁরা মুরতাদদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করলো। লকিত বিন মালিক ও তার অনেক সঙ্গী যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলো এবং হাজার হাজার মুরতাদকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। এক রেওয়ায়াত আছে যে, এই যুদ্ধে ১০ হাজার মুরতাদ নিহত হয় এবং খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ গনিমাতের মালের সাথে যে সংখ্যক কয়েদী খলিফার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল শুধু তার সংখ্যাই ছিল আটশ'। এই পরাজয়ের পর ইযদ কবিলার অবশিষ্ট মুরতাদ পুনরায় ইসলাম কবুল করে নিল।

আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইযদ গোত্র উৎখাতের পর হযরত ইকরামা (রা) গনিমাতের মাল ও কয়েদী নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর আম্মানের অন্য কতিপয় কবিলা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা শাহারকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে নিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদেরকে উৎখাতের জন্যও হযরত ইকরামাকে (রা) রওয়ানা করালেন। তিনি কিছু দিনের মধ্যেই তাদের সকলকে উৎখাত করে ছাড়লেন।

কিন্তু ইবনে খালদুন (র) এবং ইবনে আছির (র) লিখেছেন যে, লকিত বিন মালিককে পরাজিত করার পর হযরত ইকরামা (রা) সোজা মিহরা চলে যান। সে সময় নিজের বাহিনী ছাড়া নাহিয়াহ, আবদুল কায়েস, সাম্নদাহ এবং রাসেব গোত্রসমূহের লোকজনও তাঁর সাথে ছিলেন। মিহরাবাসী তখন

রিয়াসাত ও ইমারাতের প্রশ্নে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এক অংশের নেতা ছিল সাখরীত। অন্য অংশের ছিল মিসবাহ। হযরত ইকরামা (রা) উভয় পক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সাখরীত এই দাওয়াত কবুল করলেন এবং নিজের সমর্থক গোত্রসমূহের যাকাত আদায় করে দিলেন। কিন্তু মিসবাহ ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং হযরত ইকরামা (রা) নিজের সাথী ও সাখরীত সমর্থকদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিসবাহর ওপর হামলা করলো। প্রচন্ড একটি যুদ্ধের পর মিসবাহ নিহত হলো। এবং তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা অনেক দূর পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে স্থানে স্থানে তাদের লাশ বিছিয়ে দিল এবং তাদের মাল ও আসবাবের ওপর কবজা করে নিল। তারপর হযরত ইকরামা (রা) ইসলামের তাবলীগে মশগুল হয়ে গেলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি আশেপাশের সকল গোত্রকে ইসলামের সীমায় নিয়ে এলেন। সেই সময় হযরত মুহাজির (রা) বিন উমাইয়া নাজরান ও সানয়ার মুরতাদদেরকে খতম করে ফেলেছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে যিয়াদ (রা) বিন লবিদ আনসারীর সাহায্যের জন্য ইয়েমেন পৌছার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত ইকরামাও (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নির্দেশ অনুযায়ী মিহরাহ, আবদুল কায়েস, নাহিয়া ইযদ, কিনানা ও আম্বর গোত্রসমূহকে সাথে নিয়ে হযরত মুহাজিরের (রা) সঙ্গে মিলিত হলেন। অতপর এই সম্মিলিত বাহিনী কিন্দাহর দিকে অগ্রসর হলো। হযরত যিয়াদ (রা) বিন লবিদ সেখানে খুব কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করছিলেন। তিনি প্রথম দিকে ইয়েমেনের মুরতাদ গোত্রসমূহের ওপর প্রচন্ডভাবে হামলা করেছিলেন। কিন্তু পরে কিন্দী সরদার আশয়াছ বিন কায়েস তাঁর ওপর হামলা করে অনেক মাল ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়ে ছিল এবং সকল মুরতাদ কয়েদী ছাড়িয়ে নিয়েছিল। হযরত যিয়াদ (রা), হযরত মুহাজির (রা) এবং হযরত ইকরামার (রা) সম্মিলিত বাহিনী আশয়াছ বিন কায়েসকে ঘেরাও করে ফেললেন এবং একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করলেন। সে পালিয়ে নাহইয়ার দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। মুসলমানরা সেই দুর্গের ওপর অবরোধ কঠোরভাবেই আরোপ করলেন। অবরোধে আশয়াছ খুবই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তখন সে নিজের কবিলার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলো। হযরত যিয়াদ (রা) বিন লবিদ তা মঞ্জুর করে নিলেন এবং বলে পাঠালেন যে, আমান নামা লিখে আনো। সে আমান নামা লিখে আনলো এবং হযরত যিয়াদ (রা) তার ওপর নিজের সীলমোহর মেরে দিলেন। দুর্ভাগ্য বশত আশয়াছ বিন কায়েস আমান নামায় নিজের নাম লিখতে ভুলে গিয়েছিল। হযরত ইকরামা (রা) আমান নামাটি পড়লেন। তাতে আশয়াছের নাম ছিল না। সুতরাং তিনি তাকে গ্রেফতার করলেন এবং অন্য কয়েকজন কয়েদীর সাথে মদীনা নিয়ে এলেন। সেখানে পৌছে আশয়াছ বিন

www.bjilibrary.com

কায়েস ধর্মদ্রোহিতা থেকে তাওবা করে ইসলাম কবুল করেন। সে ছিল একজন বাহাদুর ও দানশীল মানুষ। এজন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে, হযরত ইকরামা (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের জন্য জিহাদে তৎপর ছিলেন। যখন এই ফিতনার সমাপ্তি ঘটলো তখন তিনি শান্তির নিঃশ্বাস নিলেন। এসব যুদ্ধে তিনি সকল ব্যয় নিজের তহবিল থেকে নির্বাহ করেছিলেন এবং বাইতুলমাল থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেননি।

ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের পর সিরিয়া ও ইরানের সাথে যুদ্ধের এক দীর্ঘ সিলসিলা শুরু হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সিরিয়া অভিযানে সর্বপ্রথম হরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল, হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানাকে প্রেরণ করলেন। তারপরও অব্যাহতভাবে সিরিয়ার মুজাহিদদেরকে সাহায্য পাঠাতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি মক্কার শরীফদেরকেও ডেকে পাঠালেন। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) সিদ্দীকে আকবরের (রা) খিদমতে আরজ করলেন যে, তাঁরা নিজেদের জীবনের বড় অংশ ইসলাম বিরোধিতায় কাটিয়েছে এবং হকের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সব ধরনের তৎপরতাই চালিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন। এ জন্য এখন তাঁদেরকে অগ্রগামী মু'মিনদের সাথে পরামর্শে শরীক করানো ঠিক হবে না।

মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও কুরাইশ সরদারগণ হযরত ওমরের (রা) কথা জানতে পেলেন। তখন হযরত ইকরামা (রা), হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম এবং হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর খলিফার দরবারে হাজির হলেন এবং সকলে কেঁদে কেঁদে আরজ করলেন যে, ইসলামের পূর্বে আমাদের সাথে এ ধরনের আচরণ বৈধ ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সাথে এ ধরনের কঠোরতা ইনসাফ বিরোধী ব্যাপার। হযরত ওমরও (রা) তখন খলিফার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইকরামা (রা) তাঁকে সম্বোধন করে এ পর্যন্ত বলে ফেললেন, "এখন আপনি আমাদের চেয়ে বেশী তাদের শত্রু নন যারা ইসলাম অস্বীকারকারী ও মুসলমানদের বিরোধী।" হযরত ওমর (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি খলিফাতুর রাসূলের (সা) খিদমতে যা কিছু বলেছি তা শুধু মাত্র সাবিকুনাল আউয়ালিনের কল্যাণ কামনা এবং তোমাদের মধ্যে ও তোমাদের চেয়ে আফজাল মুসলমানদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলেছি।" একথার ওপর কুরাইশের তিন সরদারই অগ্নিঝরা বক্তৃতা করলেন। তাতে তারা নিজেদের সকল কিছু হক পথে কুরবানী করে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলেন। এ সময় হযরত ইকরামা (রা) বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে জনতা ! সাক্ষ্য থেকো যে, আমি আমার জীবন, আমার সঙ্গীদের জীবন এবং আমার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমরা কোন সময়ই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব না এবং সিপাহীদের মত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী ঝান্ডার অধীন লড়াই করতে থাকবো। কার হাতে এই ঝান্ডা রয়েছে তার কোন তারতম্য করবো না।"

বক্তৃতা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং হযরত ওমরও (রা) খুশী হয়ে গেলেন। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছকে একটি শক্তিশালী সৈন্য বাহিনীসহ সিরিয়া গমনের নির্দেশ দিলেন। হযরত ইকরামাও (রা) নিজের স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা) এবং দুই পুত্রসহ সেই বাহিনীতে যোগ দিলেন। সৈন্যবাহিনী রওয়ানার পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তা পরিদর্শনের জন্য তাশরীফ নিলেন। পরিদর্শনের সময় তিনি একটি তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এই তাঁবুর চার পাশে শুধু ঘোড়া আর ঘোড়া পরিদৃষ্ট হলো এবং বর্শা, তরবারী ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও বিপুল পরিমাণ সেখানে মওজুদ ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁবুর অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সেখানে তিনি হযরত ইকরামাকে (রা) দেখতে পেলেন। এসব সরঞ্জাম তিনি নিজের অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে সালাম করলেন এবং বললেন, "ইকরামা, তুমি যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছ। তুমি এই সকল অর্থ অথবা তার কিছু অংশ বাইতুলমাল থেকে নিয়ে নাও এটা আমি চাই।"

হযরত ইকরামা (রা) আরজ করলেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! আমার নিকট এখনো দু' হাজার দিনার নগদ রয়েছে এবং আমি আমার সম্পদ হক পথের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমাকে বায়তুলমালের ওপর বোঝা আরোপে মা'জুর রাখুন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ব্যয়ের আবেগ দেখে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাঁর জন্য পুনরায় দোয়া করলেন।

হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হেদায়াত অনুযায়ী সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সে যুগে ফিলিস্তিন সিরিয়ার একটি অংশ ছিলো এবং রোমক বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্যের অধীন ছিলো। মুসলমানদের হামলার খবর পেয়ে হিরাক্লিয়াস এক লাখ সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী ফিলিস্তিন প্রেরণ করলো। রোমক এবং ইসলামী সৈন্যদের মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ সকল

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের প্রত্যেকটিতেই রোমকদেরকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো। এসব যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রা) বিস্ময়কর দৃঢ়তা ও জীবন উৎসর্গের নিদর্শন দেখালেন এবং কয়েকবার ইসলামী বাহিনীর অগ্রগামী দলের নেতৃত্বও প্রদান করেন। সেই যুগে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ দামেস্ক থেকে হযরত আবু উবায়দার (রা) পত্র পেলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, "আজনাদাইনে রোমকদের এক বিরাট বাহিনী রয়েছে। আমি তাদের মুকাবিলার জন্য আজনাদাইন যাচ্ছি। তুমিও তোমার সৈন্যসহ সেখানে পৌছে যাও।

এই পত্র পেয়েই হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ আজনাদাইনের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং শুরাহবিল বিন হাসানও (রা) নিজের বাহিনী নিয়ে হযরত আবু উবায়দার (রা) নিকট আজনাদাইন পৌছে গেলেন। মুসলমানদের সেই সম্মিলিত বাহিনী এবং রোমকদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেন। তাতেও হযরত ইকরামা (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। আজনাদাইন বিজয়ের পর হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ ফিলিস্তীন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হযরত আবু ওবায়দা (রা) দ্বিতীয়বার অত্যন্ত কঠোরতার সাথে দামেস্ক অবরোধ করে নিলেন। এই অবরোধ মুসলমানদের সাফল্যের নিয়ামক হিসেবে দেখা দিল এবং তাঁরা দামেস্ক দখল করে নিলেন। তারপর মুসলমানরা জর্দানের ফাহল নামক স্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে নিকটেই বিসান নামক স্থানে ৮০ হাজার রোমক যোদ্ধা মুসলমানদের সাথে লড়াই করে মরার জন্য একত্রিত হয়েছিল। এই বিরাট বাহিনীর সাথে মুকাবিলার জন্য সকল মুসলমান সৈন্য পুনরায় আরেকবার ফাহালে একত্রিত হলো। ইত্যবসরে রোমকরা চার পাশের নদী-নালার বাধ ভেঙ্গে দিলো। ফলে বিসান ও ফাহাল এলাকা পানিতে ডুবে গেল এবং কর্দমাক্ত হয়ে উঠলো। এ জন্য ফাহাল থেকে সামনে অগ্রসর হওয়াটা মুসলমানদের পক্ষে হয়ে উঠলো কঠিন ব্যাপার। এবং তারা দীর্ঘকালীন সময় পর্যন্ত ফাহালে তাঁবু খাটিয়ে পড়ে রইলেন। একদিন রোমকরা মুসলমানদেরকে গাফেল ভেবে রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত জোরেশোরে তাদের ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু মুসলমানরাও একদম বেখবর ছিলেন না। তাঁরা খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলো। সারা রাত এবং পরের দিন ও রাত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত রলো। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইকরামা (রা) এ যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশ নিলেন। যেদিকেই অগ্রসর হতেন সেদিকেই লাশ আর লাশ দৃষ্টিগোচর হতো। একবার যুদ্ধ করতে করতে দূর পর্যন্ত দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। সারা শরীর

আঘাতে আঘাতে ছিদ্র হয়ে গেল। লোকরা বললো, ইকরামা আল্লাহর ভয় করো। এভাবে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করো না এবং আবেগকে বুদ্ধির ওপর বিজয়ী হতে দিও না।

তিনি জবাব দিলেন, "হে লোকেরা! আমি লাত উজ্জার খাতিরে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতাম। আজ আল্লাহ ও রাসূলের (সা) জন্য জীবন বিলিয়ে দেবো না ? আল্লাহর কসম, তা কখনো হবে না।"

শেষে রোমকরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো এবং তারা পিছপা হতে শুরু করলো। ব্যাকুল অবস্থায় তারা কাদায় আটকে গেল এবং ৮০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কতিপয় ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারলো না। সেখানেই প্রায় সকল সৈন্য মুসলমানদের হাতে শেষ হয়ে গেল। ফাহালের পর হযরত ইকরামা (রা) হেমসের যুদ্ধে নিজের তরবারীর পারদর্শীতা প্রদর্শন করলেন তারপর ইয়ারমুকের জিহাদের ময়দানে পৌছে গেলেন।

সিরিয়ায় মুসলমানরা যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ছিল ইয়ারমুকের। তাতে রোমক বাদশাহ হিরাক্লিয়াস কয়েক লাখ রোমক যোদ্ধাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করালো। রোমকদের সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি সতর্ক আন্দাজ অনুযায়ী তাদের সংখ্যা দু'লাখ থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে ছিল। সিরিয়ায় উপস্থিত সকল মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা মিলিয়ে ৪০ হাজারের কাছাকাছি ছিল। আল্লাহর এই চল্লিশ হাজার সৈন্য চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে ইয়ারমুকের ময়দানে এসে পৌছলো এবং রোমকদের ভয়াবহ যুদ্ধ শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। এই যুদ্ধে মুজাহিদরা যে ত্যাগ, ধৈর্য ও অটলতার সাথে রোমকদের মুকাবিলা করেছিল তাও নজিরবিহীন ঘটনা। হযরত ইকরামা (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে একটি সামরিক দলের অফিসার ছিলেন। তিনি নিজেও জীবন হাতে রেখে লড়াই করেছিলেন এবং নিজের দলকেও এমনভাবে লড়াইতে লাগিয়েছিলেন যে, অফিসারীর হক যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। একবার রোমকরা অত্যন্ত জোরেশোরে হামলা করলো এবং মুসলমানদের ওপর এমন কঠিন চাপ প্রয়োগ করলেন যে, তাদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠলো। তা দেখে হযরত ইকরামার (রা) আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি নিজের ঘোড়া সামনে অগ্রসর করালেন এবং উচ্চ স্বরে বললেন ঃ

"হে রোমকরা ! আমি কোন এক সময় (কুফুরী অবস্থায়) স্বয়ং রাসূলের (সা) সাথে লড়াই করেছি। আজ কি তোমাদের মুকাবিলায় আমার কদম পিছু হটতে পারে ? আল্লাহর কসম, এমনটি কখনো হবে না।"

www.bjilibrary.com

তারপর নিজের বাহিনীর দিকে তাকালেন এবং ডেকে বললেন, "এসো, কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে ?"

তাঁর ডাকে চার ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইকরামা (রা) দুই পুত্রও ছিলেন। অতপর সেই সব জানবাজ হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের তাঁবুর সামনে মরণপণ লড়াই শুরু করে দিলেন। এমনকি তাঁরা এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন অথবা গুরুতরভাবে আহত হয়ে লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। হযরত ইকরামা (রা) এবং তাঁর দুই পুত্র মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পুত্রদের অবস্থা ছিল গুরুতর। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাঁদেরকে দেখতে এলেন। একজনের মাথা নিজের রানের ওপর এবং অপরের মাথা পায়ের গোছার ওপর রাখলেন। অতপর তাঁদের চেহারার ওপর থেকে রক্ত মুছলেন এবং হলকে পানি দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, ইবনে হানতামার [হযরত ওমর ফারুকের (রা)] ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে আমরা (বনু মাখজুম) শাহাদাত লাভ করতে চাই না।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ইকরামার (রা) লাশ নিহতদের স্তূপে পাওয়া গিয়েছিল। তখনো নিঃশ্বাস অবশিষ্ট ছিল। হযরত খালিদ (রা) তাঁর মাথা নিজের উরুর পর রাখলেন এবং হলকে পানির ফোটা দিতে দিতে উল্লিখিত কথাগুলো বলেছিলেন। (আল-ফারুক—শিবলী নুমানী)। এ কথাগুলোর পটভূমি এই ছিল যে, কুফুরীকালে মাখজুমীরা ইসলাম দুশমনীতে যে তৎপরতা দেখিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন এক সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) এই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে, সম্ভবত মাখজুমীদের শাহাদাত লাভের ভাগ্য হবে না। এ সময় হযরত খালিদ (রা) হযরত ওমরের (রা) সেই ধারণার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং প্রচণ্ড আবেগে তাঁর নাম তাঁর মায়ের (হানতামার) নিসবতের সাথে নিয়েছিল।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত ইকরামার (রা) যখন শ্বাসকষ্ট চলছিলো তখন তিনি পানি চাইলেন। এক ব্যক্তি দৌড়ে পানি আনলো। যেই তিনি পেয়ালা মুখে লাগালেন পাশে থেকে অন্য আরেক আহত ব্যক্তি পানি চাইলো। হযরত ইকরামা (রা) পেয়ালা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন এবং নিজে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তি তখনো পানি পান করেনি। এমন সময় সে অন্য আরেক আহত ব্যক্তিকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনলো। সেও পেয়ালা নিজের মুখ থেকে হটিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে

www.bjilibrary.com

দিল। এমনিভাবে সাত আহত মুজাহিদ একের পর এক পানির এক কাতরা পানের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। প্রত্যেকেই নিজের পিপাসার ওপর অন্যের পিপাসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং ত্যাগ ও স্বার্থহীনতার এমন এক উদাহরণ সৃষ্টি করলেন যা চিরকাল মুসলমানদের জন্য মশাল হয়ে থাকবে।

হযরত ইকরামা (রা) যে মহান মর্যাদাবান ছিলেন তার প্রমাণ মহানবীর (রা) বাণী, তিনি দু'দু'বার তাঁকে বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একবার কুফুরী অবস্থায় হযরত ইকরামা (রা) একজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেলেন। হুজুর (সা) এই খবর পেয়ে মুচকি হেসে দিলেন। সাহাবারা (রা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনার মুচকি হাসার কারণ কি।

তিনি বললেন, আমি (অদৃশ্য জগতে) দেখলাম যে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে যাচ্ছেন।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন যে, আমি স্বপ্নের জগতে জান্নাতে গেলাম। সেখানে আমি খেজুরের একটি বৃক্ষ দেখলাম। বৃক্ষটি অন্য সকল বৃক্ষ থেকে ভালো মনে হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার বৃক্ষ। আমাকে বলা হলো যে, এটা আবু জেহেলের বৃক্ষ। আমি বিস্মিত হলাম যে, আবু জেহেলের মত ইসলাম দুশমনের বৃক্ষ জান্নাতে? এই ঘটনার কয়েক বছর পর যখন হযরত ইকরামা (রা) ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করলেন তখন হুজুর (সা) খুশী হয়ে বললেন, ইকরামা (রা) আবু জেহেলের সেই বৃক্ষ যা আমি স্বপ্নে (বেহেশতে) দেখেছিলাম।

www.bjilibrary.com

হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ ছাকাফী

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তায়েফের বনু ছাকিফ প্রচণ্ড অবাধ্য ও খারাব প্রকৃতির ছিল। দ্বীনে হকের প্রতি তাদের শত্রুতা ও বিদ্রোহের অবস্থাটা এমন ছিল যে, নবুয়াতের দশম বছরের পর প্রিয় নবী (সা) হকের তাবলীগের জন্য তাদের নিকট তাশরীফ নিলেন। এ সময় তারা আরবদের প্রথাগত মেহমান দারীকে তাকে তুলে রাখলো এবং তাওহীদের দাওয়াতের জবাবে হুজুরকে (সা) শুধুমাত্র হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপের নিশানাই বানালো না। বরং তাঁর ওপর পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করলো। এমনকি মহানবী (সা) আহত অবস্থায় তায়েফ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতপর অষ্টম হিজরীতে হকপন্থীরা তায়েফ অবরোধ করে নিলে বনু ছাকিফ প্রচন্ডভাবে বাধা দিল এবং পাথর ও তীর বর্ষণ করে কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেললো। কিন্তু আল্লাহর কুদরত বিস্ময়কর ধরনের হয়ে থাকে। সেই ঘটনার পর তখনো খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি। এমন সময় আল্লাহ্ তায়ালা তায়েফবাসীর অন্তর ফিরিয়ে দিলেন এবং নবম হিজরীতে তাঁরা স্বয়ং ইসলামের আস্তানার সামনে মাথা নত করে দিলেন। এ বছর বনু ছাকিফের একটি প্রতিনিধি দল আবাদী ইয়ালাইলের নেতৃত্বে মদীনা মুনাওয়ারা এলেন। হযরত মুগিরা (রা) বিন শু'বা ছাকাফী যিনি পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়ে মদীনাতে অবস্থান করছিলেন, তিনি হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে সেই প্রতিনিধি দলকে মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করালেন এবং তাদেরকে খুব খাতির যত্ন করলেন। এই প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারাতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিল। এ সময় প্রতিনিধি দলের নেতা আবদী ইয়ালাইল হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে রেওয়ায়াতের দরখাস্ত করলো। এই রেয়ায়েত বা কনসেশনের মধ্যে নামায ত্যাগ, মদপান এবং সুদী লেন-দেনের ইজাযত ছাড়া জিহাদ থেকে বাদ রাখার কনসেশনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী (সা) প্রথম তিন রেয়ায়েত প্রদানে সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন। অবশ্য তাদেরকে সাময়িকভাবে জিহাদ থেকে বাদ দিলেন এবং সাহাবাদেরকে (রা) বললেন যে, ইসলাম যখন তাদের অন্তরে মজবুত হয়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই জিহাদের জন্য বের হবেন। তায়েফবাসী নবীর (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নত করে দিলো এবং কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করার মর্যাদা লাভ করলেন।

বনু ছাকিফের প্রতিনিধি দলে একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবকও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বয়সে সে ছিল সবচেয়ে ছোট। কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের ও বুদ্ধিমান

www.bjilibrary.com

ছিলো। তার কপাল সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল করছিল এবং সে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুবই বেচাইন ছিল। এই যুবক মদীনায় এসেই প্রতিনিধি দল থেকে পৃথক হয়ে গেল এবং পৃথক অবস্থায় হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ তো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ব্যাপারে হুজুরের (সা) সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে গেলেন এবং সেই যুবক তাদেরকে লুকিয়ে প্রথমে রাসূলের (সা) নিকট থেকে কুরআনে হাকিমের কিছু অংশ পড়লো এবং পুনরায় অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারীর নিকট কুরআনে হাকিমের তালিম হাসিল করতে লাগলো। একদিন সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তার জ্ঞানের উৎসাহ দেখে বললেন, "এই ছেলে তাফাককুহ ফিদ্বীন এবং কুরআন তালিমে খুবই আগ্রহী।"

মহানবীও (সা) এই যুবকের জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ এবং উঁচু যোগ্যতাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন। সুতরাং বনু ছাকিফের প্রতিনিধি দল যখন বিদায় হওয়ার সময় হুজুরের (সা) নিকট দরখাস্ত করলো যে আমাদের জন্য কোন ইমাম নিয়োগ করে দিন তখন তিনি সেই যুবকের হাত ধরে বললেন, "এ জ্ঞানী মানুষ এবং এ-ই তোমাদের আমীর ও ইমাম হবে।"

প্রতিনিধি দলের সকলেই হুজুরের (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নত করে দিলেন। অতপর তিনি সেই যুবককে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"নামায পড়ানোর সময় লোকদের অবস্থার খেয়াল রাখবে। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু, অসুস্থ, দুর্বল এবং ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর মানুষ থাকে।"

এই নেককার জওয়ান যাঁর জ্ঞান অর্জনের এত আগ্রহ ছিল এবং অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রিসালাতের দরবার থেকে যাঁকে শুধুমাত্র জ্ঞানী হওয়ার সার্টিফিকেটই প্রদান করা হলো না বরং বনু ছাকিফের মত জবরদস্ত গোত্রের ইমারত ও ইমামতও প্রদত্ত হলো তিনি ছিলেন হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ ছাকাফী।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ ওসমান (রা) বিন আবিল আছ মহানবীর (সা) সেই সব সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন যাঁরা আসমানী জ্ঞানের চন্দ্র ও সূর্য ছিলেন এবং জিহাদের শওক, বীরত্ব ও পৌরুষত্বের দিক থেকে নজীরবিহীন ছিলেন।

হযরত ওসমানের (রা) সম্পর্ক ছিল মশহুর কবিলা বনু ছাকিফের সঙ্গে। তিনি ছিলেন তায়েফের সুন্দর পরিবেশ ও শ্যামলিমাপূর্ণ শহরের অধিবাসী।

www.bjilibrary.com

হযরত ওসমান (রা) সেই শহরেই জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই যৌবন প্রাপ্ত হন। নসবনামা হলো ঃ

ওসমান (রা) বিন আবিল আছ বিন বাশার বিন দাহমান বিন আবদুল্লাহ বিন হুমাম বিন আবান বিন ইয়াসার বিন মালিক বিন খাতিত বিন জাশম ছাকাফী।

বনু ছাকিফ অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব ও নরম প্রকৃতির যুবক ছিলেন। যৌবন প্রাপ্তির পর তিনি তাওহীদের দাওয়াতের চর্চা শুনলেন। এ সময় নেকীর দিকে নিজের প্রাকৃতিক আকর্ষণের কারণে তিনি তাতে খুব প্রভাবিত হলেন এবং হকের মহান দায়ীর (সা) দর্শন লাভ এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য অশান্তিতে থাকতে লাগলেন। সুতরাং তায়েফের যুদ্ধের পর বনু ছাকিফের প্রতিনিধি দল যখন নবীর দরবারে হাজেরীর জন্য মদীনা রওয়ানা হলো, তখন তিনিও সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং মদীনা পৌছে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করলেন। হুজুর (সা) বরকত হিসেবে তাঁকে কিছু কুরআন পড়ালেন এবং তারপর তিনি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মদীনা অবস্থানকালে হযরত উবাই (রা) বিন কাবের নিকট কুরআন করিম এবং দ্বীনি মাসায়েল শিখতে লাগলেন। নিজের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এবং দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠার কারণে তিনি খুব শীঘ্র মহানবীর (সা) স্নেহের পাত্র হয়ে যান এবং অবশেষে প্রিয়নবীর (সা) নিকট থেকে বনু ছাকিফের ইমারাত ও ইমামতের মর্যাদা লাভ করেন।

একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। এ সময় হঠাৎ করে সমগ্র আরবে ধর্মদোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এই আগুনের উত্তাপ তায়েফ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। তখন হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি সকল বনি ছাকিফকে একত্রিত করলেন এবং তাঁদের সামনে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন। তাতে তিনি বললেন, "হে ছাকিফের লোকেরা! তোমরা ইসলামে অগ্রগামিতায় বঞ্চিত থেকেছ এবং সে সময় এই নিয়ামত লাভ করেছ যখন আরবের অন্যান্য সকল কবিলা তাতে পূর্বেই অভিষিক্ত হয়েছিল। সেই দেরীর ক্ষতিপূরণ এই নাযুক সময়ে তোমরা দ্বীনে হকের ওপর অটল থেকে করতে পারো। গোমরাহীর এই তুফানের প্রভাব গ্রহণ করা তোমাদের শোভা পায় না। দেখো, এ সময় তোমাদের পা অবশ্যই যেন টলটলায়মান না হয়।" হযরত ওসমানের (রা) প্রভাবপূর্ণ বক্তৃতার ফল এই দাঁড়ালো যে, তায়েফের ওপর ধর্মদ্রোহিতার মেঘ দেখা দিতে না দিতেই

www.bjilibrary.com

তা মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল এবং বনু ছাকিফ ধর্মদ্রোহীদের ফিতনা খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলো।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সম্পূর্ণ খিলাফতকালে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ তায়েফের আমীর রলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের প্রথম যুগেও তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চতুর্দশ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) বসরা শহর আবাদ করালেন। তখন সেখানকার লোকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টি পড়লো হযরত ওসমান (রা) ছাকাফীর ওপর। সুতরাং তিনি হযরত ওসমানকে (রা) বসরা প্রেরণ করলেন। এক বছর পরই হযরত ওমর ফারুকের (রা) মানুষ চেনার দৃষ্টি হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছকে বাহরাইন ও আম্মানের গবর্নরীর জন্য নির্বাচিত করলো। হযরত ওসমান (রা) আম্মানকে নিজের স্থায়ী আবাস বানালেন এবং সহোদর হাকাম (রা) বিন আবিল আছকে নিজের নায়েব বানিয়ে বাহরাইন প্রেরণ করলেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতুহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ওসমান (রা) বিন আবিল আছ কিছুদিন পর একটি নৌবহর তৈরি করলেন এবং তা হিন্দুস্তানের ওপর হামলার জন্য প্রেরণ করলেন। এই নৌবহর গুজরাট ও কোকন বোম্বাইয়ের সীমান্তে অবস্থিত বন্দর থানা পর্যন্ত পৌছেছিলো। ইসলা-মের মুজাহিদরা সেই শহর দখল করে। কিন্তু তার ওপর দখল বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, তার উদ্দেশ্য ছিল নৌ ডাকাতি বন্ধ এবং হিন্দুস্তানের অবস্থান জানা। সুতরাং তিনি কিছুদিন পর থানা থেকে প্রচুর গনিমাতের মালসহ আম্মান ফিরে গেলেন। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দুস্তানের (গুজরাট কাঠিওয়ার) ওপর আরবদের এইটাই প্রথম হামলা ছিল।

হযরত ওসমান (রা) এই নৌবহর প্রেরণের সময় হযরত ওমর ফারুকের (রা) অনুমতি নেননি। এ জন্য তিনি যখন খিলাফতের দরবারে নিজের সাফল্য ও গনিমাতের মাল লাভের খবর পাঠালেন তখন আমীরুল মু'মিনীন তার সেই অভিযান পছন্দ করলেন না। কেননা তার ধারণায় হযরত ওসমান (রা) মুসলমানদের জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সুতরাং তিনি হযরত ওসমানকে (রা) একটি কঠোর পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে লিখেছিলেন যে ঃ

"হে আমার ছাকাফী ভাই! তুমি তো সৈন্য প্রেরণ করোনি, বরং যেন একটি পতঙ্গকে কাঠের ওপর বসিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলে। তারা যদি মুসিবতে ফেসে যেতো তাহলে আল্লাহর কসম, আমি তোমার এবং তোমার কওমের নিকট থেকে তার জবাবদিহি করতাম।"

www.bjilibrary.com

হযরত ওমর ফারুকের (রা) এই সতর্কতামূলক পত্র সত্ত্বেও হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ হিন্দুস্তানের নৌ হামলার ধারা অব্যাহত রাখলেন। কেননা তার নিকট সেখানকার স্থানীয় পরিস্থিতিই এ ধরনের হামলার দাবী করতো। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, দ্বিতীয়বার হযরত ওসমান (রা) নিজের ভাই মুগিরা (রা) বিন আবিল আছকে একটি নৌবহর দিয়ে হিন্দুস্তান পাঠিয়েছিলেন। তিনি সিন্ধুর মশহুর শহর দেবেল পৌঁছেন এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করে গনিমাতের মালসহ বাহরাইন ফিরে আসেন। একটি রেওয়ায়াতে এও আছে যে, মুগিরা দেবেলে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয়বার হযরত ওসমান (রা) নিজের অন্য আরেক ভাই হাকাম (রা) বিন আবিল আছকে একটি নৌবহরের অফিসার বানিয়ে হিন্দুস্তান রওয়ানা করেন। তিনি ভারুচ পদানত করে ফিরে যান।

কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, এসব হামলার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র সেই নৌ লুটেরাদের উৎখাত যারা আরবদের জাহাজ লুটপাট করে সিন্ধু ও কাঠিয়াদারের বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করতো। হযরত ওসমান (রা) এসব হামলার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অনেকাংশেই হাসিল করেছিলেন এবং জাহাজের নৌ ডাকাতদের লুটতরাজ থেকে বহুলাংশেই নিষ্কৃতি লাভ ঘটেছিলো।

একুশ হিজরীতে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের জীবনের সেই উদ্যমপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়—যাতে তিনি ফারুক ও ওসমানী খিলাফত আমলের নামকরা সিপাহসালারদের কাতারে দন্ডায়মান পরিদৃষ্ট হয়। সেই বছরে হযরত ওমর ফারুক (রা) ইরানের ওপর সাধারণ সামরিক অভিযানের সংকল্প নেন। তিনি নিজের হাতে বেশ কিছু ঝান্ডা তৈরি করেন এবং তা নিজের কয়েকজন মশহুর অফিসারের নিকট সোপর্দ করে বিভিন্ন শহর ও এলাকা পদানত করার কাজে নিয়োগ করেন। এসব অফিসারের মধ্যে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছও ছিলেন। তাঁকে আসতাখার জয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আসতাখার পারস্যের খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এবং তার ওপর সামরিক অভিযানের অর্থই ছিল পারস্যের ওপর সামরিক অভিযান। পারস্যবাসীও প্রতি মুহূর্তের খবর পাচ্ছিলো। তারা তাওজকে কেন্দ্র বানিয়ে অত্যন্ত জোরেশোরে মুসলমানদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নিলো। হযরত ওসমান (রা) আবরকাওয়ান দ্বীপ জয় করে তুফানের মত তাওজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ইরানীদের সকল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা পদদলিত করে তাওজের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি সেই শহরে কিছুদিন অবস্থান করে মসজিদ বানালেন এবং আরবের অনেক গোত্র আবাদ করলেন [এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আবরকাওয়ান দ্বীপ ও তাওজ হযরত ওসমানের (রা) সহোদার হাকাম

www.bjilibrary.com

(রা) বিন আবিল আছের হাতে জয় হয়]। অতপর হযরত ওসমান (রা) ইসলামী সৈন্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন। প্রত্যেক স্থানেই ইরানীদেরকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো। সাবুর, ইরদশির এবং আসতাখার প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর পর্যায়ক্রমে জয় হলো। সে সময় পারস্যের গভর্নর ছিল "শাহরাক" নামক একজন ইরানী সরদার। মুসলমানদের অগ্রগমন প্রতিরোধের জন্য সে এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করলো এবং রামশহরে ছাউনি ফেলালো। হযরত ওসমান (রা) সাওয়ার বিন হুমাম এবং নিজের ভাই হাকাম (রা) বিন আবিল আছকে শাহরাকের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা করালেন। শাহরাক অত্যন্ত বিন্যস্তভাবে ব্যূহ রচনা করলো এবং ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি পা পিছু হটাবে তাকে হত্যা করা হবে। ওদিকে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনারও কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। মোটকথা উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হলো। শাহরাক অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করলো। কিন্তু আবেগে উদ্বেলিত মুসলমানদের হামলার সামনে সে কোনক্রমেই তিষ্ঠাতে পারলো না। ইরানীদের মারাত্মক পরাজয় হলো এবং শাহরাক যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলো। রামশহর পদানত করার পর হযরত ওসমান (রা) হিরাম (র) বিন হাইয়ান আবদীকে শের দুর্গের ওপর চড়াও হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সেই দুর্গ জয় করে নিলেন। স্বয়ং হযরত ওসমান (রা) জারাহ, কাজদারান, নওবন্দ খান এবং তার উপকণ্ঠসমূহ জয় করলেন। সেই সময়ই হযরত ওমর ফারুক (রা) বসরার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে (রা) পারস্য পদানত করার জন্য হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছকে সাহায্যের নির্দেশ প্রেরণ করলেন। সুতরাং হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত ওসমানের সাহায্যের জন্য বসরা থেকে মাঝে মধ্যেই সাহায্যকারী দল পাঠানো শরু করেন। কিছুদিন পর তিনি স্বয়ং একটি সৈন্য দল নিয়ে হযরত ওসমানের (রা) নিকট চলে এলেন এবং উভয়ে মিলে শিরাজ, আরজান, সিননির প্রভৃতি স্থান পদানত করলেন। এরপর হযরত ওসমান (রা) নিজের সৈন্য বাহিনীসহ হিসান জানায়া, দারাবে জারদ, জাহাম এবং ফাসাপরের ওপর হামলা চালিয়ে ইসলামী খিলাফতের অনুগত বানিয়ে নিলেন। ২৩ হিজরীতে তিনি পারস্যের রাজধানী সাবুরের ওপর চড়াও হলেন। সে সময় পারস্যের গভর্নর ছিল নিহত শাহরাকের ভাই। সে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার সাহস পেলো না এবং সে হযরত ওসমানকে (রা) সন্ধির পয়গাম প্রেরণ করলো। তিনি কতিপয় শর্তে তা মঞ্জুর করলেন। এমনিভাবে সমগ্র পারস্যের কিছু অংশ তরবারীর জোরে এবং কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে হযরত ওসমানের (রা) হাতে জয় হয়।

পারস্য জয়ের সাথে সাথে অথবা তার অব্যাহতির পর হযরত ওমর ফারুক (রা) শাহাদাত পেলেন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) খিলাফতের

www.bjilibrary.com

আসনে সমাসীন হলেন। হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের সামরিক তৎপরতা তার যুগেও অব্যাহত রলো। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতের কেবলমাত্র শুরু হয়েছিল। এমন সময় সাবুরবাসীরা ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলো এবং নিজেদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসলো। ২৬ হজিরীতে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ এবং হযরত আবু মূসা (রা) সাবুরের ওপর খুব জোরে হামলা করলেন ও বিদ্রোহীদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে সাবুরের ওপর পুনরায় ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। ইবনে জারির তাবারীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী আসতাখারবাসীও সেই যুগে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। ২৭ হিজরীতে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ দ্বিতীয় বার হামলা করে তাদেরকে অনুগত বানিয়ে নিয়েছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন আসতাখার জয়ের খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বারের (র) রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছকে বিরাট পরিমাণের জমি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করলেন। আসতাখার বিজয়ের পর হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের তৎপরতা সম্পর্কে চলিত গ্রন্থসমূহ নীরব রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "তাহজীবুত তাহজীব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সমকালীন সেই মহান ব্যক্তি ৫৫ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে আখিরাতের সফরে যাত্রা করেছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানসন্তুতি সম্পর্কিত চরিতকাররা নীরব রয়েছেন।

হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ অন্যতম মহান সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। যদিও তিনি রাসূলের (সা) সাহচর্যে বেশী দিন ফয়েজ লাভের সুযোগ পাননি তবুও তাঁর থেকে ২৯টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, নাফে বিন জাবির, মূসা বিন তালহা এবং ইবনে সিরিনের (র) মত মহান তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। হযরত খাজা হাসান বসরী (র) হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের সীমাহীন প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি বলতেন, ওসমান (রা) জ্ঞান ও কামালিয়াতে নজিরবিহীন ছিলেন। বাস্তবত হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের ব্যক্তিত্ব ছিল ইলম ও আমলের সংমিশ্রণ। তিনি দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা এবং হক পথে কুরবানীর যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় এঁকে দিয়েছেন, তা চিরকাল জীবন্ত থাকবে।

---

www.bjilibrary.com

হযরত ফিরাসুল (রা) আকরা' তামিমী

মক্কা বিজয় ও হুনাইনের (অষ্টম হিজরী) যুদ্ধের পর সমগ্র আরব ইসলামের আস্তানার সামনে মাথা অবনত করলো এবং আরবের প্রতিটি স্থান থেকে প্রতিনিধি দল মদীনা যাত্রা করলো। এসব প্রতিনিধি দলের অধিকাংশই ইসলামের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হয়েছিলেন। যাঁরা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হুজুরের (সা) দর্শন লাভ ও বাইয়াত করার জন্য এসেছিলেন। এমনও কিছু ছিল যারা হকপন্থীদের সাথে সন্ধি ও নিরাপত্তা চুক্তি সাধনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা এসেছিলেন। তাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিনিধি দল ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারণে ইসলাম গ্রহণ অথবা আনুগত্য প্রকাশের পূর্বে আশ্চর্য ধরনের শর্ত আরোপ করেছিলেন। মহানবী (সা) এসব শর্তের যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন। এমনি ধরনের একটি প্রতিনিধি দল ছিল বনু তামিম। ৭০ অথবা ৮০ জনের সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিনিধি নবম হিরজীতে (প্রতিনিধি দলের বছর) অত্যন্ত ঠাট-বাটের সঙ্গে মদীনা এসেছিল। তাদের মধ্যে গোত্রের বড় বড় সরদার ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা ছিল খুব দেমাগী মানুষ এবং নিজেদের ভাষা, বক্তৃতা ও কাব্য জগত প্রশ্নে কাউকে কোন পাত্তা দিত না। তারা রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে বললো, মুসলমানরা আগে আমাদের সাথে কীর্তিগাথা বর্ণনা করবে। যদি তারা তাতে জয়ী হয়, তাহলে ইসলামের কথা হবে।

হুজুর (সা) তাদের জবাবে বললেন, আমি গর্ব বা অহংকার প্রকাশ এবং কবিতাবাজীর জন্য প্রেরিত হইনি। কিন্তু তোমরা যদি তাতে পীড়াপীড়ি করো তাহলে আমরা সে ব্যাপারেও দুর্বল ও সামর্থহীন নই। অনুমতি পেয়ে বনু তামিমের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আতারফ বিন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এক ওজস্বী বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি স্বগোত্রের মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব, উচ্চ বংশ গৌরব, বিত্ত-বৈভব, বীরত্ব এবং মেহমানদারীর কথা অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করলেন। যখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হলো তখন হুজুর (সা) হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারীকে তার জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ বা প্রশংসা বর্ণনা করলেন। অতপর মহানবীর (সা) নবুওয়াত, দাওয়াতে হকের বিস্তারিত, কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং মুহাজির ও আনসারের ফজিলত এমন অলংকারপূর্ণ ভাষায় বাগ্মীতার সাথে বর্ণনা করলেন যে মজলিস সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

www.bjilibrary.com

তারপর বনু তামিমের পক্ষ থেকে যবরকান বিন বদর কবিতার মুকাবিলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা পাঠ করলেন। তাতে স্বগোত্রের উচ্চমার্গীয় প্রশংসা স্থান পেয়েছিল। তিনি যখন বসলেন, তখন হুজুর (সা) হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিতকে তার জবাব দানের জন্য উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। হযরত হাসসান (রা) নির্দেশ পালন করলেন এবং এমন প্রভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করলেন যে, তার সামনে যবরকান বিন বদরের কবিতা ম্লান হয়ে গেল। যেই তিনি নিজের জবাবী কবিতা শেষ করে বসলেন, সেই বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার চুল উড়ছিলো এবং একটি পা ছিল খোঁড়া। কিন্তু তাঁর চেহারা ও চাল-চলনে ছিল নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ এবং এটা পরিষ্কার জানা যাচ্ছিল যে, তিনি কবিলার নেতা ছিলেন। তিনি প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে সম্বোধন করে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"পিতার কসম মুহাম্মাদের (সা) খতিব আমাদের খতিব থেকে আফজাল এবং তাঁর কবি আমাদের কবি থেকে উত্তম। তাঁদের কণ্ঠস্বরে আমাদের কণ্ঠস্বর থেকে বেশী চিত্তাকর্ষক ও মিষ্টি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। এর পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা তাঁকে কোন ক্ষতি করতে পারেনি।"

প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য তাঁর কথার জবাবে এক বাক্যে বলে উঠলেন, "আপনি সত্য কথা বলেছেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন," এবং তৎক্ষণাৎ সকল তামিমী নিজের হাত মহানবীর (সা) পবিত্র হাতে দিয়ে দিলেন।

এই ব্যক্তি যিনি পারস্পরিক অহংকার প্রকাশে স্বগোত্রের পরাজয়কে প্রকাশ্যে মেনে নিলেন এবং সকল কবিলাবাসীকে ইসলামের সীমায় নিয়ে এলেন তিনি ছিলেন হযরত ফিরাসুল আকরা' তামিমী (রা)।

হযরত ফিরাসুল আকরা' (রা) যাঁকে ইতিহাসে সাধারণত আকরা' (রা) বিন হাবিসের নামে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন আরবের মশহুর কবিলা বনু তামিমের বাহাদুর ও নামকরা সরদার। নসবনামা হলো ঃ

ফিরাস (রা) (আকরা') বিন হাবিস বিন আবকান অথবা (আ'কাল) বিন মুহাম্মাদ বিন সুফিয়ান বিন মাজাশি' বিন দারিম বিন মালিক বিন হানজালা বিন মালিক বিন যায়েদ বিন মানাত বিন তামিম।

চরিতকাররা হযরত ফিরাসের (রা) তিনটি লকব বর্ণনা করেছেন। তাহলো আল-আকরা', আল-আ'রাজ এবং জিরার। আল-আকরা' এ জন্য যে তাঁর মাথার চুল ফুরফুর করে উড়তো। আল-আরাজ এ জন্য যে, তাঁর একটি পা

www.bjilibrary.com

খোঁড়া ছিল। জিরার (অর্থাৎ একহাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দানকারী) এ জন্য যে, তিনি খুব বাহাদুর ছিলেন। জাহেলী যুগের যুদ্ধ ইয়াওমুল কিলাবুল অওয়াল অথবা (আছ-ছানীতে) তিনি বনু হানজালার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নসবের দিক থেকে হযরত ফিরাসুল আকরা'কে (রা) আত-তামিমা ছাড়া আল-মাজাশেয়ী, আদ-দারেমী এবং আল-হানজালাও বলা হয়ে থাকে।

হযরত আকরা'(রা) বিন হাবেস অত্যন্ত বাহাদুর এবং তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কাব্য সাহিত্যেও বুৎপত্তি রাখতেন। তিনি শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেরই নেতা ছিলেন না বরং সমগ্র আরবে তাঁর ইজ্জত ও শরাফতের স্বীকৃতি ছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবাতে" এবং মুহাম্মাদ বিন হাবিব (র) "কিতাবুল মুহাব্বারে" লিখেছেন যে, হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেস জাহেলী যুগে আরব জ্ঞানী, সালিশ ও নেতাদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

আল্লামা মুজাদ্দিদুদ্দিন ফিরোযাবাদী সাহিবিল কামুস বর্ণনা করেছে যে, জাহেলী যুগে ওকাজের মেলার সময় আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক বিবাদ মেটানোর দায়িত্ব ছিল বনু তামিমের ওপর। বনু তামিম আরববাসীর সালিশ অথবা বিচারক ছিলো। ইসলামের আত্মপ্রকাশের সময় এই পদ ছিলো হযরত আকরা' বিন হাবেসের করায়ত্বে। ইসলাম গ্রহণের পরও হযরত আকরা'র (রা) পার্থিব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রলো। মানুষ সবসময়ই তাঁকে একজন শরীফ, বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী সরকার হিসেবে মান্য করতো।

হযরত আকরা' (রা) ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য কখন লাভ করেছিলেন? সে ব্যাপারে দু'টি ভিন্ন ধরনের মত রয়েছে। এক মত অনুযায়ী, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন মুসলমান মুজাহিদ হিসেবে মক্কা বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন (ইবনে হাযম এই মত পোষণ করেন)। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা হলেন ইবনে আছির (র)। তিনি "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন, হযরত আকরা' (রা) নবম হিজরীতে বনু তামিম প্রতিনিধি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবুও একথা স্বীকৃত যে, তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন এবং তায়েফে হুজুরের (সা) সাথে ছিলেন এবং হুজুর (সা) তাঁর সঙ্গে "মুয়াল্লিফাতুল কুলুব"-এর মত আচরণ করেছিলেন। (মুয়াল্লিফাতুল কুলুবে নওমুসলিম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অমুসলিমও। তারা ইসলামে প্রভাবান্বিত ছিল।) ইবনে আছিরের (রা) মত যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, হযরত আকরা' (রা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের প্রভাবে অবশ্যই প্রভাবান্বিত

www.bjilibrary.com

হয়েছিলেন এবং সেই প্রভাবের কারণেই তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে হুজুরের (সা) সমর্থন এনে দাঁড় করিয়ে ছিল।

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয়ের পর প্রিয় নবী (সা) গনিমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় হযরত আকরা'কে (রা) তালিফে কলব হিসেবে একশ' উট প্রদান করেছিলেন। প্রখ্যাত কবি সাহাবী হযরত আব্বাস (রা) বিন মিরদাস সালমার হযরত আকরা'র (রা) সাথে বিশেষ আচরণে অত্যন্ত ঈর্ষা হলো। কেননা তিনি কম উট পেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু কবিতা রচনা করলেন। এই কবিতায় মনের ব্যথা প্রকাশ পেয়েছিল। হুজুর (সা) এই কবিতা শুনে হযরত আলীকে (রা) বললেন! "তার জিহ্বা কেটে দাও।" হযরত আলী (রা) আব্বাস (রা) বিন মিরদাসের হাত ধরলেন এবং বললেন যে, আমার সঙ্গে চল। তিনি রাস্তায় হযরত আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আলী, আমার জিহ্বা কি কেটে ফেলবে ? হযরত আলী (রা) বললেন, তুই আমার সাথে আয়। আমি রাসূলের (সা) নির্দেশ পালন করবো।

এভাবে কথা বলতে বলতে হযরত আলী (রা) আব্বাস (রা) বিন মিরদাসকে উটের পালে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, "একশ' উট এই পাল থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বেছে নে।" হযরত আব্বাস (রা) একশ' উট বেছে নিলেন এবং খুশী হয়ে গেলেন।

নবম হিজরীতে বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমন রাসূলের (সা) যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা সে সময় কুরআনে হাকিমের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। যদিও সে বছর আরবের প্রতিটি কোণা থেকে নবীর (সা) দরবারে প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) এবং হাফেজ ইবনে কাইয়েমের বক্তব্য অনুযায়ী বনু তামিম প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমনের একটি কারণ ছিল। কারণটি হলো, নবম হিজীর মুহাররাম মাসে রাসূলে আকরাম (সা) আইনিয়া বিন হাসান ফাজারীকে ৫০টি সওয়ার সমেত বনু তামিমের একটি বংশ বনু আম্বরকে উৎখাতের জন্য প্রেরণ করেন। কেননা তারা অন্যান্য গোত্রকে উত্তেজিত করে খিরাজ প্রদানে নিষেধ করেছিল। তারা ইসলামী বাহিনী দেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের ৬২ ব্যক্তিকে ধরে মদীনায় নিয়ে এলেন। এই ৬২ ব্যক্তির মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০টি শিশু ছিল। বনু তামিম এই কয়েদীদেরকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করলো। এই প্রতিনিধি দলে আকরা' (রা) বিন হারেসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারা পৌছে কয়েদীদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

নিজেদের মহিলা ও শিশুদেরকে দেখে খুব অস্থির হয়ে পড়লো। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য মহানবীর (সা) আবাসস্থলের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল। আকরা' (রা) অস্থিরচিত্তে উচ্চৈস্বরে বললেন, "হে মুহাম্মদ ! বাইরে বের হয়ে আমাদের কথা শোনো।" কতিপয় মুফাস্সির লিখেছেন, সে সময় এই আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"(হে নবী!) যেসব লোক তোমাকে হুজরাগুলোর বাহির থেকে ডাকাডাকি করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ। তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে এটা তাদের জন্যই ভালো ছিল। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।"–(সূরায়ে আল হুজুরাত ঃ ৪-৫)

মওলবী সাইয়েদ আমীর আলী (র) "মাওয়াহিবুর রহমান" তফসীরে স্বয়ং হযরত আকরার (রা) কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সে সময় আমার মধ্যে অজ্ঞতা ও মরুচারিতা বিদ্যমান ছিল এবং আমি নিজের অভদ্রতার মাধ্যমে হুজরার বাহির থেকে চেঁচিয়ে বলেছিলাম যে, হে মুহাম্মদ (সা) ! বেরিয়ে আমাদের নিকট এসো।

অহমিকার প্রতিযোগিতার পর যখন বনু তামিম নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিলো তখন হযরত আকরা' (রা) কয়েদীদের মুক্তির সুপারিশ করলেন। হুজুর (সা) তাদের সুপারিশ মেনে নিলেন এবং কয়েদীদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গেই বনু তামিমের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) "যাদুল মায়াদ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হুজুরে আকরাম (সা) প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে প্রচুর ইনয়াম প্রদান করেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনু তামিমের প্রতিনিধি দল রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলে হযরত আবু বকর (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন যে, কা'কা বিন মাবাদকে তাদের আমীর বানিয়ে দিন। হযরত ওমর (রা) বললেন, আকরা' বিন হাবেসকে আমীর নিয়োগ করুন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) [হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে] বললেন, তুমি তো ব্যস আমার বিরোধিতা করার জন্যই কোমর বেঁধে লেগেছ। হযরত ওমর (রা) জবাব দিলেন যে, আমি

www.bjilibrary.com

আপনার বিরোধিতা করি না। (বরং এটা আমার রায় বা মত) এই আলোচনায় উভয়ের কণ্ঠস্বর অনেক চড়া হয়ে গেল। তাতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ ○

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ে যেও না। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। হে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা, নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর চেয়ে উচ্চ করো না। নবীর সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথাও বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাকো। তোমাদের সৎকাজসমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে, তোমরা তা টেরও পাবে না।"–(সূরায়ে আল হুজুরাত ঃ ১-২)

"ফাতহুল বারীতে" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াত নাযিলের পর আমি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি কসম খেয়েছি যে এখন আমি আপনার সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলবো যেমন কেউ গোপন কথা বলে।

পক্ষান্তরে হযরত নাফে'র (রা) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুকের (রা) অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি রাসূলের (সা) দরবারে খুব আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলেন। আস্তেও এমন আস্তে যে যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর থেকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করতেন, কিছুই বুঝতে পারতেন না যে তিনি কি বলছেন।

হযরত আকরা' (রা) নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সঠিক মত, বংশীয় মর্যাদা এবং হকের সমর্থনে সবসময় প্রস্তুত থাকার কারণে নবীর দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে মুয়াল্লিফাতুল কুলুবের মধ্যে পরিগণিত করে গনিমতের মাল ও সাদকা থেকে নিয়মিত অংশ প্রদান করতেন। এটা ছিল আল্লাহর সেই ইরশাদ ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ –

"এই সাদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

হাফেজ ইবনে হাজার "আল-ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পরও হযরত আকরা'র (রা) ইজ্জাত ও শরাফত স্বীকৃত ছিল এবং তিনি ঈমান ও ইসলামেও মজবুত ছিলেন।

বিদায় হজ্জের পূর্বে মহানবী (সা) হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। সেখান থেকে হযরত আলী (রা) কিছু স্বর্ণ হুজুরের (সা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এই স্বর্ণ চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। স্বর্ণ প্রাপক চার ব্যক্তির মধ্যে হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেসও ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) নিজের "সহীহ" গ্রন্থে এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আলী (রা) বিন আবি তালিব ইয়েমেন থেকে রাসূলের (সা) খিদমতে কিছু স্বর্ণ (স্বর্ণের পাত) পাকা চামড়ার মধ্যে রেখে প্রেরণ করলেন। এই স্বর্ণ তাঁর নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তিনি আইনিয়া (রা) বিন বদর, আকরা' (রা) বিন হাবেস, যায়েদুল খায়েল (রা) এবং আলকামা (রা) অথবা আমের (রা) বিন তোফায়েল নামক চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সাহাবীদের (রা) মধ্য থেকে একজন বললেন, আমরা তাঁদের তুলনায় বেশী হকদার। তিনি একথা জানতে পেরে বললেন, তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না। অথচ আমি আসমানবাসীর আমানতদার। আমার নিকট সকাল-সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।"-(বুখারী কিতাবুল মাগাযি)

আল্লামা বালাজুরী (র) আনসাবুল আশরাফে লিখেছেন, নবী করীম (সা) হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেসকে বনু দারিম বিন মালিক বিন হানজালার সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতুহুল বুলদানে" বর্ণনা করেছেন, নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল যখন মদীনা মুনাওয়ারা এলো তখন হুজুর (সা) একটি প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। সেই চুক্তিপত্রে যেসব সাক্ষী সই করেন তাঁদের মধ্যে হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এসব রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত আকরা (রা) হুজুরের (সা) পূর্ণ আস্থাভাজন ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আকরা' (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত থেকে নবীর ফয়েজে অভিষিক্ত হতেন। তিবরানী হযরত সায়েব (রা) বিন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আকরা' (রা) নবীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হযরত হাসান (রা) খেলতে খেলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) ভালোবাসার আধিক্যে তাঁর মুখ ও মাথায় চুমু দিলেন। হযরত আকরা' (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দশটি পুত্র রয়েছে। আমি কখনো কারোর মাথা ও মুখে চুমু দিইনি। হুজুর (সা) বললেনঃ "আল্লাহ তার ওপর রহম করেন না যে মানুষের ওপর রহম করে না।"

এই রেওয়ায়াত কিছু শব্দের ভিন্নতাসহ সহীহ বুখারীতেও স্থান পেয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে হুজুরের (সা) সাথে এসব শব্দ সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে ভালোবাসা ছিনিয়ে নেন তাহলে আমি কি করবো।" এমনিভাবে হুজুর (সা) হযরত আকরা'কে (রা) এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সন্তানকে ভালোবাসা এবং তার মুখ ও মাথায় চুমু দেয়াও তার অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম "যাদুল মায়াদে" একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আকরা' (রা) অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ঘটনাটা ছিলো, এক অভিযানে আমের বিন আজবাতুল আশজারী কোন ভুলের কারণে হযরত মাহলাম (রা) বিন জাসামাতাল লায়েসীর হাতে মারা যায়। বনু আশজা' হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে কিসাস দাবী করলো। তিনি দিয়্যত দিতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হলো না। শেষে হযরত আকরা' (রা) যখন তাদেরকে বুঝালেন তখন তারা দিয়্যত গ্রহণে রাজী হয়ে গেল।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে একবারে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। কেননা মদীনার আনসার, মক্কার কুরাইশ এবং বনু ছাকিফ ছাড়া এমন কোন কবিলা ছিল না যারা এ ফিতনায় জড়িত হয়নি। হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেস সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামের সঠিক পথে অটল ছিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গী হয়ে ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধে মুরতাদদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করেছিলেন। (আল-ইসাবা)

হাফেজ জাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আকরা' (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ইরানীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে নিজের

www.bjilibrary.com

তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেছিলেন। মুসলমানরা আম্বারের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। হযরত আকরা' (রা) এ সময় অগ্রবর্তী বাহিনীর অফিসার ছিলেন। (তাজরিদে আসমাউস সাহাবা)

ইমাম বুখারী (র) "তারিখে সগিরে" লিখেছেন, একবার হযরত আকরা' (রা) বিন হাবিস আইনিয়া বিন হাসান সমভিব্যাহারে হযরত আবু বকরের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে জায়গীরের আবেদন জানালেন। হযরত ওমরও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আকরা'কে (রা) সম্বোধন করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার তালিফে কলব করতেন। কিন্তু এখন তোমার পরিশ্রম করা উচিত।

প্রখ্যাত মিসরীয় লিখক মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল স্বলিখিত গ্রন্থ "ওমর ফারুকে আজম (রা)" এই ঘটনা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। এ সময় তিনি রাসূলের (সা) যুগের সকল দান বা উপঢৌকন বহাল রাখলেন। কিছুদিন পর আইনিয়া বিন হাসান এবং আকরা' (রা) বিন হাবিস খলিফার দরবারে হাজির হলেন ও জমি দাবী করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) জমির ব্যাপারে তাদেরকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে দিলেন। হযরত আবু বকরের (রা) ওফাতের পর উভয় ব্যক্তিই হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশ অব্যাহত রাখার নিবেদন জানালেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তাদের নিবেদন এই বলে প্রত্যাখান করলেন যে, আল্লাহ ইসলামের উত্থান ঘটিয়েছেন এবং তোমাদের থেকে মুখাপেক্ষী হীন করে দিয়েছেন। এখন তোমরা (জায়গীর ও উপঢৌকন ছাড়া) ইসলামের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে যাও। নচেৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে। অতপর হযরত ওমর (রা) "মুয়াল্লিফাতুল কুলুব" নামে পরিচিত সকল মানুষকে সাধারণ মুসলমানের দলে অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) এই সিদ্ধান্তে হযরত আকরা' (রা) কিছুই মনে করলেন না এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জিহাদের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করতে লাগলেন ও জিহাদ করতে করতেই তিনি শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন।

হযরত আকরা'র (রা) শাহাদাতের বছর ও স্থানের ব্যাপারে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজিউশশাতিবির মত অনুযায়ী তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিজরী) নিজের ১০ পুত্রসহ শাহাদাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু হাফেজ জাহাবী (র) এবং আল্লামা বালাজুরী (র) লিখেছেন, হযরত ওসমান গনির (রা)

www.bjilibrary.com

খিলাফতকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের হযরত আকরা'কে (রা) সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়ে খোরাসানের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। জাওযানের গুরুত্বপূর্ণ শহরও তাঁর হাতেই জয়লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধে তিনি এমন মারাত্মক আঘাত পান যে, আর সুস্থ হননি এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চিরঞ্জীব হয়ে যান।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এই রেওয়ায়াতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আমরাও এটাকেই সঠিক বলে মনে করি।

---

www.bjilibrary.com

হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়ের মুযনি

তায়েফ যুদ্ধের (অষ্টম হিজরী) কিছুদিন পরের কথা। একদিন রহমতে আলম (সা) মসজিদে নববীতে কতিপয় জাননিছার সঙ্গীসহ বসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নিজের বাণী শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে মসজিদের দরজায় একটি উটনী এসে থামলো। শরীরে দাগপড়া এক ব্যক্তি উটনী থেকে নামলেন। তাঁর মাথা থেকে মুখ পর্যন্ত কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে মহানবীর (সা) খিদমতে এসে বসলেন। হুজুর (সা) তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন। সে সময় সেই ব্যক্তি অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর সত্য রাসূল ! আমি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করছি। আপনার মুবারক হাত সম্প্রসারিত করুন। যাতে আমি বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।"

হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত প্রসারিত করলেন। সেই ব্যক্তি যখন বাইয়াত করলেন, তখন প্রিয় নবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

নবাগত নিজের নাম বললেন এবং সাথে সাথে মুখের কাপড় খুলে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ রাসূল! আমি কি নিরাপদ ?"

তাঁর চেহারা দেখেই তরবারী হাতে এক আনসার সামনে অগ্রসর হলো এবং বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহর এই দুশমনের মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলার অনুমিত দিন।"

রহমতে আলম (সা) বললেন, "না, এই কাজ করো না। এই ব্যক্তি তাওবা করে এসেছে। এখন তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র এরশাদ শুনে খুশীতে সেই ব্যক্তির চেহারা ঝলমল করে উঠলো এবং তিনি রাসূলের (সা) দরবারে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একটি দীর্ঘ কাসিদা পাঠ শুরু করলেন। যখন তিনি কাসিদার এই স্থানে পৌঁছলেন ঃ

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ

مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلُ

www.bjilibrary.com

তখন মহানবী (সা) নিজের মুবারক চাদর খুলে ইনয়ামস্বরূপ তাঁকে প্রদান করলেন।

এই সেই ব্যক্তি যাঁর কবিতা শুনে প্রিয় নবী (সা) খুশী হয়েছিলেন এবং যাঁকে সাইয়েদুল আনাম (সা) নিজের মুবারক চাদর দান করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত কা'ব (রা) বিন 'যুহায়ের মুযনি'।

হযরত আবু উকবা কা'ব (রা) বিন যুহায়েরের সম্পর্ক ছিল মুদার গোত্রের শাখা মুযনিয়ার সাথে। মায়ের নাম ছিল কাবশা বিনতে বাশামা। তিনি বনু গাতফানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হযরত কা'বের (রা) পিতা যুহায়ের বিন আবি সুলমা জাহেলী যুগের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি সেই সাতজন প্রখ্যাত কবির অন্যতম ছিলেন যাদের কাসিদা লিখে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে টাঙ্গিয়ে রাখা হতো। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে "আশয়ারু শুয়ারাউল আরব" অর্থাৎ সবচে বড় আরবী কবি বলে আখ্যায়িত করতেন।

হযরত কা'বের (রা) খান্দান নজদে বসবাস করতো এবং কাব্য সাহিত্যে সমগ্র আরবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। পিতা যুহায়ের ব্যতীত তাঁর দাদা আবু সুলমা রবিয়া, নানা, ভাই এবং ফুফুরা সকলেই কাব্য ও ভাষা সমুদ্রের সাঁতারু ছিলেন। বংশীয় প্রভাবের কারণেই শৈশবকালেই কা'ব কাব্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পিতা যখন একথা জানতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে কবিতা রচনা করতে নিষেধ করলেন। কেননা, তার ধারণায় অপ্রাপ্ত বয়সে রচিত কবিতার দুর্বলতা প্রখ্যাত কবি বংশের খ্যাতিতে কালিমা লিপ্ত করতে পারে। কিন্তু কবিতা রচনার যোগ্যতা কা'বের (রা) প্রকৃতিতে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। তিনি কবিতার অনুশীলন অব্যাহত রাখলেন। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁর কিছু কবিতা পিতার দৃষ্টিতে পড়লো। পিতা তা পাঠ করে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর কাব্য যোগ্যতার স্বীকৃতি দিলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে কবিতা রচনার অনুমতি প্রদান করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, পিতা তাঁর কঠিন পরীক্ষা নিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তাতে খুশী হয়ে তাঁকে কাব্য রচনার অনুমতি দিলেন। এই কা'বই (রা) একদিন সমগ্র আরবে এক শক্তিধর কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

কা'বের (রা) প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে চরিতকাররা সাধারণত তেমন কিছু বলেননি। খুব বেশী হলেও এতটুকুন জানা যায় যে, শৈশবকাল থেকে

www.bjilibrary.com

যৌবনকাল পর্যন্ত তিনি বনি গাতফান এলাকায় অতিবাহিত করেছেন। এই যুগে তিনি নিজের পিতা ও অন্যান্য বুজর্গের তত্ত্বাবধানে কবিতা রচনার অনুশীলন করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল-ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন, মশহুর মাখজারামী কবি হাতিয়া (আবু মালিকা জাবদাল বিন আওস আবাসী) ও কা'বের (রা) সহপাঠি ছিল এবং দু'জনই যুহায়ের বিন আবি সুলমার কাছ থেকে সাহায্য নিতেন।

বিভিন্ন কার্যকারণ থেকে জানা যায় যে, কা'ব (রা) সমর সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন এবং জাহেলী যুগে নিজের গোত্রের যুদ্ধসমূহে অংশ নিতেন। কুরাইশের বনু মুযনিয়া, বনু তাই এবং খাজরাজের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, কা'ব (রা) তাতে নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিলেন এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা পাঠ করে করে যুদ্ধে স্বপক্ষীয় জওয়ানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

হযরত কা'ব (রা)-এর পিতা যুহায়ের প্রিয় নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সামান্য কিছুদিন পর মারা যান। এ সময় কা'ব (রা) এমন ধরনের শোকগাথা রচনা করতেন যে, যে শুনতো তারই চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়তো।

যে যুগে কা'বের (রা) কাব্যখ্যাতি নজদ থেকে আরবের দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো, সে সময় ইসলামের হেদায়াতের আলোও আরবের সমগ্র অঞ্চলে আলোকিত করতে শুরু করেছিল। কা'ব (রা) এবং তার ভাই বুজায়েরের (রা) কান পর্যন্তও দাওয়াতে হকের আওয়াজ পৌছলো। কিন্তু তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন না। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দুইভাই স্বদেশ থেকে বের হয়ে আবরাকুল আজজাফ নামক স্থানে এলেন। এখানে পৌছে বুজায়ের (রা) কা'বকে (রা) বললেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর এবং নিজের ভেড়া-বকরী হেফাজত করতে থাকো। আমি একটু ইয়াছরাব গিয়ে সাহিবে কুরাইশের (রাসূলে আকরাম) নিকট জেনে আসি যে, তিনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

বুজায়ের (রা) রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সুন্দর চেহারা এবং পবিত্র বাণীতে এমন প্রভাবিত হলেন যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারাতেই রয়ে গেলেন।

কা'ব (রা) বুজায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণ ও মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের খবর পেলেন। এ সময় তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং রাগত অবস্থায় মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শানে

কতিপয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতা বলে ফেললেন এবং মদীনা গমনকারী এক ব্যক্তির মাধ্যমে এসব কবিতা হযরত বুজায়েরের (রা) নিকট পৌছে দিলেন।

হযরত বুজায়ের (রা) রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের আকা ও মাওলার (সা) শানে ঔদ্ধত্য কি করে বরদাশত করতে পারেন। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে হুজুরকে (সা) এই কবিতাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। কা'বের (রা) এই তৎপরতায় রাসূলে করিম (সা) খুব কষ্ট পেলেন এবং বললেন ঃ

"মান লাকা কা'বান ফাল ইয়াকতুলুহু" অর্থাৎ কা'বকে যে দেখবে সেই যেন তাকে হত্যা করে ।

কিছু নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই মত প্রকাশ করেছেন যে, শুধুমাত্র এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতাই কা'বকে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা দানের কারণ ছিল না বরং তার আরো অনেক কারণ ছিল। তাহলো, কা'ব আবরাকুল আজজাফ থেকে মক্কা চলে গিয়েছিলেন এবং মক্কায় কুরাইশদের সাথে এক হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক তৎপরতায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নিজের কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ এবং মুশরিকদেরকে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন।

এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, তিনি আবরাকুল আজজাফে নিজের ভাইয়ের সাথে মিলে হুজুরকে (সা) শহীদ করার পকিল্পনা বানিয়েছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই বুজায়েরকে (রা) মদীনা প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু বুজায়ের (রা) যখন মদীনা পৌছে ইসলাম গ্রহণ করে বসলেন এবং এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে গেল তখন হুজুর (সা) কা'বের রক্ত বৈধ করে দিলেন।

অধিকাংশ রেওয়ায়াত থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, এই ঘটনা হযরত বুজায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরই (৬ষ্ঠ হিজরীর দিকে) সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনা মহানবী (সা) তায়েফ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সংঘটিত হয় যা হোক, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরত বুজায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর দু'ভায়ের পথ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বুজায়ের (রা) হক পথের এক জানবাজ সিপাহী হয়ে গেলেন এবং কা'ব ইসলাম বিরোধিতাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিলেন।

ইবনে হিশাম লিখেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সংঘটিত যুদ্ধসমূহে যেমন খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফে হযরত বুজায়ের (রা) প্রিয় নবীর

www.bjilibrary.com

(সা) সাথে সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি জীবনবাজি রাখার কৃতিত্বও প্রদর্শন করেন। এসব যুদ্ধে তিনি হক ও ন্যায়ের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতা পাঠ করে জানা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র একজন ভালো কবিই ছিলেন না বরং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তাঁর প্রকৃতিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বনবী (সা) তায়েফের যুদ্ধ শেষ করে যখন মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন তখন হযরত বুজায়ের (রা) পত্র লিখে কা'বকে অবহিত করলেন যে, প্রিয় নবী (সা) হাতে গোণা দু' চারজন হকের দুশমন ছাড়া সকল মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হত্যা তালিকার মধ্যে ইবনে খাতালও ছিল। সে হুজুরের (সা) শানে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করতো। অন্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনাকারীদের মধ্যে ছিল হাবিরা বিন আবি ওয়াহাব ও ইবনে যাবয়ারা। তারা মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়েমেনে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সত্ত্বেও ইবনে যাবয়ারা তাওবা করে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলো। তখন হুজুর (সা) তাকেও ক্ষমা করে দিলেন। পত্রে হযরত বুজায়ের (রা) লিখলেন, তোমার জীবনও বাঁচতে পারে যদি তুমি আমার পত্র পাওয়া মাত্র ইসলাম গ্রহণ কর এবং রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে নিজের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্যে লজ্জা প্রকাশ কর। হুজুরের (সা) অন্তর বড় প্রশস্ত। তিনি ভুল-ভ্রান্তিকারীদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

কা'ব হযরত বুজায়েরের (রা) পত্র পেয়ে প্রথমে নিজের ভাইয়ের পরামর্শ মুতাবেক আমল করলেন না এবং বিভিন্ন গোত্রে আশ্রয় নিতে চাইলেন। কিন্তু কোন গোত্রই তাঁকে আশ্রয়দানে সম্মত হলেন না। এমনকি নিজের গোত্র মুযনিয়াও তাকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃতি জানালো। অতপর তাঁর চোখ খুললো এবং হুজুরের (সা) নিকট আশ্রয় গ্রহণকেই তিনি নিজের জন্যে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করলেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, কা'বকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করে তোলার কারণ ছিল সেই কবিতাবলী যা হযরত বুজায়ের (রা) তাঁকে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। এসব কবিতা ছিল কা'বের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতাবলীর জবাব। সিরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنۡ مُبلُغَ كَعبًا فَهَل لَكَ فِى الَّتِى ـ تَلُومُ عَلَيهَا بَاطِلاً وَّهِى اَحزَمُ

الَي اللّهِ (لاالعزى ولا الات) وَحدهُ ـ فَتَنجُو اِذَا كَانَ النَّجَاءُ وَتَسلِمُ

لَدَى يَوْمٍ لا يَنْجُوا وَلَيْسَ بِمَفْلَتٍ ـ مِنَ النَّاسِ الْأَطَاهِرُ الْقَلْبُ مُسْلِمُ

فَدِينُ زُهَيْرٍ وَلَاءِ شَيْئٍ دَيْنَه ـ وَدِينَ أَبِى سُلْمٰى عَلَىَّ مُحَرَّمُ

অর্থ ঃ ১। কোন ব্যক্তি কা'বের কাছে গিয়ে আমার পয়গাম দেবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, যে দ্বীনকে তুমি গালি দাও তাতে খারাব কোন্ বস্তুটা রয়েছে ? সেই দ্বীন তো ভালো।

২। মুক্তি সড়ক হলো আল্লাহর রাস্তা। লাত উজ্জার রাস্তা নয়। যদি মুক্তি ও নিরাপত্তা চাও তাহলে আল্লাহর রাস্তায় চলে তা লাভ করো।

৩। সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন পাকবাজ ও পাক নফস মুসলমান ছাড়া কেউই মুক্তি লাভ করতে পারবে না।

৪। যুহায়েরের দ্বীন ছিল অবাস্তব এবং এমনিভাবে আবু সুলমার দ্বীনও আমার ওপর ছিল হারাম।

ইসলামের ব্যাপারে অন্তর খুলে যাওয়ার পর কা'ব (রা) কিভাবে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন ? এই প্রসঙ্গে পাঁচটি বর্ণনা রয়েছে ঃ

এক ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল-ইসাবাতু ফি তামাইয়িজুস সাহাবা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত কা'ব (রা) মদীনা মুনাওয়ারা পৌছে সোজা মসজিদে নববীর পথ ধরলেন। নবী করিম (সা) সেখানে কিছু সাহাবীর মধ্যে বসেছিলেন। কা'ব (রা) নিজের উটনীকে মসজিদের দরজায় বসালেন। অতপর নিজের কিয়াস অনুসারে অথবা বিশেষ আলামতসমূহ হুজুরকে (সা) পৌছালেন এবং কাতারসমূহ অতিক্রম করে তাঁর পবিত্র খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বসে পড়লেন। তারপর প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং এই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি হলাম কা'ব বিন যুহায়ের। আমি নিরাপত্তা কামনা করি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আচ্ছা, তুমি সেই ব্যক্তি যে সেই কবিতাবলী রচনা করেছিলেন ?" অতপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "একটু সেই কবিতাগুলো পাঠ করুন তো।" নবীর (সা) ইরশাদ শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই কবিতাবলী পাঠ করলেন ঃ

www.bjilibrary.com

اَلاَ اَبلغَا عَنّي بُجَيرًا رِسَالَةً ـ عَلى اَىّ شَيئٍ وَيبَ غَيرِكَ دَلَّكَا

عَلى خُلُقٍ لَم تَلف اُمًّ وَلاَ اَبًا ـ عَلَيهِ وَلَم تُدرِكُ عَلَيهِ اَخَالَكَا

سَقَاكَ اَبُو بَكرٍ بِكَاسٍ رَوِيَّةٍ ـ فَانهَلَكَ المَامُورُ مِنهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ ১। বুজায়েরকে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দাও যে, শেষ পর্যন্ত কোন্ বস্তু তোমাকে অন্যের ধ্বংস নিজের মাথায় নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

২। এই পথ না ছিল তোমার পিতামাতার। তোমার ভাইও এই পথ অবলম্বন করেনি।

৩। আবু বকর (রা) তোমাকে পূর্ণ পাত্র পান করিয়েছে এবং "মানুষ" তো তোমাকে সেই পাত্র থেকে খুব করে পান করিয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা) যখন কবিতার তৃতীয় লাইনের দ্বিতীয় পংক্তি পাঠ করলেন তখন কা'ব (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই পংক্তিতো এ রকম হওয়া উচিত।

فَانهَلَكَ المَامُونَ مِنهَا دَعَلَّكَا

অর্থাৎ মামুন সেই পেয়ালা থেকে খুব করে পান করিয়েছে।

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "মামুনুন ওয়াল্লাহি" (হাঁ, আল্লাহর কসম! মামুনই ঠিক)।

অতপর ইরশাদ হলো ঃ "তুমি নিরাপদ এবং তুমিও মামুন।"

মুশরিকরা নিজেদের গোপন মালিন্য প্রকাশের জন্য কোন কোন সময় হুজুরকে (সা) "মামুর" বলতো শব্দটির অর্থ হলো জ্বিনের অনুগামী হওয়া। বস্তুত এই শব্দ দিয়ে খারাব দিক প্রকাশ পেতো। এ জন্যে হযরত কা'ব (রা) তাকে "মামুন" (নির্ভীক, মাহফুজ) শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

ইবনে হিশামের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত কা'ব (রা) নিজের কবিতায় বাস্তবিকই "মামুন" শব্দই ব্যবহার করেছিলেন।

দুই ঃ ইবনে কুতাইবা "আশ শিয়রু ওয়াশ শুয়ারাউ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত কা'ব মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিদমতে হাজির হলেন। ফজরের নামাযের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কা'বকে (রা) মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির করলেন। সে সময় কা'ব (রা)

মুখের ওপর কাপড়ের পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় এবং আপনার বাইয়াতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ারও আকাংখা রাখে।"

প্রিয় নবী (সা) নিজের মুবারক হাত সামনে প্রসারিত করলেন। কা'ব (রা) বাইয়াত করে ফেলেছেন। এমন সময় তিনি নিজের মুখের ওপরকার কাপড়ের পট্টি খুলে ফেললেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি হলাম কা'ব বিন যুহায়ের এবং নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এই বর্ণনায় মশহুর তাবেয়ী হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইয়্যেবের উদ্ধৃতি দিয়ে এটুকুন বেশী বলেছেন যে, কা'ব (রা) মদীনা পৌঁছে লোকদেরকে সাইয়েদুল আনামের (সা) সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং নরম অন্তর সাহাবীর (রা) নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারা হযরত আবু বকরের (রা) নাম বললেন। কা'ব (রা) তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং সুপারিশ কামনা করলেন। সুতরাং সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন।

তিন ঃ সিরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ আছে, কা'ব মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে বনু জাহিনার এক ব্যক্তির নিকট রাত্রি যাপন করলেন। ব্যক্তিটি তাঁকে চিনতেন। সেই ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর কাব'কে (রা) মহানবীর (সা) সামনে পেশ করলেন। কা'ব ইসলাম কবুল এবং হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন।

হুজুর (সা) তাঁকে চিনতে পারলেন না। সুতরাং কা'ব (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কা'ব বিন যুহায়ের তাওবা করে এবং ঈমান আনয়নপূর্বক আপনার খিদমতে হাজির হতে চায় এবং নিরাপত্তার প্রত্যাশা করে। আমি যদি তাকে হাজির করি তাহলে কি আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন ?"

মহানবী (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ যদি সে সত্য অন্তরে ঈমান আনে এবং অতীত ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে তাওবা করে তাহলে সে নিরাপদ।"

একথা শুনে কা'ব (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমিই হলাম কা'ব বিন যুহায়ের।"

www.bjilibrary.com

চার ঃ আবু যায়েদ আল-কারাশী "জামহারাতু আশয়ারুল আরাব" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত কা'ব (রা) মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নিকট আশ্রয় চাইলেন। কিন্তু তিনি একথা বলে ক্ষমা চাইলেন যে, আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্জীর বিরুদ্ধে তিনি তাকে আশ্রয় দিতে পারেন না। অতপর কা'ব (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে গেলেন এবং আশ্রয়ের আবেদন জানালেন। তিনিও অস্বীকার করলেন। তারপর তিনি হযরত আলীর (রা) নিকটে গেলেন। তিনিও আশ্রয় দানের সাহস পেলেন না। অবশ্য তিনি তাকে হুজুরের (সা) পেছনে গিয়ে নামায পড়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি যখন নামায থেকে ফারেগ হবেন তখন এভাবে আরজ করবে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনার বাইয়াত করতে চাই।" হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত সামনে অগ্রসর করে দিবেন। এ সময় হাত ধরে নিরাপত্তা চাইবে। আশা করি, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত কা'ব (রা) হযরত আলীর (রা) পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং ক্ষমা পেলেন।

পাঁচ ঃ ইবনে আছির (র) স্বয়ং হযরত কা'বের (রা) মুখে এই ঘটনা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন, "আমি মসজিদে নববীর (সা) দরজায় নিজের উটনী বসালামা এবং মসজিদে প্রবেশ করলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা) একটি চত্বরের ওপর বসেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) দল বেঁধে তাঁর চার পাশে বসেছিল। হুজুর (সা) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে সম্বোধন করে কথা বলছিলেন। আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে বসে পড়লাম এবং কালেমা পড়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলাম। অতপর আমি নিরাপত্তা চাইলাম। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কে ?" আমি আরজ করলাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কা'ব বিন যুহায়ের।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে সেই কবিতা তুমিই বলেছিলে ?" তারপর তিনি হযরত আবু বকরকে (রা) সেই কবিতা পাঠ করতে বললেন। হযরত আবু বকর (রা) কবিতা পাঠ করতে করতে যখন "আল-মামুর" শব্দ উচ্চারণ করলেন তখন আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আল-মামুর, নয়, বরং শব্দটি হবে আল-মামুন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "মামুনুন ওয়াল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহর কসম মামুনই হবে।

ইবনে হিশাম আল্লামা ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন লোকজন জানতে পেল যে, নিরাপত্তা বা আশ্রয় প্রার্থনাকারী সেই কবি কা'ব

www.bjilibrary.com

বিন যুহায়ের। যাকে হুজুর (সা) ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ সময় একজন আনসার সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করতে চাইলো এবং এই উদ্দেশ্যে হুজুরের (সা) অনুমতি প্রার্থনা করলো। দয়ার সাগর মহানবী (সা) বললেন ঃ না, কা'ব তাওবাহ করে এসেছে। তার সাথে কোন বিবাদ করা যাবে না। একথা শুনে কা'ব খুশী ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি কাসিদা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে পেশ করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ, তোমার কবিতা শুনাও।"

অতপর কা'ব (রা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজের সেই কাসিদা পাঠ শুরু করলেন যা ইতিহাসে "কাসিদায়ে বানাত সুয়াদ" নামে খ্যাত হয়ে আছে এবং মহানবীর (সা) দরবারে তিনি ঈর্ষাপূর্ণ স্থান লাভ করলেন। এই কাসিদা ৫৮টি চরণ সম্বলিত ছিল।

কাসিদার শুরু ছিল এভাবে ঃ

بَانَت سُعَادُ فَقَلبِی الیَومَ مَتبُولُ ـ مُتَيَّمُ اِثرَهَا لَم يُفدَ مَكبُولُ

"সুয়াদ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ জন্য আমার অন্তর পীড়িত এবং সে এমন গোলাম ও কয়েদী যাকে (প্রেমের কয়েদ) কেউ ফিদিয়া মুক্ত করাতে পারে না।"

কাসিদা পড়তে পড়তে যখন তিনি এই চরণসমূহে পৌছলেন ঃ

اُنبِئتُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اَوعَدَنِی ـ وَالعَفوُ عِندَ رَسُولِ اللّٰهِ مَامُولُ

"আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হত্যার ধমক দিয়েছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি তো রাসূলের (সা) নিকট ক্ষমার আশা করি।"

اِنَّ الرَّسُولَ لَنُوتٌ يُستَضَاءُ بِه ـ مُهَنَّدٌ مِن سُيُوفِ اللّٰهِ مَسلُولُ

"অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি আলো বা নূর যা থেকে আলো লাভ করা যায় এবং আল্লাহর তরবারীসমূহের মধ্যে একটি খোলা বা উন্মুক্ত হিন্দী তরবারী।"

فِی عُصبَةٍ مِن قُرَيشٍ قَالَ قَائِلُهُم ـ بِبَطنِ مَكَّةَ لَمَّا اَسلِمُو زَولُوا

"আপনি কুরাইশ দলভুক্ত। যখন এই দল মক্কায় ইসলাম এনেছিল তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বললো এখান থেকে হিজরত করে চলে যাও।

এই কাসিদা পাঠের পর হুজুর (সা) বললেন ঃ এই কবিতাবলী মনোযোগের সাথে শোনো। কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী সেই সময় আবার কোন বর্ণনা মতে কাসিদা পাঠ যখন শেষ হলো তখন হুজুর (সা) চাদর খুলে হযরত কা'বের (রা) কাঁধের উপর রেখে দিলেন।

এটা ছিল বিরাট সম্মান বা গৌরবের ব্যাপার। কা'ব (রা)-এর নিকট সমগ্র দুনিয়ার নিয়ামত সমূহও এই তুলনায় ছিল নগণ্য। তিনি আজীবন সেই পবিত্র চাদর বুকে জড়িয়ে রেখে দিলেন এবং দরিদ্রতা সত্ত্বেও কোন মূল্যেই তা হাতছাড়া করেননি।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) পবিত্র চাদরটি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কা'বের (রা) নিকট থেকে কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই মহান ও প্রিয় সম্পদ বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

তাঁর ওফাতের পর তাঁর পুত্র উকবাতুল মুজাররাস সেই পবিত্র চাদরটি হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, বিশ, ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

বনু উমাইয়ার পর পবিত্র চাদরটি বনি আব্বাসের খলিফারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক আবুল ফিদা এবং ইমাম সুয়ুতি (র) বর্ণনা করেছেন, বাগদাদের পতনের পর তাতারীরা যখন লুটতরাজ চালায় তখন সেই পবিত্র চাদরটি হারিয়ে যায়। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, আব্বাসী বংশের যেসব ব্যক্তি তাতারীদের লুটতরাজ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা পবিত্র চাদরটি নিজেদের সঙ্গে করে প্রথমে সিরিয়া এবং পরে মিসর নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত বাদশাহ আল-মুলুকুজ জাহের বেবিরস মিসরে আব্বাসী খিলাফত পুনরুজ্জীবিত করেন। তারা বিশেষ বিশেষ সময় সেই পবিত্র চাদরটি গায়ে দিতেন।

তুর্কীরা মিসরীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর পর পবিত্র চাদরটি কাসতানতুনিয়া চলে যায় এবং আজও ইস্তাম্বুলের সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নির্মিত মহল "তোপ কাপির" ১২ নম্বর কক্ষে একটি সিন্দুকে তা সুরক্ষিত রয়েছে।

www.bjilibrary.com

"চাদর প্রদান" ঘটনার পর হযরত কা'বের (রা) জীবনের দিন-রাত্রি কেমনভাবে কেটেছিল, সে ব্যাপারে শুধু এতটুকুনই জানা যায় যে, তিনি কাসিদা রচনাকে জীবিকার মাধ্যম বানাননি। যা কিছু সম্পদ ছিল তার ওপর নির্ভর করেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও পবিত্র চাদর হিসেবে যে সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তার তুলনায় অঢেল বৈভবকেও তিনি কোন পাত্তা দেননি।

ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত কা'ব (রা) সাইয়েদেনা হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতের প্রথম দিকে (২৪হিঃ) অথবা হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালের শুরুতে (৪২ হিঃ) ওফাত পান। তিনি দুই পুত্র রেখে যান। তারা হলো উকবাতুল মুজাররাব এবং আল-আওয়াম। তারা দু'জনই কবি ছিলেন।

"বানাত সুয়াদু" কাসিদা ছাড়া হযরত কা'বের (রা) স্মরণীয় গ্রন্থ হলো 'দিওয়ান'। এই গ্রন্থে কিছু পূর্ণ এবং কিছু অপূর্ণ কাসিদা ও বিভিন্ন ধরনের কবিতা রয়েছে। এই দিওয়ান জার্মানী, পোল্যান্ড, মিসর ও লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়ের দু' যুগের কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন অর্থাৎ তিনি জাহেলিয়াত এবং ইসলাম দু' যুগই পান। এ কারণেই তাঁর কাব্য দু'যুগের বৈশিষ্টই বিধৃত আছে। অবশ্য জাহেলী যুগের প্রাধান্যই বেশী। কারণ, তিনি মহানবীর (সা) শেষ যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বানাত সুয়াদু একটি খ্যাতিমূলক কাসিদা। এ কাসিদাকে "কাসিদাতুল বুরদা" এবং "কাসিদাতুল উমাইয়া"ও বলা হয়। এই কাসিদা হযরত কা'বের (রা) শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই সাকিদা অধিকাংশ বর্ণনা শক্তি, রচনারীতি ও ধ্যান ধারণার দিক থেকে জাহেলী যুগের প্রতিচ্ছবি বলা যায়। তার কারণ হলো, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার যে মূল প্রেরণা সে সম্পর্কে তিনি এই কাসিদা রচনার সময় সম্পূর্ণ রূপে অনবহিত ছিলেন। তিনি এই কাসিদা ইসলাম কবুলের পূর্বে রচনা করে এনেছিলেন। এ জন্য তাকে সেই প্রেক্ষাপটেই গ্রহণ করা উচিত।

কাব্য বিচারে হযরত কা'বের (রা) কাব্য নিসন্দেহে উচ্চাঙ্গের কাব্য ছিল। চরিতকার ও সাহিত্য পণ্ডিতরা তাঁর কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ হাফেজ ইবনে আবদুল বার বলেছেন, কা'ব (রা) অত্যন্ত বড় মর্যাদার কবি ছিলেন। (আল-ইসতিয়াব)

ইমাম নববী (র) বলেন, "এই বংশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি হলেন যুহায়ের বিন আবি সুলমা এবং তারপর কা'ব (রা)।"

www.bjilibrary.com

ইবনে কুতাইবার (র) মত হলো, কা'ব (রা) সুন্দর বর্ণনার এবং শক্তিশালী কবি ছিলেন।

আল্লামা যারেকালি (র) লিখেছেন, "কাব নাজদের শীর্ষ স্থানীয় অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগের অন্যতম খ্যাতিমান কবি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। প্রকৃত কথা হলো কাব্য ও কবিতায় তাঁর ভিত্তি ছিল সকলের চেয়ে মজবুত এবং তিনি উঁচু বংশ মর্যাদা ও শারাফতের মালিক ছিলেন। (আল-আ'লাম)

আবুল ফারাজ ইস্পাহানী বলেন, "কা'ব হলেন মাখজারাসী এবং অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কবি।" (কিতাবুল আগানী)।

"বানাত সুয়াদু" কাসিদা কাব্য গুণে গুণান্বিত একটি অসাধারণ কবিতা। এই কাসিদার কবি স্বয়ং তা মহানবীর (সা) দরবারে পাঠ করেন এবং প্রিয় নবী (সা) পবিত্র চাদর প্রদান করে তাঁর সন্তুষ্টির সনদ দান করেন। এ জন্য এই কাসিদা প্রতি যুগেই অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমনকি দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কাসিদাটির ২০টি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদিক থেকে ইমাম বুসায়রীর (র) "কাসিদায়ে বুরদা" ছাড়া অন্য কোন কাসিদাকে সামনে আনা যায় না।

আরবী সাহিত্যের সুপণ্ডিত ডঃ যুবায়েদ আহমদ ঠিকই বলেছেন, "রচনাশৈলী ও ভাষাগত দিক থেকে কাসিদায়ে বানাত সুয়াদু নজিরবিহীন কাসিদা।"

এ কাসিদার তিনটি অংশ রয়েছে। দৃশ্যত তিনটি অংশ বিচ্ছিন্ন অংশ বলেই মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিন অংশের মধ্যে সুন্দর মিল রয়েছে। প্রথম অংশে জীবন সঙ্গিনী অথবা প্রেমিকা সুয়াদের বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জীবন সঙ্গিনীর নাকা সফরের প্রশংসা।

তৃতীয় অংশে আছে রাসূলে আকরামের (সা) প্রশংসা ও নাতিয়া কালাম। তাতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রশংসাও বর্ণিত হয়েছে। আর এই তৃতীয় অংশই এই কাসিদার সার বস্তু। এ জন্যই তা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাসিদাটির জনপ্রিয়তা দেখে অন্যান্য আরব কবিও "বানাত সুয়াদু" নামে কাসিদা লিখেছিলেন। কিন্তু তাদের কেউই হযরত কা'বের (রা) কাসিদার ধারেকাছেও পৌছতে পারেনি।

www.bjilibrary.com

হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ আমেরী

আরবের জাহেলী যুগের অন্যতম খ্যাতনামা কবি ছিলেন আবু আকিল লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ আমেরী। তিনি মান-ইজ্জত ও খ্যাতির দিক থেকে সূর্যের দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন। কাব্য সাম্রাজ্যে তিনি ইমরুল কায়েস, নাবিগাহ জুবিয়ানী, যুহায়ের বিন আবি সালমা, আমর বিন কুলছুম, আ'শা বিন কায়েস এবং তারাফাহ ইবনুল আবিদের মত খ্যাতনামা কবি ছিলেন। লাবিদের (রা) মহানত্বের বড় প্রমাণ হলো স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) তার কতিপয় কবিতা পছন্দ করেছিলেন। তিনি সেই সাত কবির একজন ছিলেন, যাঁদের কাসিদা জাহেলী যুগে মক্কাবাসী কা'বা শরীফে টাঙিয়ে রাখতেন। লাবিদের নসবনামা হলো ঃ

লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন মালিক বিন জাফর বিন কিলাব বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন সা'সা'হ আমেরী।

লাবিদের (রা) পিতা রবিয়াহ বিন আমের ছিলেন স্বগোত্রের সরদার। আর তিনি ছিলেন নজিরবিহীন দাতা। বিশ বিশটি গরীব ও মিসকিন সবসময় তার বাড়ীতে লালিত-পালিত হতো। এই উদারতা, মহানত্ব ও দানশীলতার জন্য তিনি কওমের পক্ষ থেকে "রবিয়ুল মুফতারিন" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। লাবিদ (রা) ছিলেন সেই পিতার যোগ্যতম উত্তরসুরী। দানশীলতা ও দরিদ্র প্রতিপালন তিনি পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং আজীবন অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে দানশীলতা অব্যাহত রেখেছিলেন। উপরন্তু তিনি বীরত্ব, অশ্বারোহণ, নির্মল প্রকৃতি এবং ন্যায়পরতার মত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই কাব্যজগতের প্রতি ছিল তার অপরিসীম আকর্ষণ। যৌবনকালে তিনি একবার নিজের চাচাদের সাথে নোমান আবু কাবুসের দরবারে গিয়েছিলেন। সেখানেই জাহেলী যুগের মহান কবি নাবেগাহ জুবিয়ানীর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি তাঁর কবিতা শুনে খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং বনি আমের ও বনু কায়েসের সকল কবির চেয়ে কাব্যগুণে তিনি এগিয়ে গেছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। অতপর তিনি ধীরে ধীরে আরবের জাহেলী কবিদের প্রথম কাতারে চলে আসেন এবং সমগ্র আরবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

জাহেলী যুগে লাবিদ (রা) প্রায়ই মক্কা যাতায়াত করতেন। নিজের কবিত্বগুণে তিনি কুরাইশের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইবনে

www.bjilibrary.com

আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর একবার তিনি মক্কা এলেন। এ সময় মক্কাবাসী তাঁকে খুব সম্মান করলো। সে সময় পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। অতএব, পূর্বেকার মতই তিনি কাব্য মাহফিল গরম করে চললেন। একদিন এমনি এক মাহফিলে নিজের কাসিদা শুনাচ্ছিলেন। যখন এই পংক্তি পাঠ করলেন ঃ

الاكل شئ ما خلا الله باطل

" সতর্ক থেকো। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এ সময় এই মজলিশে উপস্থিত জালিলুল কদর সাহাবী হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউন অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ "তুমি ঠিকই বলেছ।" কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয় পংক্তি পাঠ করলেন ঃ

وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَمُحَالَةَ زَائِلُ

"এবং প্রত্যেক নিয়ামত নিসন্দেহে নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

এ সময় হযরত ওসমান বলে উঠলেন ঃ "এটা ভুল কথা। জান্নাতের নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী এবং কখনো তা নিঃশেষ বা ধ্বংস হবে না।"

একথায় সারা মজলিশে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। লোকেরা হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউনকে গাল-মন্দ দিতে লাগলো এবং লাবিদকে পুনরায় পংক্তিদ্বয় পাঠের ফরমায়েশ করলো। তিনি কবিতাটির পংক্তিদ্বয় পুনরায় পাঠ করলেন। হযরত ওসমানও (রা) নিজের মন্তব্য পুনরুক্তি করলেন। তাতে লাবিদ খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম, পূর্বে তোমাদের মজলিশের এই অবস্থা ছিল না। সেই মজলিশে বসতে কেউই লজ্জা অনুভব করতো না এবং সেখানে কোন ধরনের বেয়াদবীও প্রদর্শিত হতো না। এই ব্যক্তি যদি আমাকে এভাবে বাধা দিতে থাকে তাহলে আমি আমার কবিতা শুনাতে পারবো না।"

লাবিদের কথা শুনে মুশরিকরা ক্ষেপে গেল এবং তারা হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউনকে গাল-মন্দ দিয়েই ক্ষান্ত হলো না বরং তার গায়েও তারা হাত তুললো। এ সময় যা হবার তা হলো। কিন্তু সেই ঘটনার ১৫-১৬ বছর পর যখন আল্লাহ পাক লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন তখন তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিতে লাগলো যে, ওসমান (রা) বিন মাজউন যা কিছু বলেছিলেন তা অবশ্যই সত্য ছিল।

www.bjilibrary.com

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন, মহানবী (সা) লাবিদের (রা) লিখিত এই পংক্তি খুবই পছন্দ করতেন ঃ

الاكل شئ مَاخَلا اللّٰهُ بـاطـل

"সতর্ক থেকো ! আল্লাহা ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হুজুর (সা) বলতেন, কবিদের কবিতার মধ্যে লাবিদের এই কবিতা খুব ভালো।

লাবিদের (রা) পিতা ইসলামের যুগ পাননি। স্বয়ং লাবিদই (রা) নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবগত দিক থেকে তিনি যদিও সুন্দর স্বভাব এবং শরীফ মানুষ ছিলেন কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, রিসালাতের শেষ দিকে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পিতৃধর্ম অথবা আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন খুব কঠিন হওয়ার কারণেই সম্ভবত তিনি এমনটি করেছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ নবম হিজরীতে বনু জাফর বিন কিলাব গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স মতান্তরে ৯০ অথবা ১১৩ বছর ছিল। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ ৪১ হিরজীতে ১৪৫ বছর বয়সে কুফায় ইন্তেকাল করেন। এই হিসেব অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের সময় (অর্থাৎ ৯ হিজরীতে) তাঁর বয়স ১১৩ বছরের কাছাকাছি হয়। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ৩২ বছর জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে "ইসাবা" ও "আগানি"র বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ৫৫ বছর জীবিত ছিলেন। এই হিসেব মতে ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ৯০ বছর ধরাটাই ঠিক হয়। আল্লাহ পাকই ব্যাপারটি ভালো জানেন।

অধিকাংশ চরিতকারই লিখেছেন, ঈমান আনার পর হযরত লাবিদ (রা) কবিতা রচনা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এক অথবা দু'টি কবিতা ছাড়া আর কোন কবিতা রচনা করেননি। এ ব্যাপারে তিনি বলতেন, আল্লাহ পাক কবিতার বিনিময়ে আমাকে সুরায়ে বাকারা ও আলে ইমরান প্রদান করেছেন। কথিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর শাসনামলে একবার হযরত লাবিদকে (রা) জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, ইসলামী যুগে আপনি কোন কবিতা রচনা করেছেন। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি যখন জানালেন যে, কবিতার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে বাকারাহ এবং আলে ইমরান প্রদান করেছেন তখন

হযরত ওমর (রা) এত খুশী হলেন যে, তাঁর ওজিফা বা ভাতা বৃদ্ধি করে দু' হাজার করে দিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিজের শাসনামলে একবার হযরত লাবিদকে (রা) বললেন, "লাবিদ আমার এবং তোমার ওজিফা সমান সমান। আমি তোমার ভাতা বা ওজিফা কমিয়ে দেব।"

তিনি বললেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করুন। অতপর আমার ওজিফাও আপনিই নিয়ে নিবেন।" (এটা তার বার্ধক্যের প্রতি ইঙ্গিত)।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) সম্ভবত ঠাট্টা করে ওজিফা কমানোর কথা বলেছিলেন। হযরত লাবিদের (রা) জবাব শুনে তিনি চুপ মেরে গিয়েছিলেন এবং ওজিফার অংক হ্রাস করেননি।

হযরত লাবিদ (রা) ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। এ জন্য যুক্তিযুক্ত ওজিফা প্রাপ্তির পরও অভাব লেগেই থাকতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রা) বর্ণনা করেছেন, জাহেলী যুগে তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে, প্রতি প্রত্যুষে তিনি পশু জবেহ করে লোকদেরকে খাওয়াবেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি আজীবন পালন করে গেছেন। কথিত আছে, লোকেরা তাঁর অভাবের কথা জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং যখনই ভোর হতো তখনই তারা উট এনে তাঁকে উপঢৌকন অথবা হাদিয়া হিসেবে দিতেন এবং তিনি তা জবেহ করে লোকদেরকে খাইয়ে দিতেন। এমনিভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন হতো।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়ার সুন্দর চরিত্রের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এবং লিখেছেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার, দানশীল, অশ্বারোহী, বীর এবং সত্যবাদী। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তিনি ছিলেন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত।

হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়ার দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে এবং জার্মান ভাষায় তার ব্যাখ্যা ও সমালোচনাও লিখা হয়েছে।

---

www.bjilibrary.com

হযরত মিহ্‌জা' (রা) বিন সালেহ

তিনি ছিলেন ইয়েমেনের কোন গ্রামের বাসিন্দা। একবার লুটেরারা তাঁদের গ্রামের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁকে ধরে মক্কা নিয়ে আসে। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে কিনে আযাদ করে দেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাবে বিভূষিত করেছিলেন। মক্কায় অবস্থান কালে তাওহীদের ধ্বনি তিনি শুনতে পান। তাওহীদের ধ্বনি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মুহূর্তও তা গ্রহণে দ্বিধা করেননি এবং সকল ধরনের পরিণাম সম্পর্কে বেপরওয়া হয়ে ইসলাম অনুসারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। নবুওয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছর পর মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে হিজরাতের অনুমতি দেন। এ সময় তিনি অন্যান্য সাহাবীর সাথে হিজরাত করে মদীনা গমন করেন। তিনি ইসলামের প্রথম কাতারভুক্ত বা সাবেকীন এবং মুহাজেরীনে মুয়ালী বনু আছির মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত মিহ্‌জাও' (রা) বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন এবং বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে তিনি নিজের কাতার থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের কাউকে মুকাবিলার আহ্বান জানালেন। এ সময় শত্রুপক্ষ কুরাইশের নামকরা যোদ্ধা আমের বিন হাজরামি যুদ্ধের জন্য বের হয়ে এলো। হযরত মিহ্‌জা' অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু অবশেষে আমেরের হাতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতের রিজওয়ান নামক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) ছাড়া ইবনে জারির তাবারী (র) এবং কতিপয় অন্য নেতৃস্থানীয় চরিতকার বর্ণনা করেছেন, হযরত মিহ্‌জা' (রা) যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন হঠাৎ করে কোন শত্রুর তীর তাঁকে আঘাত হানে এবং এই আঘাতেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁকে বদর যুদ্ধের সর্বপ্রথম শহীদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী

হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বুলতায়ার গোলাম ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন খাওয়াল্লী বিন সাবরাহ বিন দারিম বিন কায়েস বিন মালিক বিন আমিরাহ বিন আমেরুল কালবী লাখমী।

হযরত হাতিব (রা) বনি আসাদ বিন আবদুল উজ্জা কারাশীর মিত্র ছিলেন। বস্তুত প্রত্যেক গোত্রের গোলাম ও মিত্র সেই গোত্রভুক্ত হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকতো। এ জন্য হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী কুরাইশ মুহাজির বনি আসাদভুক্ত হয়ে আছেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিজরাতের অনুমতি প্রদানের পর তিনিও হযরত হাতিবের (রা) সাথে হিজরাত করে মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করেন। সর্বপ্রথম তিনি বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অতপর ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং এই যুদ্ধেই বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন।

এক বর্ণনায় আছে, হযরত সা'দের (রা) হত্যাকারী ছিল বনি কিনানার যিরাহ পরিধানকারী মুশরিক "ইবনে উয়াইমির।" সে যখন হযরত সা'দের (রা) ওপর তরবারীর আঘাত হানছিল তখন আনা ইবনে উয়াইমির (আমি উয়াইমিরের পুত্র) এই শ্লোগান দিয়েছিল। হযরত সায়াদ (রা) তার তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন। পাশেই আনসার বনি মুয়াবিয়ার গোলাম রশিদ ফারসী (রা) দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইবনে উয়াইমিরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং "খুজহা ওয়া আনাল গুলামুল ফারসি"(অর্থাৎ তাকে ধরো এবং আমি হলাম ফারসীর গোলাম) একথা বলে পূর্ণ জোরের সাথে তরবারীর আঘাত হানলো। তার তরবারী যিরাহ ভেদ করে ইবনে উয়াইমিরের কাঁধে দেবে গেল এবং নিহত হয়ে মাটিতে পতিত হলো। মহানবী (সা) এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি হযরত রশীদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে রশীদ! তুমি "খুজহা ওয়া আনাল গুলামুল আনসারী"–এ কথা কেন বললে না। ইত্যবসরে ইবনে উয়াইমিরের ভাই শিকারী কুকুরের মত এগিয়ে এসে হাক ছাড়লো, "আমি হলাম ইবনে উয়াইমির।" হযরত রশীদ (রা) তার ওপরও তারবারীর পূর্ণ আঘাত হানলেন। এই আঘাতে তার কাজ শেষ হয়ে গেল এবং মাথা দু'ভাগ হয়ে মাটিতে পড়লো। সে সময় হযরত রশীদ (রা) তাকরীর দিলেন, "খুজহা ওয়া আনাল গুলামুল আনসারী।"

হুজুর (সা) এই দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ 'মারহাবা! হে আবা আবদাল্লাহ।"

সেই দিনই হযরত রশীদের (রা) কুনিয়ত আবু আবদুল্লাহ হিসেবে মশহুর হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ নামের কোন পুত্র তাঁর ছিল না।

---

www.bjilibrary.com

হযরত খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ সাহমী

হযরত খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ সাহমী কুরাইশের বনু সাহাম গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ বিন কায়েস বিন আদি বিন সা'দ বিন সাহাম বিন আমর বিন হাছিছ বিন কা'ব বিন লুববী।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) বিনতে ওমর ফারুকের (রা) প্রথম বিয়ে তাঁর সাথেই হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত খুনাইসকে (রা) অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি সেই সব প্রথম মুসলমানের একজন ছিলেন যাঁরা মহানবীর (সা) হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কুরাইশের মুশরিকরা যখন হকপন্থীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুললো তখন বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে হাবসা বা আবিসিনিয়া হিজরাতের অনুমতি প্রদান করেন। হযরত খুনাইসও (রা) দ্বিতীয়বার হিজরাতে হাবশায় গমন করেন এবং কয়েক বছর সেখানে অতিবাহিত করে হুজুরের (সা) মদীনা হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। সেখান থেকে মদীনা হিজরাত করেন। মদীনায় হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী তাঁকে নিজের মেহমান হিসেবে আশ্রয় প্রদান করেন। ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হুজুর (সা) তাঁকে হযরত আবি আবাস (রা) বিন জাবিরের ইসলামী ভাই বানিয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত খুনাইস (রা) প্রথম বদরের যুদ্ধে অংশ নেন এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। তারপর তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে অংশ নেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সে কারণেই কিছুদিন পর মারা যান। মহানবী (সা) জানাযার নামায পড়ান এবং আবুস সায়িব হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউনের পাশে দাফন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর বিধবা স্ত্রী হযরত হাফসা (রা) কয়েক মাস পর বিশ্বনবী (সা) স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত দিমাদুল আযদি (রা)

নাম দিমাদ। পিতার নাম ছিল ছা'লাবা। চরিতকাররা তাঁর নসবনামা লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু ধারাবাহিকতার সাথে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আযদি শুনওয়াহ গোত্রের আশা আকাংখার প্রদীপ ছিলেন এবং ঝাড়-ফুঁক ও চিকিৎসা কাজ আঞ্জাম দিতেন। দিমাদকে (রা) শুধুমাত্র নিজের গোত্রেই মান-ইজ্জত ও সম্ভ্রমের চোখে দেখা হতো না বরং মক্কার কুরাইশদের মধ্যেও তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উঁচুতে। তিনি মাঝে মধ্যেই মক্কা যাতায়াত করতেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে সেইসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যাঁরা ইসলাম গ্রহণের বেশ আগেই বিশ্বনবীর (সা) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র), হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র), হাফেজ ইবনে হাব্বান এবং ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, দিমাদ (রা) জাহেলী যুগে মহানবীর (সা) বন্ধু ছিলেন। মুসলিম, নাসায়ী, বায়হাকী এবং অন্য কতিপয় আলেম লিখেছেন যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পর তিনি কোন কাজ উপলক্ষ্যে মক্কা আগমন করেন। এ সময় মুশরিকরা অপপ্রচার করে রেখেছিল যে, মুহাম্মাদ মজনুন বা পাগল (নাউজুবিল্লাহ) হয়ে গেছে। দিমাদ (রা) যখন একথা শুনলেন তখন মানসিকভাবে আঘাত পেলেন। কেননা হুজুর (সা) তাঁর বন্ধু ছিলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন যে, তিনি অন্যদের চিকিৎসা করে থাকেন। যদি তাঁর ঝাড়-ফুঁক ও চিকিৎসা পুরাতন বন্ধুর উপকারে না আসে তাহলে তার কি লাভ ? তিনি লোকদেরকে বললেন, মুহাম্মাদ এখন কোথায়। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। সম্ভবত আমার চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে উঠবে। সুতরাং তিনি মহানবীর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ মুহাম্মাদ (সা), আমি ঝাড়-ফুঁকের কাজ করে থাকি এবং আমার হাতে অধিকাংশ রোগী সুস্থ হয়ে থকে। আমার কাছে এটা অসহনীয় ব্যাপার যে, আমি থাকতে আপনি অসুস্থ থাকবেন। আসুন, আমি আপনার চিকিৎসা করি। হুজুর (সা) তাঁর সহানুভূতিসূচক পরামর্শের জবাবে প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতপর কিছু কথা বললেন। (অথবা অনেকের মতে কুরআন হাকিমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন)।

হুজুরের (সা) কথা দিমাদের (রা) খুব ভালো লাগলো। তিনি তাঁকে তা পুনরায় পড়তে বললেন। রাসূলে করীম (সা) তিনবার তা পাঠ করলেন। অতপর দিমাদ (রা) অযাচিতভাবে বলে উঠলেন, "আমি গণকদের কথা

www.bjilibrary.com

শুনেছি, যাদুকরদের যাদুর বর্ণান শুনেছি, কবিদের কাব্য শুনেছি কিন্তু আজ আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনছি তা পূর্বে আর কারো কাছ থেকে শুনিনি। এই বাণী তো সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আমি এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর খাঁটি রাসূল।" ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের ও নিজের কওমের পক্ষ থেকে হুজুরের (সা) বাইয়াত করলেন এবং স্বদেশে চলে গেলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি স্বজাতিকেও ইসলামে এনেছিলেন।

হযরত দিমাদ (রা) সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা হযরত দিমাদের (রা) কারণে তাঁর গোত্রকে খুব সম্মান করতো। কোন অভিযানকালে যদি এই গোত্রের কোন বস্তু ভুলবশত কোন মুসলমান হস্তগত করতো তাহলে প্রকৃত অবস্থা জানার পর তা ফিরিয়ে দেয়া হতো।

হযরত দিমাদুল আযদির (রা) জীবন কাহিনী যদিও ইতিহাসের আবর্তে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তবুও তাঁর জন্য এটাও কম মর্যাদার বিষয় নয় যে, তিনি প্রিয় নবীর (সা) দোস্ত ও অনুরক্ত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ তামিমী

হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ তামিম গোত্রের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ঐতিহাসিকরা তাঁর ইসলামী যুগের কথা বিস্তারিত কিছু বলেননি। তবে, দ্বীনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সীমাহীন প্রশংসা করেছেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন যে, একবার মহানবী (সা) কোন শত্রু গোত্রে অভিযানের জন্য একটি দল প্রেরণ করেছিলেন। মুজাহিদদের মধ্যে হযরত মুসলিমও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুশমনরা যখন মুসলমানদের সৈন্য প্রেরণ সম্পর্কে অবহিত হলো তখন দুর্গ বন্ধ করে বসে পড়লো। অবরোধকালে একদিন অবরুদ্ধরা খুব চেঁচামেচি করলো। হযরত মুসলিম (রা) তাদের নিকট গেলেন এবং অত্যন্ত নরম ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং এও বললেন যে, ইসলাম গ্রহণই তোমাদের বাঁচার একমাত্র পথ। তাঁর তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে দুর্গের সকল বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করলো। এই ঘটনায় হযরত মুসলিমের (রা) কিছু সঙ্গী, যারা গনিমাতের মালের আকাংখা করতো তারা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে, তিনি তাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছেন। মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে গিয়ে তাঁরা রহমতে আলমের (সা) নিকট সকল ঘটনা পেশ করলেন। এ সময় মহানবী (সা) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং হযরত মুসলিমের (রা) খুব প্রশংসা করলেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, দুর্গের প্রতি লোকের বিনিময়ে তারা এতো এতো প্রতিদান পাবে।

দয়ার সাগর প্রিয় নবী (সা) খুন-খারাবি পছন্দ করতেন না। এ জন্য তিনি হযরত মুসলিমের (রা) কাজে এতো খুশী হয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতের খলিফা ও ইমামদের নামে তাঁকে একটি সুপারিশ পত্র প্রদান করেছিলেন। এই পত্রে তিনি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই পত্র পাঠকারীকে হযরত মুসলিমের (রা) সাথে সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বা" গ্রন্থে লিখেছেন, সে সময় মহানবী (সা) হযরত মুসলিমকে (রা) একটি দোয়া অথবা ওজিফা শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সাতবার পড়তে বলেছিলেন। এটা করলে তিনি উপকৃত হবেন বলেও বলেছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত মুসলিম (রা) মহানবীর (সা) জীবদ্দশায় কোন্ কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগুলো নীরব রয়েছে। অবশ্য উপরের ঘটনায় জানা যায় যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জিহাদে অংশ নিতেন এবং দারিদ্রতা সত্ত্বেও গনিমাতের মালের কোন পরওয়াই করতেন না।

ইবনে সা'দ (র) লিখেছেন, হযরত মুসলিম (রা) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন এবং বনু উমাইয়ার শাসনামলের কোন এক সময় ওফাত পান। তিনি চার খলিফার সামনে বিশ্বনবীর (সা) মুবারক ফরমান পেশ করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁকে অনেক কিছু দিয়ে রুখসত করেছিলেন।

আল্লামা ইউসুফ বিন আজ-জাকিউল মিজ্জি (র) "তাহজীবুল কামাল" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছের পুত্র হারিছ (র) বিন মুসলিম (রা) নিজের পিতার নিকট থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণনা করেছিলেন।

ইবনে সায়াদের (র) বক্তব্য অনুযায়ী একবার হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (র) হযরত হারিছকে (র) ডেকে তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন যেমন তাঁর পিতার সাথে আচরণ করতেন তেমনি তিনিও তাঁকে কিছু দিয়ে রুখসত বা বিদায় করেন।

হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ এ ব্যাপারে একক সম্মানের অধিকারী ছিলেন যে, সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সা) তাঁকে তাঁর সন্তুষ্টির লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত যাহির (রা) বিন হারাম আশজায়ী

হযরত যাহির (রা) বিন হারাম আশজা' গোত্রের নীচু ও কুৎসিত দর্শন একজন গ্রাম্য মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য নিসন্দেহে দর্শনীয়। প্রিয় নবীর (সা) মাহবুব সাহাবীদের মধ্যে তিনি পরিগণিত হতেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি হিজরাতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত যাহির (রা) গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি মহানবীকে (সা) এত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন যে, যখনই নিজের গ্রাম থেকে হুজুরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হতেন তখনই নিজের সাথে অবশ্যই গ্রামের কোন তোহাফা সঙ্গে নিয়ে আসতেন। মহানবী (সা) বলতেন, প্রত্যেক শহরবাসীরই কোন না কোন গ্রামীণ বন্ধু বা দোস্ত থাকে। আলে মুহাম্মাদের (সা) গ্রামীণ দোস্ত হলো যাহির (রা) বিন হারাম। ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি যখনই প্রিয় নবীর (সা) কাছ থেকে বিদায় নিতেন তখন তিনিও তাঁকে কোন না কোন বস্তু অবশ্যই প্রদান করতেন।

হযরত যাহিরের (রা) সাথে মহানবীর (সা) অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তার সাথে মাঝে মধ্যে ঠাট্টাও করতেন। একদিন হযরত যাহির (রা) মদীনা মুনাওয়ারার বাজারে কিছু বিক্রি করছিলেন। ঘটনাক্রমে মহানবী (সা) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত যাহিরকে (রা) দেখলেন এবং পেছনের দিকে গিয়ে তার চোখের ওপর নিজের পবিত্র হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ

"এই গোলামকে কে কিনবে ?"

হযরত যাহির (রা) মহানবীকে (সা) চিনতে পারলেন এবং বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! এই বাণিজ্যে আমার মূল্য তো কম হবে।"

রহমতে আলম (সা) বললেন, "না, আল্লাহর নিকট তোমার মূল্য অনেক বেশী।"

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে হযরত যাহির (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। অবশ্য একটি রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি শেষ বয়সে কুফা গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর সম্ভবত তিনি দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত আমর (রা) বিন সুরাকাহ্ আদভী

তিনি কুরাইশের বনু আদী বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

আমর (রা) বিন সুরাকাহ্ বিন মু'তামির বিন আনাস বিন আদাহ্ বিন রাযাহ্ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুববী।

হযরত আমর (রা) বিন সুরাকাহ্ সেই সব সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ১৩ বছর পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে মক্কায় অবস্থান করে কুরাইশ মুশরিকদের নির্যাতন সইতে থাকেন। যখন মদীনায় হিজরাতের অনুমতি মিললো তখন মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা চলে আসেন। ইবনে সা'দের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত রিফায়াহ্ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী তাঁকে নিজের বাড়ীতে স্থান দেন।

বিশ্বনবীর (সা) মদীনা শুভাগমনের পর যুদ্ধের ধারা শুরু হয়ে গেল। এ সময় তিনি বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সকল যুদ্ধেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, কতিপয় যুদ্ধে তিনি খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহে তাঁর ভাটা পড়েনি। হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াহ্ থেকে বর্ণিত আছে, এক যুদ্ধে আমর (রা) বিন সুরাকাহ্ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে খাদ্য শেষ হয়ে গেল এবং আমরা অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকতে লাগলাম। আমর (রা) দীর্ঘদেহী হাল্কা-পাতলা মানুষ ছিলেন। তার অবস্থা এত নাজুক হয়ে গেল যে, পেটে পাথর বেঁধে তাঁকে পথ চলতে হয়েছিল। হাসিমুখে তিনি এই কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আমরের (রা) বিস্তারিত অবস্থা ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। ইবনে সায়াদ (রা) লিখেছেন, তিনি হযরত ওসমানের শাসনামলে ওফাত পান। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

---

www.bjilibrary.com

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারী

বিশ্বনবী (সা) হকের দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। এভাবে দশ দশটি বছর কেটে গেল। কিন্তু মক্কাবাসীদের দুর্ভাগ্য তাদের অধিকাংশই এই মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। অথচ এই নিয়ামত তাদের নিজের ঘরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা হক দাওয়াত তো গ্রহণ করলোই না। পক্ষান্তরে তাঁরা এই পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো, গালাগাল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মার-পিট, জেল-জুলুম, সামাজিক বয়কট মোটকথা জুলুম-নির্যাতনের সকল পন্থাই তারা প্রিয় নবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের উপর পরীক্ষা করলো। কিন্তু সব ধরনের জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও মহানবী (সা) আল্লাহর সৃষ্টি মানবকুলকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন অব্যাহত রাখলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে মহানবী (সা) উকাজ, মাজান্নাহ এবং জিল-জাযের মেলায় ও হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিতেন। তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, কে তাঁকে সাহায্য করবে এবং কে তাঁকে তার নিকট আশ্রয় দেবে। যাতে তিনি আল্লাহর পয়গাম জনগণের কাছে পৌছাতে পারেন এবং তাঁর সাহায্যকারী এর বিনিময়ে জান্নাতের হকদার হবে। বনু বকর বিন ওয়ায়েল, আমের বিন ছাছা, বনু শাইবান, বনু সুলাইম, বনু আবাস, বনু নাজার, বনু ফাজারাহ, বনু মাহারিব, বনু মুররাহ, বনু কালাব এবং বনু হানিফা মোটকথা আরবের প্রায় সকল গোত্রের নিকটই তিনি হকের দাওয়াত পৌছালেন। কিন্তু কোন গোত্রই তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সাহস করলো না।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ১১ বছরের হজ্জের মৌসুমের কথা। তিনি যথারীতি হকের তাবলীগের জন্য মিনা তাশরীফ নিলেন। এখানে আরবের প্রত্যেক স্থান থেকে হজ্জের জন্য আগতরা তাঁবুর শহর বানিয়ে রেখেছিল। প্রিয় নবী (সা) ভাগ্যবানদের তালাশে জুমরায়ে উকবার নিকট পৌছলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি তাঁবুতে ৬ জন সুদর্শন ও সুন্দর প্রকৃতির লোক আলাপ-আলোচনায় মশগুল রয়েছেন। এই লোকগুলো তিনশ' মাইল দূর ইয়াসরাব থেকে এসেছিলেন। বিশ্বনবী (সা) তাঁদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, "আপনারা কি আমার কথা শুনবেন ?"

তাদের সবাই সমস্বরে জবাব দিলেন, "অবশ্যই অবশ্যই।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সা) তাঁদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহ্ পাকের পয়গাম শুনালেন। তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণের উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে হিদায়াতের পথপ্রদর্শনে নিয়োজিত রয়েছি।

তাঁরা তাঁর কথা বা ইরশাদ অত্যন্ত গভীরভাবে শুনলেন। অতপর তাঁর নিকট নিবেদন করে বললেন ঃ "আল্লাহ্ যে কালাম আপনার উপর অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু অংশ আমাদেরকে শুনান।"

সে সময় মহানবীর (সা) পবিত্র যবানে সূরায়ে ইবরাহীম উচ্চারিত হলো। তিনি কেবলমাত্র কয়েকটি আয়াতই তিলাওয়াত করেছিলেন। কুরআনে করিমের নজীরবিহীন ফাসাহাত ও বালাগাত এবং অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গীতে তাদের অন্তর বিমুগ্ধ হয়ে গেল। তারা পরস্পরের প্রতি চাওয়া-চাওয়ি করলো এবং বললো ঃ "আল্লাহর কসম! এতো সেই নবী যাঁর উল্লেখ সবসময়ই আমাদের শহরের ইহুদীদের মুখে শুনা যায়। ইহুদীরা আবার আমাদের চেয়ে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হয়ে না যায়।" অতপর তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আরজ করলেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ (সা)! আমরা আপনার দাওয়াত মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক ও আপনি তাঁর সত্য রাসূল। আপনি বলুন, আপনি আমাদের নিকট কি চান?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরা আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে চলো এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমার সাহায্য-সহযোগিতা ও হিফাজত করো যাতে আমি বেশী বেশী লোকের নিকট হকের দাওয়াত পৌঁছাতে পারি।"

আল্লাহর সেইসব নেক স্বভাব বান্দারা সত্য অন্তরে হুজুরকে (সা) সত্য রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এখন তারা কোন কথা হুজুরের (সা) নিকট গোপন রাখতে চাইছিলেন না। অত্যন্ত বিনয় ও আদপের সাথে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা সবদিক থেকেই আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের কাছে যদি আপনি তাশরীফ রাখেন তাহলে আমরা আপনার হিফাজতের জিম্মাদার হবো। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে প্রচণ্ড শত্রুতা বিরাজ করছে। আমরা আমাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলি। তারপর আমরা আপনাকে তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিব। বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিশৃংখলার এই পরিবেশে সেখানে সাফল্যের আশা খুবই কম। ইনশাআল্লাহ, আগামী বছর আমরা পুনরায় আপনার খিদমতে হাজির হবো।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সা) বললেন, "খুব ভালো কথা।"

অতপর একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সুদর্শন যুবক সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পবিত্র হাত সম্প্রসারিত করুন। আমি এই হাতে ইসলামের বাইয়াত করছি।"

মহানবী (সা) নিজের মুবারক হাত এগিয়ে দিলেন এবং সেই সৌভাগ্যবান যুবক অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাঁর বাইয়াত করলেন। তাঁর পাঁচজন সঙ্গীও তাঁর অনুসরণ করলেন। বিশ্বনবী (সা) তাদের বাইয়াতে সীমাহীন খুশী হলেন। তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং ফিরে এলেন।

ইয়াসরাবের এই ভাগ্যবান যুবক যিনি সর্বপ্রথম মহানবীর (সা) বাইয়াতের মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনি হলেন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু উমামাহ আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ হেদায়াতের অত্যন্ত দেদীপ্যমান তারকাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হতেন। খাজরাজের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত খান্দান বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বিন আদাস বিন উবায়েদ বিন ছালাবা বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন ছালাবা বিন আমর বিন খাজরাজ।

হযরত আসয়াদ (রা) আল্লাহ প্রদত্ত অত্যন্ত নেক স্বভাব লাভ করেছিলেন। জাহেলী যুগেই তিনি মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন এবং তাওহীদ স্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়াসবারের ইহুদীদের নিকটে যখনই শেষ নবীর (সা) কথা শুনতেন তখনই মনে মনে আকাংখা পোষণ করতেন, হায়! তিনিও যদি সেই নবীর যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করতেন। যখন হুজুরের (সা) দর্শন লাভ করলেন তখন তাঁর কান শেষ নবী (সা) এবং তার দ্বীনে হক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, নুবওয়াতের ১১ বছর পর তিনি হযরত উকবা (রা) বিন আমের, আওফ (রা) বিন হারিছ বিন আফরা, রাফে (রা) বিন মালিক, কুতবা (রা) বিন আমের এবং জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ নামক পাঁচজন নেক স্বভাব সঙ্গীসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে আছির (র) 'উসুদুল গাব্বাতে' লিখেছেন যে, তিনি তার আগেই হযরত জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসের সাথে ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্য লাভ করেন। ঘটনাটা হলো ঃ হুজুরের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর একবার হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ এবং জাকওয়ান বিন আবদি কায়েস মক্কা আসেন এবং কুরাইশ সরদার উতবাহ বিন রাবিয়ার বাড়িতে মেহমান হন। আলোচনা-

www.bjilibrary.com

কালে উতবাহ মেহমানদেরকে জানালেন যে, বনু হাশিমের এক যুবক মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ রিসালাত দাবী করছে। সে আমাদের মূর্তিদের নিন্দা করে। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে এবং আমাদের এক আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত বলে থাকে।

জাকওয়ান (রা) কয়েকবার হযরত আসয়াদকে (রা) বলেছিলেন, হায়! মৃত্যুর পূর্বে দ্বীনে হক লাভের সৌভাগ্য যদি তার হতো! তারা যখন উতবাহ বিন রাবিয়ার নিকটে বিশ্বনবী (সা) কথা শুনলেন তখন হযরত আসয়াদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তুমি যে দ্বীনের অনুসন্ধান করছিলে এটিই সেই দ্বীন।" হযরত আসয়াদ (রা) তৎক্ষণাৎ রাসূলের (সা) দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত ও হুজুরের (সা) রিসালাতের সত্যতার স্বীকৃতি দিলেন। কথিত আছে যে, হযরত জাকোয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসও সেই সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যা হোক, যে বর্ণনাই সঠিক হোক তবে, এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালের মধ্যে হযরত আসয়াদের (রা) স্থান অত্যন্ত উঁচুতে ছিল। এটা হযরত আসয়াদের (রা) ঈমানের আবেগ এবং ইসলাম ফি দ্বীনের ফল বলা যায়।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ এবং তাঁর পাঁচসাথী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পর ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় তাদের অন্তর ঈমানী আবেগে পূর্ণ ছিল এবং আস্থার প্রদীপ হৃদয়ের কন্দরে প্রোজ্জ্বল রূপ নিয়েছিল। এই আলোয় ইয়াসরাববাসীর অন্তর আলোকিত করার আকাংখায় তাঁরা অস্থির ছিল। সুতরাং তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আওস ও খাজরাজের মধ্যে হকের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। তাদের তাবলীগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেল এবং কতিপয় নেক চরিত্রের ইয়াসরাবী প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। পরবর্তী বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর হজ্জের মওসুম এলো। এ সময় ইয়াসরাবের ১২ জন মুসলমান বিশ্বনবীর (সা) দর্শন লাভের জন্য মক্কা পৌছালেন। তাদের ১০ জন ছিলেন খাজরাজের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং বাকী দু'জন ছিলেন আওস গোত্রভুক্ত। খাজরাজীদের মধ্যে হযরত আসয়াদও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা) তাদের আগমনের খরব পেলেন। খরব পেয়ে তিনি রাতে মিনা তাশরীফ নিলেন। উকবার গিরি পথে উপস্থিত হলেন। এখানেই গত বছর ৬ খাজরাজীর সাথে তাঁর স্বাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তাদের সাথে মিলিত হলেন। মহানবীকে (সা) নিজেদের মধ্যে পেয়ে তাদের আনন্দের

www.bjilibrary.com

সীমা পরিসীমা ছিল না। তারা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন এবং এসব প্রতিশ্রুতি দিলেন ঃ

১। আমরা শিরক করবো না, ২। চুরি করবো না, ৩। যিনা করবো না, ৪। নিজের কন্যা সন্তান হত্যা করবো না, ৫। কারোর প্রতি তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবো না, ৬। রাসূলুল্লাহর (সা) নাফরমানী করবো না এবং সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন করবো, ৭। সর্বাবস্থায় হককথা বলবো এবং এ ব্যাপারে কারোর গালির ভয়ে ভীত হবো না, ৮। দেশ শাসনের ব্যাপরে শাসকদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবো না। অবশ্য প্রকাশ্য কুফরী দেখলে তার প্রতিবাদ করা হবে।

বাইয়াত নেয়ার পর হুজুর (সা) এসব সাহাবীকে (রা) বললেন, "তোমরা যদি প্রতিশ্রুতি পূরণ কর, তাহলে জান্নাতের হকদার হবে। আর যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর তাহলে আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"

এই বাইয়াত ইতিহাসে "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" বা উকবার প্রথম বাইয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কেউ কেউ একে "বাইয়াতে নিছা" হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। কেননা এই বাইয়াতের শর্তাবলী সেই শর্তাবলীর সাথে মিলে যায় যা কয়েক বছর পর মুসলমান মহিলাদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল ।

আল্লামা তাবারী এবং ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় এসব সাহাবী হুজুরের (সা) নিকট তাদেরকে কুরআন পড়ানো এবং দ্বীনের কথা শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন মুয়াল্লিম বা শিক্ষক প্রদানের দরখাস্ত করেছিলেন। এ দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (সা) হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে এই দায়িত্ব অর্পণ এবং তাঁকে এই পবিত্র কাফেলার সাথে ইয়াসরাব প্রেরণ করেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, এসব সাহাবী ইয়াসরাব পৌছে হুজুরের (সা) নিকট পত্র লিখলেন অথবা দু' ব্যক্তিকে প্রেরণ করে হুজুরের (সা) নিকট এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণের দরখাস্ত করলেন যিনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারবেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে হুজুর (সা) হযরত মুসয়াবকে (রা) ইয়াসরাব গমনের নির্দেশ দিলেন। হযরত মুসয়াব (রা) কাফেলার সাথে গিয়ে থাকুন অথবা পরে এ ব্যাপারে চরিতকাররা একমত যে, ইয়াসরাবে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই তাঁকে নিজের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর বাড়ীতেই কেন্দ্র বানিয়ে তালিম ও হেদায়াত এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত মুসয়াবের (রা) পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং বিজ্ঞতাসুলভ তাবলিগী প্রক্রিয়া ২০ জন ইয়াসরাবের অন্তরে ইসলামের শিখা প্রজ্জোলিত করে দিল এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের এমন কোন গৃহ অবশিষ্ট রলো না যেখানের কোন না কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রলেন। কিন্তু সে সময় পর্যন্তও সেসব গোত্রের সরদার বা নেতা ইসলাম সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। এ জন্য ইসলাম প্রচারের কাজে বাধা সৃষ্টি হতে লাগলো। আল্লাহ পাক সেই বাধা দূরীকরণে আশ্চর্য ধরনের ব্যবস্থা করে দিলেন। একদিন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে বনি জাফর এবং বনু আবদুল আশহালের মহল্লার দিকে গেলেন। এ দুইগোত্র আওসের বন্ধু ছিল। তারা সেখানে বনি জাফরের একটি বাগানের কূপের (মারক কূপ) ওপর বসলেন। আরো অনেক মুসলমান সেখানে পৌছে গেল। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি বনু আবদুল আশহালের সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন মায়াজকে গিয়ে খবর দিলেন যে, মুসলমানরা তোমাদের মহল্লায় এসে লোকদেরকে প্ররোচিত করছে। সা'দ (রা) বিন মায়াজ এই খবর শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্রোধান্বিত হলেন এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সেখানে গমনের ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে আসয়াদ (রা) যুরারাহও আছেন তখন থেমে গেলেন। কেননা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ ছিলেন তার খালাতো ভাই। তা সত্ত্বেও তিনি চাচাতো ভাই উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে বললেন ঃ

"উসায়েদ! তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করো যে, তারা যেন ভবিষ্যতে আমাদের লোকদেরকে নষ্ট করার জন্য আওসের মহল্লায় না আসে। আসয়াদ বিন যুরারাহ যদি সেখানে না থাকতো তাহলে আমি স্বয়ং যেতাম।"

হযরত উসায়েদও (রা) বনু আবদুল আশহালের অন্যতম নেতা এবং একজন টগবগে যুবক ছিলেন। তিনি বর্শা হাতে নিলেন এবং মারক কূপের দিকে দ্রুত রওয়ানা দিলেন। হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ তাঁকে এমনভাবে আসতে দেখে হযরত মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ "এই ব্যক্তি আওস গোত্রের দু'জন বড় সরদারের একজন। আজ আপনাকে তার নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌছানোর হক ঠিকভাবে আদায় করতে হবে।" হযরত মুসয়াব (রা) বললেন ঃ "তাকে একটু বসেত দাও। আমি কথা বলছি। দেখা যাক আল্লাহ কি করেন।"

উসায়েদ (রা) সেখানে পৌছেই ক্রোধান্বিত স্বরে দ্রুত কথা বলা শুরু করে দিলেন এবং হযরত মুসায়াবকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "তুমি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ ? আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বেওকুফ বানানোর জন্য ?

জীবনের প্রতি যদি সামান্য মায়াও থাকে তাহলে কালবিলম্ব না করে এখান থেকে চলে যাও এবং আর কখনো এদিকে আসবে না।"

হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর দ্রুত ও কর্কশ কথা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনলেন এবং অত্যন্ত নরমভাবে বললেন ঃ "প্রিয় ভাই! আপনি কিছু সময় অপেক্ষা করে আমার কথা শুনুন। পছন্দ হলে তা গ্রহণ করবেন। অন্যথা প্রত্যাখ্যান করবেন।"

মুসয়াবের (রা) ধৈর্যপূর্ণ কথা উসায়েদের (রা) ক্রোধের ওপর যেন পানির ছিটার কাজ করলো। তিনি নিজের বর্শা মাটিতে গেড়ে এই বলে বসে পড়লেন ঃ "হাঁ, তুমি ইনসাফের কথা বলেছ। বলো কি বলতে চাও।"

মুসয়াব (রা) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে ইসলামের উসুল বা মৌলিক কথা বর্ণনা করলেন, অতপর কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। উসায়েদ (রা) অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ

"এটা কতই না ভালো দ্বীন এবং কতই না সুন্দর কালাম, তোমরা এই দ্বীনে দাখিল হওয়ার সময় কি করো?"

ইবনে হিশাম হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ "আমি এবং মুসয়াব সে সময় উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরের চেহারায় বিস্ময়কর আভা ও প্রফুল্লতা লক্ষ্য করেছি। তাঁর কথার ধরন দেখে আমরা বুঝে ফেলেছিলাম যে, তিনি ইসলামে প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁকে গোসল করা এবং পবিত্র কাপড় পরিধানের উপদেশ দিলাম। তিনি গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করে এলেন। তারপর তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ানো হলো এবং ইসলামের গন্ডীতে নিয়ে আসা হলো। অতপর দুরাকায়াত নামায পড়ানো হলো।"

হযরত উসায়েদ (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পর হযরত মুসয়াবকে (রা) বললেন, "পেছনে আরো এক ব্যক্তি রয়ে গেছেন। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে। কেননা তার গোত্রে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তার কথা না শোনে। আমি তাকে এখনই তোমাদের নিকট প্রেরণ করছি।"

একথা বলেই তিনি সোজা সা'দ (রা) বিন মায়াযের নিকট পৌঁছলেন। সে সময় তিনি নিজের গোত্রের অনেক মানুষ নিয়ে বসে ছিলেন। উসায়েদকে (রা) দেখে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! যখন এখান থেকে সে গিয়েছিল তখন তার চেহারা গোস্বায় ভরপুর ছিল। কিন্তু এখন বরং তো দেখি অন্য ধরনের।"

উসায়েদ (রা) তাঁর নিকট পৌঁছলেন। এ সময় সা'দ (রা) বিন মায়াজ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বল মিয়া, কি করে এলে ?"

হযরত উসায়েদ (রা) জবাব দিলেন ঃ "আমি ঐ দু' ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের নিকট থেকে ভয়ের কোন ব্যাপার অনুভব করিনি। আমি তাঁদের কথা থামিয়ে দিয়েছিলাম। এ সময় তাঁরা বললেন, আমাদের কথা শুনুন। তারপর গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা। যে কাজ আপনাদের পছন্দনীয় নয় তা আমরা করবো না। উসায়েদ (রা) কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর বললেন ঃ

"কেবলই আমি শুনতে পেয়েছি যে, বনি হারিছার লোকেরা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে। সে আপনার খালাতো ভাই হয়, এই কারণেই তারা এই কাজ করে আপনাকে অপমানিত করতে চায়।"

একথা শুনেই সায়াদ (রা) বিন মায়াজ অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। হাতে বর্শা নিয়ে মারক কূপের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন ঃ "উসায়েদ! আল্লাহর কসম, যে কাজের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম তাতো হয়ই নি রবং তুমি নতুন এক মুসিবত নিয়ে এসেছো।"

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ সা'দ (রা) বিন মায়াজকে আসতে দেখলেন। এ সময় তিনি হযরত মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ "এ ব্যক্তি স্বজাতির সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী নেতা। কোন ব্যক্তিই তার কথা অমান্য করতে পারে না। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র গোত্রই তার অনুসরণ করবে।"

হযরত সা'দ (রা) বিন মায়াজ সায়াদ (রা) ও মুসয়াবকে (রা) নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেখলেন। সেখানে বনু হারিসার কোন ব্যক্তির চিহ্নও তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি বুঝতে পেলেন যে, উসায়েদ (রা) নতুন চাল চেলেছেন। তাকে এখানে প্রেরণ করে তাদের কথা শুনাতে চান। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় হযরত মুসয়াব (রা) ও হযরত আসয়াদের (রা) নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং হযরত আসয়াদকে বললেন ঃ

"আবু উমামা! আল্লাহর কসম, তোমার ও আমার মধ্যে যদি আত্মীয়তা না থাকতো তাহলে তুমি কোনক্রমেই আমাদের বাড়ী এসে আমাদের ওপর সেই কথা চাপিয়ে দেয়ার সাহস করতে না যা আমরা খারাব মনে করে থাকি।"

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিল না। তিনি সা'দ (রা) বিন মায়াজের কথার জবাব সেই আন্দাজেই দিতে পারতেন। কিন্তু

তিনি হকের তাবলীগের খাতিরেই সেখানে এসেছিলেন। এ জন্য খালাতো ভাইয়ের তেতো কথা শুনে শুধু হেসে দিলেন। অবশ্য সায়াদ (রা) মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ "মুহতারাম বা শ্রদ্ধেয় ভাই! একটু বসে আমাদের কথা শুনুন। পছন্দ হলে মেনে নিবেন। অন্যথা আমরা চলে যাবো এবং এমন কথা বলবো না যা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, সে সময় হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই তাকে হযরত মুসয়াবের (রা) কথা শোনার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভাইটি আমার! তাঁর কথা কিছু শুনুন। যদি তা অপছন্দনীয় হয় তাহলে তা মানবেন না। আর যদি কোন কথা পছন্দ হয় তাহলে তা মেনে নিবেন।"

জবাবে হযরত সায়াদ (রা) বললেন ঃ "কায়দা করে তুমি কথাটি বললে।" একথা বলে তিনি মাটিতে বর্শা গেড়ে বসে গেলেন। হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর সামনে ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করলেন এবং সূরায়ে যুখরুফ অথবা হামীম–এর কিছু আয়াত পড়ে শুনালেন।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ এবং হযরত মুসয়াব (রা) বলেন, পবিত্র কুরআন শুনতেই সায়াদ (রা) বিন মায়াজের চেহারার কাঠিন্যতা পরিবর্তিত হয়ে হাসিখুশীতে ভরে গেল এবং তিনিও সেই কথাই জিজ্ঞেস করলেন যা হযরত উসায়েদ (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে এই দ্বীনে কিভাবে দাখিল হতে হয়? তাঁরা গোসল করা এবং পবিত্র কাপড় পরিধান করার উপদেশ দিয়েছিলেন। সায়াদ (রা) গোসল করে এবং পবিত্র কাপড় পড়ে এলেন। তখন তাঁরা প্রথমে তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করালেন। অতপর দু' রাকায়াত নামায পড়ালেন। অতপর সায়াদ (রা) নিজের বর্শা উঠিয়ে নিজের গোত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁকে দেখে গোত্রের কিছু লোক বলে উঠলো ঃ "আল্লাহর কসম! আমরা সায়াদকে পরিবর্তিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। যে চেহারা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, সেই চেহারা এখন আর তার নেই।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ সমগ্র বনু আবদিল আশহালকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে বনি আবদিল আশহাল! তোমরা আমাকে কেমন মনে করে থাক?"

"আপনি আমাদের সরদার! আমাদের সবার থেকে আপনি সঠিক মতের অধিকারী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ।" সকলেই সমস্বরে কথাগুলো বললো।

www.bjilibrary.com

সায়াদ বললেন ঃ তাহলে শোনো, তোমাদের পুরুষ ও মহিলাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কথা বলা হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের ওপর ঈমান না আনবে।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ঘোষণা শুনে বনু আবদিল আশহালের বেশীরভাগ মানুষ তৎক্ষণাৎ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলো। যারা অবশিষ্ট রলো তারাও সন্ধ্যানাগাদ মুসলমান হয়ে গেলো। শুধুমাত্র আল উসাইরিম বিন ছাবিত ইসলাম গ্রহণ করলো না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে মদীনার আনাচে কানাচে ইসলামের তাকবীরে গুঞ্জিরিত হতে লাগলো। (ওহোদের যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ তায়ালা আল উসাইরিমকেও হক কবুলের তাওফিক দান করেন এবং তিনি সেই যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।)

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ হযরত মুসয়াবকে (রা) নিজের মেহমান বানিয়েছিলেন এবং হযরত মুসয়াব (রা) ও হযরত আসয়াদের (রা) সাথে মিলে হকের তাবলিগে দিন-রাত একাকার করে দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিন চারটি ছাড়া আনসারের সকল পরিবারেই ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল। খাজরাজ গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ্ এবং তাঁর পরিবার পরিজনও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যান। এমনিভাবে আওস ও খাজরাজের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় এবং নেক স্বভাবের মানুষ ইসলামের স্তম্ভে পরিণত হন।

সে যুগেই হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আরো একটি মহান মর্যাদার অধিকারী হন। তিনি সর্বপ্রথম ইয়াসরাবে জুময়ার নামায পড়িয়ে ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকের পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধকালে আমার পিতার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আমি তাকে ধরে ধরে জুময়ার নামাযের জন্য নিয়ে যেতাম। আযানের আওয়াজ যখন তাঁর কানে আসতো তখন আবু উমামাহ্ আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সবসময় কেন এমন করেন ? তিনি বলতে লাগলেন ঃ "বেটা" তিনি প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে হিররা বনি বিয়াজাহ-তে (বাকীউল খাজমাত) রাসূলে করিমের (সা) আগমনের পূর্বে জুময়া পড়াতেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "সেই যুগে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন ?" জবাব দিলেন, "চল্লিশ।"

ইবনে সিরিন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তখনও জুময়ার নামাযের হুকুম নাযিল হয়নি। মদীনার মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সপ্তাহে

একদিন একস্থানে একত্রিত হয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেহেতু ইহুদীদের পবিত্র দিন ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের ছিল রোববার। এ জন্য তাদের থেকে পার্থক্য সূচীত করার জন্য তাঁরা জুময়ার দিন ধার্য করে দিলেন। সে যুগে এই দিনকে ইয়াওমে আরবিয়া বলা হতো। সর্বপ্রথম জুময়া হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বাকীউল খাজমাত নামকস্থানে পড়িয়েছিলেন। তাতে ৪০ জন মুসলমান শরীক ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালার আনসারীদের এই সিদ্ধান্ত এত পছন্দ হয়েছিল যে, জুময়ার নামায সকল মুসলমানদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল। নবীর হিজরতের পূর্বে জুময়ার নামাযের হুকুম যখন নাযিল হলো তখন মক্কায় তা আদায় করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং হুজুর (সা) হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে মদীনায় চিটি লিখলেন এবং জুময়ার ইমামতের নির্দেশ দিলেন যে কাজটি আনসাররা নিজেরা শুরু করেছিলেন তা এখন সকল মুসলমানের ওপর ফরয হয়ে গেল।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর হজ্জের মওশুমে ইয়াসরাব থেকে পাঁচশ লোকের একটি কাফেলা হজ্জের জন্য মক্কা রওয়ানা হলো। এই কাফেলায় হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহসহ আওস ও খাজরাজের ৭৫ জন এমন পবিত্র ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা ইতিমধ্যেই ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরা মহানবীকে (সা) ইয়াসরাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিলেন অস্থির। তাঁদের মধ্যে ইয়াসরাবে ইসলামের প্রথম দায়ী মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরও কাফেলায় শরীক ছিলেন।

হজ্জ সমাপনের পর বিশ্বনবী (সা) আনসারদের সাথে সাক্ষাতের সেই রাত নির্ধারিত করলেন যার সকালকে ইয়াওমুন নফর নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তিনি তাদের প্রতিনিধিদেরকে উকবার নিম্নভূমিতে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ এবং সেখানে আসার পূর্বে ঘুমন্ত কাউকে জাগাতে নিষেধ ও কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা না করার নির্দেশ দিলেন।

ইয়াসরাবের হকপন্থীরা হুজুরের (সা) নির্দেশ পালন করলেন এবং নির্ধারিত রাতে চুপিসারে এক এক দুই দুই জন করে, উকবার উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা সারওয়ারে আলমের (সা) সাথে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবকেও পেলেন। হযরত আব্বাস (রা) তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যত ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি পর্দার আড়ালে বা ভেতরে ভেতরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একথাও জানতেন যে, ইয়াসরাব থেকে আগত কিছু সংখ্যক নওমুসলিম মহানবীকে (সা) ইয়াসরাব তাশরীফ নেয়ার জন্য দাওয়াত দিতে এসেছেন।

এখানে উপস্থিত হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব আলোচনা শুরু করলেন। তিনি ইয়াসরাববাসীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে ইয়াসরাবের ভ্রাতৃবৃন্দ! মুহাম্মাদ (সা) নিজের খান্দানে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মানুষ। কুরাইশের মুশরিকরা তাঁর জীবনের শত্রু। তা সত্ত্বেও বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সবসময়ই দুশমন থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও সামর্থ অনুযায়ী তা করে যাবে। কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাওয়া ছাড়া আর কোন কথায় রাজী নয়। অতপর তোমরা চিন্তা করে দেখ। যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ কর এবং আমৃত্যু তাকে রক্ষা করতে পার তাহলে আলোচনা কর। যদি নিজেদের কাছে ডেকে নেয়ার পর সামান্যতম সন্দেহও হয় যে কোন সময় তোমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারবে না এবং তাঁকে দুশমনের নিকট ছেড়ে দিতে হবে তাহলে তাঁকে এখানেই যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকতে দাও।"

হযরত আব্বাসের (রা) বক্তৃতা শুনে খাজরাজের এক সরদার হযরত বারা (রা) বিন মারুর আবেগাপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে আব্বাস! আমরা তোমার কথা শুনলাম। তুমিও স্মরণ রেখ যে, আমরা দুর্বল নই। আমরা তরবারীর ছায়াতেই লালিত পালিত হয়েছি।"

হযরত আবুল হাইছাম (রা) ইবনুত তাইহান তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! ইহুদীদের সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। বাইয়াতের পর এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। বিজয় লাভের পর আপনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজের কওমের মধ্যে ফিরে আসবেন—এমন যেন না হয়।"

হুজুর (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ

না; এমনটি হবে না। আমার রক্তই তোমাদের রক্ত। আমার দাফনের স্থান তোমাদেরও দাফনের স্থান। আমি তোমাদের এবং তোমরাও আমার। আমি তাদের সাথে লড়াই করবো যাদের সাথে তোমরা লড়াই করবে এবং আমি তাদের সাথে সন্ধি করবো যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে আনসারদের অন্তর আনন্দে ভরে গেল। তাঁরা আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার বাইয়াত করবো, তা ইরশাদ করুন।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সা) বললেন, "আমি তোমাদের নিকট থেকে বাইয়াত নিচ্ছি তোমরা সব অবস্থাতেই নির্দেশ পালন করবে এবং আনুগত্যের মাথা অবনত করে দেবে। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আল্লাহর ব্যাপারে সবসময় হক কথা বলবে এবং কোন গালাগালকারীর পরওয়া করবে না। সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে অভ্যাসে পরিণত করবে এবং আমি যখন তোমাদের নিকট যাবো তখন আমাকে এমনভাবে রক্ষা করবে যেমনভাবে নিজের পরিবার পরিজনকে করে থাকো। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

এই ইরশাদের পরই সকল আনসার দাঁড়িয়ে হুজুরের (সা) দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ লাফ দিয়ে আগে গিয়ে মহানবীর (সা) পবিত্র হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ "ইয়াসরাফবাসীরা দাঁড়াও! আমরা এই সফরে উটের কলিজা শুধু এই আস্থার ভিত্তিতে ছিদ্র করেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁকে আমাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো সকল আরবের শত্রুতা কিনে নেয়া। এর পরিণতিতে তোমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ নিহত হতে পারেন এবং বিরোধীদের তরবারী তোমাদেরকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলতে পারে। এসব মুসিবত বরদাশত করার শক্তি যদি তোমরা রাখো তাহলে মহানবীকে (সা) নিজেদের কাছে নিয়ে চলো এবং তোমাদের কাজের প্রতিদান আল্লাহ পাক দেবেন। কিন্তু যদি কোন ভয়-ভীতি অনুভব কর তাহলে তাঁকে নিজের ওপর ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কারভাবে ক্ষমা চেয়ে নাও। এই সময়ের ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহর নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।"

হযরত আসয়াদের (রা) কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে বললেন ঃ

"আসয়াদ তুমি পেছনে সরে এসো। আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই বাইয়াত করবো এবং তা কখনই ভঙ্গ করবো না।"

একথার পর তৎক্ষণাৎ হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ রহমতে আলমের (সা) বাইয়াত করলেন। এই সৌভাগ্য তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার লাভ করেন। অন্যান্য আনসারও তাঁর অনুসরণ করলেন এবং সকলেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একের পর এক হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। এই বাইয়াতকে ইতিহাসে বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বাইয়াত ইসলামের ইতিহাসে মাইল স্টোনের মর্যাদা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই বাইয়াত আরব ও আজম, জ্বিন ও ইনসানের সাথে আল্লাহর

www.bjilibrary.com

সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করার বাইয়াত ছিল। সময়টাও এমন ছিল যখন আরবের প্রতিটি ধূলিকণা হকের ঝান্ডাবাহীদের রক্ত পিপাসু ছিল। ইয়াসরাব ভূমির এই পবিত্র মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং নিজের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততিকে মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) পায়ের কাছে এনে রাখলেন।

আল্লাহর লাখ লাখ সালাম বর্ষিত হোক সেই সব মুবারক ব্যক্তিদের উপর যাঁরা নিজেদের সবকিছু হকপথে বিলীন করে দিয়েছিলেন এবং কোন ভয়ভীতির তোয়াক্কা করেননি। এই বাইয়াত আনসারদেরকে এমন এক মর্যাদায় ভূষিত করেছিল যে, যার ওপর তারা সবসময় ফখর করতেন। ইবনে ইসহাক (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার আনসারদের মধ্যে এই বিতর্ক শুরু হয়ে গেল যে, লাইলাতুল উকবায় কোন্ ব্যক্তি সর্বপ্রথম হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। বনু নাজ্জারের লোকেরা বলতো আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই এই সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। বনু সালমার লোকেরা বলতো যে, সর্বপ্রথম কা'ব (রা) বিন মালিক বাইয়াত করেছিলেন। বনু আবদিল আশহালের লোকেরা দাবী করতো যে, আবুল হাইছাম (রা) ইবনুত তাইহান সবার আগে বাইয়াত করেছিলেন। সর্বশেষে ব্যাপারটি হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের সামনে পেশ করা হলো। তিনি বললেন ঃ "সর্বপ্রথম আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বাইয়াত করেছিলেন। তাঁর পর বারা' (রা) বিন মারুর এবং তাঁর পর উসাইদ (রা) বিন হুজাইর।"

হযরত আব্বাসের (রা) এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনসারের অগ্রবর্তী সাহাবীদের (রা) মধ্যে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর স্থান তালিকাশীর্ষে উঠে আসে।

বাইয়াতের পর বিশ্বনবী (সা) ইয়াসরাববাসীদেরকে বললেন, "মূসা (আ) ইহুদীদের বারোজন নকীব নির্বাচন করেছিলেন। তোমরাও দ্বীনি বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচিত করে নাও।"

ইয়াসরাবের মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে ১২ জন নকীব নির্বাচন করলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের এবং বাকী তিনজন আওস গোত্রের। খাজরাজের নকীবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ। তিনি আরো ভিন্ন ধর্মী মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। রহমতে আলম (সা) তাঁকে "নকিবুন নুকাবা" খিতাব প্রদান করেছিলেন।

অতপর হুজুর (সা) আনসারদেরকে চুপি চুপি বিদায় হয়ে যাওয়ার হেদায়াত দিলেন এবং বললেন, যখন আল্লাহর নির্দেশ হবে তখন তিনি হিজরত করে ইয়াসরাবে তাদের নিকট পৌঁছে যাবেন।

www.bjilibrary.com

উকবায়ে কবিরার বাইয়াতের পর হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ ইয়াসরাব ফিরে গেলেন এবং খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দাওয়াত ও তাবলিগের কাঁজে মশগুল হয়ে পড়লেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, সে যুগে আসনারদের মধ্যে মূর্তি ভাঙ্গার কাজ খুব জোরে শোরে চলছিল এবং কোন কোন উৎসাহী মুসলমানদের স্ব স্ব গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। ইয়াসরাবের মুশরিকদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছিল যে, তাদের পক্ষে মূর্তি উৎপাটনকারী ভাইদের মুকাবিলা করার সাহস ছিল না এবং তারা স্বহস্তে নির্মিত মাবুদদের ধ্বংসের প্রশ্নে চুপ মেরে থাকতো।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর হজ্জের মওসুমে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা সংঘটিত হয়। নবুওয়াতের ১৪ বছর পর রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী (সা) মক্কা ভূমিকে বিদায় জানান এবং ইয়াসরাবের উপকণ্ঠের মহল্লা (অথবা গ্রাম) কুবাতে শুভ পদার্পণ করেন। এখানে হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদাম তাঁর মেযবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি আওস খান্দান বনু আমর বিন আওফের শাখা বনু উবায়েদের একজন সম্ভ্রান্ত বুজর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় ঈমানের সম্পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সে যুগে ইসলামের বরকতে যদিও আওস এবং খাজরাজের পারস্পরিক বিবাদ থেমে গিয়েছিল তবুও তারা একে অপরের মহল্লায় গমনা-গমনে ইতস্তত করতো। মহানবী (সা) কুবাতে আওসের এক পরিবারে অবস্থান করছিলেন। এ জন্যে খাজরাজের জনগণ সেখানে আসতে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু হুজুরের (সা) সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তাদেরকে শান্তির সাথে বসে থাকতে দিল না এবং তাদের নেতারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নবীর (সা) নিকট উপস্থিত হতে লাগলেন। উপস্থিতদের মধ্যে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ ছিলেন না। মহানবী (সা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ কোথায় ?" হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদিল মানযার, হযরত মুবাশশির (রা) বিন আবদিল মানযার এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন খাছিমা আওসী আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আসয়াদ (রা) বুয়াছের যুদ্ধে আমাদের এক নেতা নাবতাল বিন হারিছকে হত্যা করেছিলেন। এ জন্য সম্ভবত তিনি এখানে আসতে ভয় পেয়ে থাকতে পারেন।"

ওদিকে হযরত আসয়াদ (রা) মহানবীর (সা) দর্শন লাভের জন্য এত অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মুখে কাপড় দিয়ে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে এসে হাজির। হুজুর (সা) তাকে দেখে খুব খুশী হলেন। হযরত আসয়াদ (রা) সারা রাত হুজুরের (সা) নিকট অবস্থান

www.bjilibrary.com

করলেন এবং খুব ভোরে ফিরে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর রহমতে আলম (সা) সায়াদ (রা) বিন খাছিমা এবং আবদুল মানযারের পুত্র মুবাশশির (রা) ও রিফায়াকে বললেন ঃ "আমি চাই, তোমরা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাকে আশ্রয় দেবে।"

এই তিন জাননিছার সাহাবী আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার নির্দেশ পালন করবো।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন খাছিমা কাল বিলম্ব না করে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর বাড়ী পৌছলেন এবং হাত ধরে তাঁকে স্বগোত্র বনু আমর বিন আওফ নিয়ে এলেন। গোত্রের অন্যান্য নেতা যখন হুজুরের (সা) ইচ্ছার কথা জানতে পেলেন তখন সকলেই তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা সকলেই আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহকে আশ্রয় দিচ্ছি। সে নির্দ্বিধায় এখানে আসতে পারে।"

মহানবী (সা) তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং হযরত আসয়াদ (রা) নির্ভয়ে মহানবীর (সা) খিদমতে আসা যাওয়া শুরু করলেন।

কুবায় কিছুদিন অবস্থানের পর মহানবী (সা) ইয়াসরাবে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মদীনার আনসাররা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহানবী (সা) এমন উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ সম্বার্ধনা জানিয়েছিলেন যা ইতিহাসে নজিরবিহীন হয়ে আছে। বিশ্বনবীকে (সা) সম্বর্ধনাকারীদের মধ্যে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ সর্বাগ্রে ছিলেন। হুজুরের (সা) প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ইশকের পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল।

ইয়াসরাবে যেদিন মহানবীর (সা) শুভাগমন হয়েছিল সেদিন থেকেই এই শহর "মদীনাতুন্নবী" নামে আখ্যায়িত হয়। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) যেমন বিশ্বনবীর (সা) মেযবান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তেমন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ হুজুরের (সা) উটনী কাসওয়ার মেযবান হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, হযরত আবু আইয়ুব (রা) হযরত আসায়াদ (রা) উভয়েই বনু নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীতে অবস্থানের কিছুদিন পর মহানবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে আল্লাহর ঘর বা মসজিদ তৈরীর সংকল্প ঘোষণা করলেন। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীর সামনে একটি পতিত জমি পড়েছিল। এখানে এসেই তার উটনী বসে পড়েছিল। বিশ্বনবী (সা) এই জমিতেই মসজিদ তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই জমিতে কয়েকটি কবর ও

www.bjilibrary.com

খেজুর বৃক্ষ ছিল এবং হুজুরের (সা) শুভাগমনের পূর্বে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে এখানেই নামায পড়তেন। সেই জমির মালিক ছিল বনু নাজ্জারের দুই এতিম শিশু। তাদের নাম হলো সাহাল (রা) ও সোহায়েল (রা)। তাদের অভিভাবক ছিলেন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ। বিশ্বনবী (সা) সেই দুই এতিম শিশুকে জমির মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন। শিশু দু'টি বললো, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই জমি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে দান করে দিচ্ছি।"

হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সুন্দর প্রতিদান দিন। আমি এই জমি মূল্য ছাড়া গ্রহণ করবো না।"

অতপর মহানবী (সা) আনসার নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে সেই জমির মূল্য নির্ধারণ করলেন দশ মিছকাল স্বর্ণ এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী তা আদায় করিয়ে দিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অথবা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে (রা) দিয়ে। (ফাতহুল বারি ও মাদারিজুননবুয়াহ) কিন্তু যারকানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ (রা) নিজের অভিভাবকাধীন শিশুদের কাছ থেকে এই জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য নিয়ে হুজুরকে (সা) দিয়ে দেন এবং তার বিনিময়ে বনু বিয়াজায় অবস্থিত নিজের একটি বাগান শিশুদেরকে দেন।

প্রিয় নবীর (সা) প্রতি হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ (রা) পূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দিতেন। যেদিন মহানবী (সা) মদীনা এসেছিলেন সেদিন থেকে বেশীর ভাগ সময় তাঁর নিকটই কাটাতো। হুজুর (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাকে অন্যতম প্রিয় জাননিছার হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহানবীর (সা) সত্যিকার আশেককে রিসালাত-কালে শুধুমাত্র কয়েক মাসই দেখা গিয়েছিল। মদীনায় আনসারদের মধ্যে যেমন তিনি হুজুরের (সাঁ) নিকট বাইয়াত গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন তেমনি এই নশ্বর দুনিয়াকে বিদায় জানানোর ব্যাপারেও অগ্রগামী হয়েছিলেন।

প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে প্রিয় নবী (সা) তখনো মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করেননি। এমন সময় হযরত আসায়াদের (রা) কণ্ঠনালিতে প্রচণ্ড ব্যথা উঠলো। হুজুর (সা) তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলেন। ব্যথায় কাতর দেখে তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথা বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু কোন আরাম হলো না এবং সেই অবস্থাতেই তিনি পরপারে যাত্রা করলেন। ওফাতের পূর্বে তিনি মহানবীর (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি দু'টি অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে

www.bjilibrary.com

রেখে যাচ্ছি। তারা আল্লাহ্ এবং আপনার হাওয়ালায় রইলো। তারা আপনার স্নেহের আকংখী থাকবে।"

হযরত আসয়াদ (রা) আনসারদের মধ্যে মহানবীর (সা) সবচেয়ে বড় খাদিম এবং ইসলামের সবচেয়ে তৎপর সাহায্যকারী ছিলেন। ইহুদীরা এজন্য ওফাতের সাথে সাথে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ শুরু করলো। আল্লামা ইবনে জারির তাবারি (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদের (রা) ওফাতে মহানবী (সা) খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই অবস্থায় ইহুদীদের বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে তিনি বললেন, "ইহুদীরা বলে থাকে মুহাম্মদ যদি আল্লাহর রাসূল হতো তাহলে তার এত বড় তৎপর সহকর্মী মরতো না। অথচ মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কারো কোন কথাই খাটে না।"

বিশ্বনবী (সা) স্বয়ং হযরত আসয়াদ (রা)-এর জানাযার নামায পড়ালেন। অতপর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হলো। নবীর (সা) হিজরতের পর সর্বপ্রথম হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদম কুবাতে ওফাত পেয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকালের কিছুদিন পরেই মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ মারা যান। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা) সর্বপ্রথম জানাযার নামায হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই পড়েছিলেন। মদীনার আনসারদের ধারণা ছিল যে, হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই সর্বপ্রথম মুসলমান ; যাঁকে জান্নাতুল বাকীর মাটি নিজের বুকে স্থান দিয়েছিল, কিন্তু আল্লামা ইবনে আসয়াদ (রা) লিখেছেন, বাকীর গোরস্তানে সর্বপ্রথম হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন দাফন হয়েছিলেন। তাঁর ওফাত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর (বদরের যুদ্ধের) শেষে। যদি ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা সঠিক হয় ; তাহলে হযরত আসয়াদের (রা) শেষ আশ্রয়স্থল অন্য কোন স্থানে হয়েছিল। সেই স্থানের সন্ধান এখন আর পাওয়া যায় না।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বনি নাজ্জারের নকিব ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর বনু নাজ্জার মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি অবগত আছেন যে, আমাদের মধ্যে আসয়াদের (রা) কি মর্যাদা ছিল। আপনি তাঁর স্থলে আমাদের মধ্য থেকে কাউকে নকীব নিয়োগ করুন। যাতে তাঁর ইনতিকালে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কিছু হলেও পূরণ হয়।"

রাসূলে করিম (সা) বললেন ঃ "তোমরা আমার মাতৃকুলের আত্মীয় এবং আমি তোমাদেরই একজন। অতএব, এখন আসয়াদের (রা) স্থলে আমিই তোমাদের নকীব হয়ে গেলাম।"

www.bjilibrary.com

বনি নাজ্জার গোষ্ঠী নিজেদের এই সম্মান প্রাপ্তিতে অত্যন্ত খুশী হয়ে গেল। তারা সবসময় গৌরব প্রকাশ করে বলতো যে, রাসূলে করিম (সা) স্বয়ং তাদের নকীব হয়েছিলেন।

রহমতে আলম (সা) হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর ইয়াতিম শিশু কন্যাদেরকে সীমাহীন ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন, হুজুর (সা) মতি জোড়ানো স্বর্ণের বালি তাদের কানে পরিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আসয়াদ (রা)-এর এক মেয়ের নাম ছিল ফারিয়া। বালেগা হলে হযরত নাবিত (রা) বিন জাবেরের সঙ্গে মহানবী (সা) তার বিয়ে দেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবি উমামাহ আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ যদিও ইসলামের মাদানী যুগের প্রথম দিকে ওফাত পেয়েছিলেন ; তবুও নিজের ঈমানী আবেগ ও নেক আমলের যে উদাহরণ স্বল্প সময়ের মধ্যে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করেয়িছিলেন তা ইসলামের অনুসরীদেরকে চিরকালের জন্য মনযিলে মাকছুদের পথ দেখাতে থাকবে। স্বয়ং মহানবী (সা) তাঁর নেক চরিত্রের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "খায়ের" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁর স্থলে নিজেকে বনি নাজ্জারের নকিব নিয়োগ করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসুজ জুরকি আনসারী

হযরত জাকওয়ান (রা) ছিলেন খাজরাজের যুরায়েক বংশোদ্ভূত। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েস বিন খালদাতা বিন মুখাল্লাদ বিন আমের বিন যুরায়েক।

আল্লাহ পাক হযরত জাকওয়ান (রা)-কে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি মহানবীর (সা) নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাওহীদপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মদীনার ইহুদীদের নিকট থেকেই শেষ নবীর (সা) কথা শুনেছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে যেন শেষ নবীর (সা) যুগ অবলোকন করান—এটা ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন ঃ প্রথম বাইয়াতে উকবার পূর্বে তিনি একবার বন্ধু হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর সহযাত্রী হয়ে মক্কা গিয়েছিলেন এবং প্রখ্যাত কুরাইশ সর্দার উতবাহ্ বিন রবিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করেন। উতবা তাঁর কাছে বিশ্বনবী (সা) সম্পর্কে বললেন। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী এর পূর্বে তিনি উতবার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি অন্যদের কাছে রাসূলে আকরাম (সা) সম্পর্কে শুনেছিলেন।) তাতে তিনি খুব প্রভাবান্বিত হলেন এবং হযরত জাকওয়ান (রা) স্বতস্ফূর্ত হযরত আসয়াদকে (রা) বললেন ঃ دونك هذا ديـنـك অর্থাৎ তুমি যে বস্তু খুঁজছিলে তা সমুপস্থিত। এখন তা গ্রহণ কর।

বস্তুত তাঁরা দু'জনেই সেখান থেকে উঠে মহানবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করে মু'মিনের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

বিশ্বনবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বাদশ বছরে তিনি মদীনায় সেই ১২জন ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা মক্কা গমন পূর্বক মহানবীর (সা) হাতে বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী বছর তিনি পুনরায় বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় মদীনায় ৭৪জন মু'মিনের সাথে এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই ঘটনার সময় মদীনার আনসাররা মহানবী (সা)-কে মদীনায় তাশরিফ নেয়ার দাওয়াত এবং তাঁকে জান-প্রাণ দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন ঃ এই বাইয়াতের পর হযরত জাকওয়ান (রা) মদীনা থেকে এসে মক্কায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং

www.bjilibrary.com

কিছুদিন পর অন্য মুহাজিরদের সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেন। এ জন্য তাকে মুহাজেরী আনসার বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত জাকওয়ান (রা) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের মহান সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত আনসারী

নবম হিজরীতে মহানবী (সা) ছাদকা ও যাকাত আদায়ের এক পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রণয়ন করেন। তিনি আরবের প্রত্যেক গোত্রের নিকট পৃথক পৃথক আদায়কারী প্রেরণ করেন। এসব আদায়কারী প্রতিটি গোত্র সফর করে জনগণের কাছ থেকে যাকাত ও খিরাজ আদায় করে মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করতেন। এই উপলক্ষে তিনি একজন জাননিছার বা আত্মোৎসর্গকারী আনসারীকেও ডেকে পাঠালেন। দীর্ঘ দেহী এবং দোহারা গড়নের এই সুপুরুষ রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি তাঁর পদ ও দায়িত্বের কথা বর্ণনা করে বললেন ঃ "নিজের দায়িত্ব পালনকালে আল্লাহকে ভয় করবে। কিয়ামতের দিন কোন চতুষ্পদ জন্তুও যেন তোমার বিরুদ্ধে কোন ফরিয়াদ বা অভিযোগ নিয়ে না আসে।"

মহানবীর (সা) ইরশাদ শুনে সেই ব্যক্তির চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা) ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহর কসম ! দু'জন মানুষের রাজস্ব আদায়কারী বা শাসক হওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই।"

তাঁর কথা শুনে মহানবী (সা) খুব খুশী হলেন। কেননা যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন পদের আকাংখা করতেন, তাঁকে মহানবী (সা) সেই পদ বা রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করতেন না। বিশ্বনবীর (সা) এই সাহাবী যিনি দুনিয়ার পদসমূহ থেকে এ ধরনের মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন এবং যাঁর এই মুখাপেক্ষীহীনতা মহানবীকে (সা) খুশী করেছিলো—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত আনসারী।

হযরত আবুল ওয়ালিদ উবাদাহ (রা) বিন সামিত ইসলামের ইতিহাসে এক মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর এই মর্যাদা সম্পর্কে মুসলমানদের সকল ধরনের গবেষকরা ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। বস্তুত তাঁর মর্যাদা এত উদ্যমপূর্ণ যে তা পড়ে ঈমানে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়।

হযরত উবাদাহ (রা) সম্পর্কে খাজরাজ বংশের বনু সালেম শাখার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। নসবনামা হলো ঃ উবাদাহ (রা) বিন সামিত বিন কায়েস বিন আসরাম বিন ফাহর বিন কায়েস বিন ছা'লাবা বিন গানাম বিন সালিম বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন খাজরাজ।

www.bjilibrary.com

মাতার নাম ছিল কুররাতুল আইন (রা) বিনতে উবাদাহ (বিন নাযলাহ বিন মালিক বিন আজলান)। তিনিও পুত্রের হাতে ইসলাম গ্রহণ এবং মহিলা সাহাবী (রা) হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত উবাদাহর (রা) নবোদ্ভিন্ন যৌবনকালে ইসলাম সূর্য উদিত হয়। নবুওয়াত প্রাপ্তির একাদশ বছরে মদীনার ভাগ্যবান স্বভাবের খাজরাজ বংশোদ্ভূত ৬ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মক্কা থেকে ফিরে এলেন। অতপর মদীনাতেও সেই আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে পড়লো। উবাদাহ ছিলেন একজন নেক্কার যুবক। তাঁর কর্ণকুহরে হকের দাওয়াত পৌঁছামাত্র নির্দ্বিধায় তাতে সাড়া দিলেন। পরবর্তী বছর হজ্জের সময় হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত খাজরাজ গোত্রের ৯জন এবং আওসের অপর দু'জন মুসলমানের সঙ্গে মক্কা গিয়ে উকবাহ নামক স্থানে মহানবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হলেন। ইতিহাসে এই বাইয়াত "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" অথবা "বাইয়াতে নিসা" নামে খ্যাত। স্বয়ং হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করিম (সা) আমাদের নিকট থেকে এসব কথার উপর বাইয়াত নিয়েছিলেন ঃ

"আমরা কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করবো না। চুরি করবো না। যিনা করবো না। নিজের সন্তান হত্যা করবো না। কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিব না। কোন ভালো কাজের নির্দেশে রাসূলের (সা) নাফরমানী করবো না এবং তাঁর হুকুম শুনবো ও মানবো। সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং আমাদের পসন্দ ও নাপসন্দ অবস্থায় আমরা রাসূলের (সা) নির্দেশ মানবো। আমাদের কাউকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিলেও রাসূলের (সা) হুকুম তামিল করবো। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আমরা রাষ্ট্র পরিচালকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবো না। (যদি আমরা বুঝিও যে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের অধিকার রয়েছে।) কিন্তু আমরা যদি প্রকাশ্য কুফুরী অবলোকন করি তাহলে তার বিরোধিতা করবো এবং আমরা যেখানে এবং যে অবস্থাতেই থাকি না কেন হক কথা বলবো ও ভর্ৎসনাকারীকে কখনো ভয় করবো না।"

অতপর মহানবী (সা) বলেছিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ এসব ওয়াদা পূরণ করলে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত। আর কেউ যদি এসব খারাপ কাজের কোন একটি করে বসে এবং দুনিয়াতেই তার শাস্তি পায় তাহলে এই শাস্তি তার জন্য গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। দোষ গোপনকারী আল্লাহ পাক যার গুনাহ গোপন করবেন তার পরিণাম ফল আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"

www.bjilibrary.com

এই বাইয়াতকে "বাইয়াতে নিসা"এ জন্যে বলা হয়ে থাকে যে, এর শব্দাবলী সেই শব্দাবলীর সদৃশ যা কয়েক বছর পর কুরআনে হাকিমে (সূরায়ে মুমতাহিনাতে) মুসলমান মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছিল।

মহানবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার (অথবা লাইলাতুল উকবাহ) মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাতে মদীনার ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তি উকবার ঘাঁটিতে প্রিয় নবীর হাতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বাইয়াত করেন। এই বাইয়াতে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে, মহানবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনলে তাঁরা তাঁকে জান ও মাল দিয়ে এমনভাবে হিফাজত ও সাহায্য করবে যেমন নিজের জীবন এবং পরিবার-পরিজনকে করা হয়ে থাকে।

এ সময় বিশ্বনবী (সা) সেই ৭৫জন ঈমানদারকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ "(এমন ধরনের অবশ্যই হবে না যে, আমি শত্রুর ওপর বিজয়ী হলে তোমাদেরকে ফেলে রেখে নিজের কওমে ফিরে আসবো। বরং) তোমাদের রক্ত আমার রক্ত, তোমাদের আবাদি আমার আবাদি এবং তোমাদের বরবাদি হবে আমার বরবাদি। তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের। তোমরা যার সাথে সন্ধি করবে ; আমি তাদের সাথে সন্ধি করবো। যার সাথে তোমরা লড়াই করবে তার সাথে আমি লড়াই করবো। মোটকথা, আমার জীবন ও মৃত্যু তোমাদের সাথেই সম্পৃক্ত হবে।"

এই ৭৫জন ঈমানদারদের মধ্যে হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেই মহান ব্যক্তি ছিলেন যিনি সে সময় মহানবী (সা)-কে মদীনা গমনের দাওয়াত প্রদান এবং নিজের জান-মালসহ তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ সারা আরব ভূমি তখন রিসালাত প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার কাজে ছিল মহাব্যস্ত। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এই নাজুক সময়ে মক্কার ইয়াতিম নবীকে (সা) সাহায্য করার অর্থই হলো সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। তার পরিণতিতে তিনি ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। এসব সত্ত্বেও তিনি বীরত্বের সাথে নিজের হাত মহানবীর (সা) মুবারক হাতে তুলে দিলেন এবং নিজের ভবিষ্যত ও তাকদির তাঁর সাথে একাকার করে নিলেন। এই নজিরবিহীন সাহসিকতা চার খলিফা (রা) ও আজওয়াজে মুতাহহিরাত (রা) এবং প্রথম যুগের মুহাজিরদের (রা) পর উকবাহবাসীদের (রা) অন্যান্য সকল সাহাবীদের (রা) [বদরের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী সাহাবী (রা) সহ] ওপর তাঁর মর্যাদা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দিল।

www.bjilibrary.com

বাইয়াতের পর মহানবী (সা) আনসারদের বললেন, নিজেদের ধর্মীয় বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্যে নিজেদের মধ্য থেকে ১২জনকে নকীব হিসেবে নির্বাচিত করে নাও। এই নির্দেশ অনুযায়ী আনসাররা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ১২জন নকীব নির্বাচন করলেন। তাদের মধ্যে ৯জন খাজরাজ এবং ৩জন আওস বংশোদ্ভূত ছিলেন। খাজরাজী নকীবদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত। মহানবী (সা) তাঁকে বনি কাওয়াফিল-এর নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। অতপর বিশ্বনবী (সা) আনসারদেরকে মদীনা ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ্ সমাপ্ত করে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর ঈমানী আবেগ ছিল তুঙ্গে। সর্বপ্রথম তিনি নিজের মাতা কুররাতুল আইন (রা)-কে ইসলামে দীক্ষা দিলেন। তারপর নিজের গোত্রের সব মূর্তি পূজারীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মূর্তি ভাঙ্গা শুরু করলেন। বাল্লী খান্দান বনি কাওয়াফিলের মিত্র ছিল। এই গোত্রের কা'ব (রা) বিন আজরাহ ছিলেন হযরত উবাদাহর (রা) বন্ধু। তিনি নিজের ঘরে এক বিরাট মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার পূজা করতেন। হযরত উবাদাহ (রা) একদিন সুযোগ পেয়ে কাবের বাড়ী গেলেন এবং তার মূর্তিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। অতপর কাবকে বুঝালেন যে, এই মূর্তি যে নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না সে তোমার কি কাজে আসবে। কাবের অন্তরে এই কথা গেথে গেল এবং অল্প সময় পর সেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (র) বর্ণিত আছে যে, বাইয়াত থেকে ফিরে আসার পর হযরত উবাদাহ (রা) সবসময় মহানবীর (সা) দিদার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সুতরাং বিশ্বনবীর (সা) হিজরতের পূর্বে সামান্য দিনের বিরতি দিয়ে তিনি দু'বার মক্কা গিয়ে রাসূলের দর্শন লাভ করে এসেছিলেন।

মহানবী (সা) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। তাতে যেন হযরত উবাদাহর (রা) সমগ্র দুনিয়ার নিয়ামত প্রাপ্তি ঘটলো। বেশীর ভাগ সময়ই প্রিয় নবীর (সা) সান্নিধ্যে কাটাতে লাগলেন এবং নবীর ফয়েজে সমৃদ্ধ করলেন। এমনকি তিনি ইলম ও ফজিলতের দিক দিয়ে এত উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছিলেন যে, আসহাবে সুফফাহর জন্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম শিক্ষালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হিজরতের পাঁচ মাস পর মহানবী (সা) হযরত আনাসের (রা) বাড়ীতে মুহাজির ও আনসারদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেছিলেন। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা) এ সময়

www.bjilibrary.com

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতকে জলিলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত আবু মুরছাদ গানুবীর (রা) দ্বীনী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

ইলম হাসিলের সাথে সাথে হযরত উবাদাহ (রা) হক পথে জান-মালের কুরবানী পেশ করাকে জীবনের মহান লক্ষ্য হিসেবে মনে করতেন। তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক ত্যাগী মুজাহিদ। মৃত্যু ভয় কখনো তার দৃঢ় সংকল্পের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো না। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বীরত্বের হক আদায় করেন।

বিশ্বনবীর (সা) মদীনা আগমনের পর মদীনার ইহুদীদের সাথে শান্তি ও সন্ধির এক লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে ইহুদীদের বনি কাইনুকা চুক্তি ভঙ্গ করলো এবং বাস্তবতঃ এই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালো। মদীনার অন্যান্য ইহুদী গোত্রের তুলনায় বনি কাইনুকা বেশী মজবুত ও শক্তিশালী ছিল। এই গোত্রের মানুষ সাধারণত শিল্প ও কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কর্মকারী ও স্বর্ণকারী ছিল তাদের বিশেষ পেশা। ধন-সম্পদ ও বিত্ত বৈভব এবং অস্ত্রের আধিক্যে তারা ছিল গর্বিত ও অহংকারী। সুতরাং কোন মুসলমান তাদের মহল্লা অথবা বাজারে গেলে খুব ঠাট্টা-মশকরা করতো। এমনকি একবার তারা একজন মুসলমান মহিলাকে শ্লীলতাহানি করে বসলো। ফলে মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। তাতে একজন মুসলমান শহীদ ও একজন ইহুদী মারা গেল। মহানবী (সা)-কে তাদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে খবর দেয়া হলো। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন। জবাবে তারা বড়াই করে বললো, মুহাম্মাদ (সা) তো কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু তারাতো সমরবিদ্যা কি তা জানে না। মুহাম্মাদের (সা) সাথে যদি আমাদের লড়াই বাধে ; তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে যুদ্ধ কি বস্তু এবং আমরা কিভাবে যুদ্ধ করে থাকি।

বনি কাইনুকার জবাব তাদের অতৎপরতার অন্তর্নিহিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি ছিল। তাছাড়া সময়ও এসে গিয়েছিল তাদের চুক্তি ভঙ্গ এবং অশান্তি সৃষ্টির যথাযথ শাস্তি প্রদানের। মহানবী (সা) তাদের মহল্লা ঘেরাও করার নির্দেশ দিলেন। পনেরো দিন অবরোধেই তাদের সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তারা নিঃশর্ত আনুগত্য কবুল করে নিল। কিন্তু মহানবী (সা) বললেন, তারা মদীনায় অবস্থান করতে পারবে না। তাদেরকে অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করতে হবে। প্রিয় নবী (সা) তাদের মদীনা ত্যাগের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্যে হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতকে নিয়োগ করলেন। এর

www.bjilibrary.com

আগে তাদের সাথে হযরত উবাদাহর (রা) মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যখন "হে মুসলমানরা ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু বানিও না" কুরআনে হাকিমের এই নির্দেশ নাযিল হলো, তখন তিনি মুহূর্তের মধ্যে বনি কাইনুকার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাদের শহর থেকে বহিষ্কারের দায়িত্ব পালন করলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান ঘটনা সংঘটিত হলো। হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতও সেই ১৪শ সাহাবীর (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা সে সময় বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে "আসহাবুশ শাজারাহ" উপাধিও প্রকাশ্য ভাষায় জান্নাত নসিবের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত মহানবীর (সা) সেই দশ হাজার জানবাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে "ইসতিসনা কিতাবে" নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল ঃ

"খোদাবন্দ সিনা থেকে এলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের ওপর উদিত হলেন। ফারান পাহাড়ে তিনি পরিদৃশ্যমান হলেন। দশ হাজার নেক লোকের সাথে এলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি প্রোজ্জ্বল শরীয়াত।"

মোটকথা এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত উবাদাহ (রা) ত্যাগ ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করেননি এবং মহান নবীর (সা) যুগে এমন কোন সম্মান বা মর্যাদা ছিল না যা তিনি লাভ করেননি। আবেগ ও ত্যাগ এবং অন্যান্য সুন্দর গুণাবলীই হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতকে প্রিয় নবীর (সা) বন্ধু বানিয়ে দিয়েছিল।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (র) আছে, একবার হযরত উবাদাহ (রা) রোগশয্যায় শায়িত হয়ে পড়লেন। এ সময় স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে তাঁর শুশ্রূষার জন্যে তাশরীফ নিলেন। সেখানে পৌছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "উবাদাহ ! শহীদ কে তাকি জানো ?" তিনি স্ত্রীকে বললেন, বালিশে হেলান দেয়ায়ে আমাকে একটু বসিয়ে দাও। অতপর তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলো। তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! শহীদ তিনিই যিনি কানায় কানায় ঈমানে পরিপূর্ণ, আল্লাহর পথে হিজরত করেছেন এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে এসেছেন। একথা শুনে হুজুর (সা) বললেন ঃ "এ অবস্থায় শহীদের সংখ্যাতো খুব কম হবে। খুন হওয়া, পানিতে ডুবে মরা, কলেরায় মৃত্যু বরণ করা, মহিলাদের প্রসবলকালীন ব্যথায়

www.bjilibrary.com

মারা যাওয়া এ ধরনের সকল মৃত্যুই শাহাদাতের মৃত্যু এবং এভাবে মৃত্যু বরণকারীরা শহীদ।"

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) আখিরাতের সফরের পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ সময় হযরত উবাদাহ (রা) আশ্চর্য ধরনের অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শুশ্রূষার জন্যে মহানবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হতেন। সে সময়ই প্রিয় নবী (সা) একদিন হযরত উবাদাহকে (রা) একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দোয়াটি হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত জীবনের বেশীর ভাগ সময় শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান, ওয়াজ এবং হেদায়াত ও কিছু রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দয়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তর জিহাদের দ্যুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যখনই সুযোগ হতো তখনই সশরীরে জিহাদের ময়দানে গিয়ে পৌঁছতেন। হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করা হলো। এ সময় হযরত উবাদাহ (রা)ও ইসলামের মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। অসাধারণ বীরত্ব এবং জানবাজীর কারণে হযরত উবাদাহ (রা) আরবের বীরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিলেন এবং তাঁকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমান বলে মনে করা হতো। হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনকালেও তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২১ হিজরীতে ইসকান্দারিয়া বিজয়কালে তিনি যে ধরনের সাহসিকতা ও দৃঢ়তা, ভয়হীনতা এবং বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন তার উল্লেখ ঐতিহাসিকরা বিস্তারিতভাবেই করেছেন। মিসর অভিযানকালে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মিসরের বাবুল ইয়াওন, আরিশ, বালবিস, ফুসতাত প্রভৃতি শহর জয় করে নিলেন। অতপর ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। মিসরীয়রা কিল্লা বন্দী হয়ে প্রচণ্ডভাবে মোকাবিলা করলো। তাতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল। কয়েক মাসেও যখন ইসকান্দারিয়া বিজয় করা সম্ভব হলো না তখন হযরত আমর (রা) ইবনুল আস রাজধানীর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) চার হাজার সৈন্যকে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলেন। এই চার হাজার সৈন্য চারজন অফিসারের অধীন ছিল। সেই চারজন অফিসার হলেন ঃ হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ কিন্দি, হযরত মুসলিমাহ (রা) বিন মুখাল্লাদ এবং হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত। সমগ্র আরবে তারা সমর বিশারদ হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। এই সৈন্য প্রেরণের সময় হযরত ওমর ফারুকের

www.bjilibrary.com

(রা) মত মহান ব্যক্তিত্ব হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে লিখেছিলেন যে, এসব অফিসারের প্রত্যেকেই এক হাজার মানুষের সমান। এই ভিত্তিতে এই সেনাবাহিনীর সংখ্যা চার হাজার নয় ; বরং আট হাজার। হযরত ওমর (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে এই হেদায়াতও দিয়েছিলেন যে, যে সময় তুমি আমার এই পত্র পাবে তখন লোকদেরকে একত্রিত করে তাদের সামনে জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করবে এবং যে চারজন অফিসারকে আমি প্রেরণ করেছি তাদেরকে সৈন্যদের সামনে নিয়ে জুময়ার দিনে হামলা করবে।

হযরত আমর (রা) ইবনুল আসের নিকট এই সামরিক সাহায্য পৌঁছলো। তিনি সৈন্যদের সামনে হযরত ওমর ফারুকের (রা) চিঠি পড়লেন। হযরত ওমরের (রা) পত্র শুনে মুজাহিদদের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ সৃষ্টি হলো। জুময়ার দিন হযরত আমর (রা) ইবনুল আস সৈন্য সাজিয়ে ইসকান্দারিয়ার ওপর পূর্ণভাবে হামলার ইচ্ছা করলেন। তিনি হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতের কাছ থেকে তার বর্শা নিলেন এবং তার ওপর নিজের পাগড়ী লটকিয়ে তাকে বললেন, পতাকা নিন এবং এই সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিন। আপনিই আজ সেনাপতি। হযরত উবাদাহ (রা) অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে এমন প্রচন্ডভাবে হামলা চালালেন যে, রোমকদের প্রতিরক্ষা শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং তারা হয়ে পড়লো হিম্মতহারা। জল ও স্থল পথে যেদিকে পথ পেল সেদিকে পালিয়ে গেল এবং মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে ইসকান্দারিয়ায় প্রবেশ করলো। হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত যে যুগে এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয় তখন তার বয়স প্রায় ৬০ বছর ছিল। এই বয়সে এত বীর বিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যে অসাধারণ সাহস ও হিম্মতের অধিকারী ও বীরত্বের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন হয়।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উবাদাহর (রা) বীরত্ব ও জানবাজীরই স্বীকৃতি প্রদান করতেন না, বরং তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদা এবং অন্যান্য প্রশংসিত গুণাবলী অন্তর দিয়ে স্বীকার করতেন। তিনি নিজের খিলাফতকালে হযরত উবাদাহ (রা)-কে ফিলিস্তিনের কাজী নিয়োগ করেছিলেন। সে যুগে এই প্রদেশের আমীর ছিলেন হযরত আমীর মাবিয়া (রা)। কোন ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। আমীর মাবিয়া (রা) কিছু কঠিন কথা বলে ফেললেন। সে কথা হযরত উবাদাহর (রা) অসহনীয় মনে হলো। এই অবস্থায় তিনি ফিলিস্তিন ছেড়ে মদীনা চলে এলেন এবং আসার সময় বলে এলেন, 'ভবিষ্যতে আপনি যেখানে থাকবেন, আমি সেখানে থাকবো না।'

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর মদীনা প্রত্যাবর্তনের খবর পেলেন। তিনি তাঁকে একা একা ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ঘটনা বর্ণনা

www.bjilibrary.com

করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন ঃ "আমি আপনাকে কোনক্রমেই সেখান থেকে সরিয়ে আনবো না। দুনিয়াটা আপনাদের মত বুজর্গদের কারণেই টিকে আছে। যেখানে আপনাদের মত লোক থাকবে না আল্লাহ সেই জমিনকে খারাপ ও ধ্বংস করে দেবেন। আপনি আপনার স্থানে ফিরে যান। আমি আপনাকে মাবিয়ার (রা) অধীনতা থেকে পৃথক করে নিলাম।"

একই সঙ্গে তিনি আমীর মুয়াবিয়াকে (রা)ও একই ভাষায় চিঠি লিখে দিলেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, সেই যুগে সিরিয়ার আমীর হযরত আবু উবাদাহ (রা) ইবনুল জাররাহ হযরত উবাদাহ (রা)-কে হেমসের দায়িত্ব অর্পণ করেন। দায়িত্ব পালনকালে তিনি লা-জকিয়াহ জয় করেন। এই অভিযানকালে তিনি বড় বড় গর্ত খোঁড়ান। সেই গর্তে একজন মানুষ তার ঘোড়াসহ খুব ভালোভাবেই লুকিয়ে থাকতে পারতো। এই কৌশল সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল অত্যন্ত কার্যকর। ইউরোপিয়রাও দীর্ঘদিন যাবৎ এই কৌশল অবলম্বন করেছিল।

হেমসের দায়িত্ব পালন শেষে হযরত উবাদাহ (রা) ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলেন। সে যুগে ফিলিস্তিনের এলাকা সিরিয়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্যে কেউ কেউ তাঁর স্থায়ী বসতি হিসেবে সিরিয়ার কথাই লিখেছেন। সিরিয়াতে তিনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহের সাথেই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি হকে নাঙ্গা তরবারী ছিলেন এবং আপোষের সামান্যতম ছোঁয়াও তাঁর গা স্পর্শ করেনি। সিরিয়াতে তিনি দেখলেন যে, জনসাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে এবং লেন-দেনে শরীয়াতের সীমা ও নির্দেশাবলী পালন করছে না। তাতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং এক জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। এই ভাষণ শুনে জনগণও উত্তেজিত হয়ে পড়লো। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, আমীর মুয়াবিয়াও (রা) সেই জনসভাস্থলে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ "আপনি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলের (সা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতো হুজুর (সা) বলেননি।" একথা শুনে হযরত উবাদাহ (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। কেননা, তিনি সবদিক থেকেই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) চেয়ে মর্যাদাবান ছিলেন। অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, "মুয়াবিয়ার (রা) সাথে থাকার পরওয়া আমি করি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলে করিম (সা) একথাই বলেছিলেন, যা আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি।"

এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা হযরত উবাদাহ (রা) এবং আমীর মাবিয়ার (রা) মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ ঘটিয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের

www.bjilibrary.com

খিলাফতকালে এই মতপার্থক্য বাড়তে দেননি এবং উভয় বুজর্গের কাজের সীমানা ভিন্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান গনির (রা) খিলাফত-কালে আমীর মাবিয়া (রা) যখন সমগ্র সিরিয়ার ওপর ক্ষমতাবান গবর্নর হলেন তখন দরবারে খিলাফতে অভিযোগ লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন যে, উবাদাহ (রা) বিন সামিতের বক্তৃতা ও ভাষণ জনগণকে উত্তেজিত এবং বিশৃংখল করে তোলে। তাঁকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নিন। তা নাহলে আমি সিরিয়ার শাসন কাজ পরিত্যাগ করবো। হযরত ওসমান (রা) হযরত উবাদাহ (রা)-কে সিরিয়া থেকে ডেকে পাঠালেন। তিনি খিলাফতের দরবারে পৌঁছলেন। সে সময় সেখানে বিপুল জনসমাগম ছিল। তিনি চুপি চুপি এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎ করে হযরত ওসমান (রা) ওপরের দিকে তাকালেন। এ সময় হযরত উবাদাহকে (রা) সামনে দেখতে পেলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, এটা কি ব্যাপার ?" আমীরুল মু'মিনের ইরশাদ শুনে হযরত উবাদাহ (রা) হক কথনের আবেগ উথলে উঠলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সমাবেশকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা ! রাসূলে করিম (সা) বলেছেন, আমার পর আমীরেরা সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সতে পরিবর্তন করবে। অবৈধ কাজকে বৈধ মনে করতে থাকবে। কিন্তু গুনাহর কাজে কারোর আনুগত্য জায়েজ নয়। তোমরা অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) সেখানে বসেছিলেন। তিনি এই বক্তব্যে কিছু বাধা দিতে চাইলে বললেন ঃ

"আমরা যে সময় রাসূলের (সা) সঙ্গে বাইয়াত করেছিলাম তখন তুমি সেখানে ছিলে না। আমাদের বাইয়াতের সময় শর্ত ছিল যে, সুস্থতা ও অসুস্থতা সকল অবস্থাতেই আমরা মহানবীর (সা) নির্দেশ পালন করবো। সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই নিজের মাল দিয়ে তাঁকে (সা) সাহায্য করবো। লোকদেরকে ভালো কথা পৌঁছাতে থাকবো এবং খারাপ কথা থেকে বিরত রাখবো। হক কথনে কারো ভয়ে ভীত হবো না। মহানবী (সা) মদীনায় তাশরীফ নিলে তাঁর দেখা[illegible]ও [illegible]জত এমনভাবে করবো যেমন নিজের জান-মাল এবং সন্তানকে করা হয়। এসব শর্ত পূরণের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। বস্তুত এই বাইয়াত মহানবীর (সা) সাথে করা হয়েছিল। ওয়াদা পূরণ আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য কাজ। যে তা করবে না, সে নিজের দায়িত্বে তা করবে।"-(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত নিজের উদ্যমপূর্ণ জীবনের ৭৩ বছর অতিক্রম করার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। লোকজন যখন তার

www.bjilibrary.com

অসুস্থতার খবর পেলো, তখন শুশ্রূষার জন্যে ব্যস্তসন্ত্রস্ত হয়ে তার বাড়ী গেলো। তাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবী এবং তাবেয়ীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রোগ যদিও খুব কষ্টদায়ক ছিল এবং সুস্থ হওয়ার কোন আশা ছিল না ; তবুও তার মুখ দিয়ে সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন অব্যাহত থাকতো। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত শাদ্দাদ (রা) বিন আওস আনসারী কিছু লোকের সাথে শুশ্রূষার জন্যে এসেছিলেন, এ সময় তিনি তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহর ফজিলতে ভালো আছি। ইমাম বায়হাকী (র) এবং ইবনে আসাকির উবাদাহ বিন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, আমার গোলাম, খাদেম, প্রতিবেশী এবং সেইসব ব্যক্তি যারা প্রায়ই আমার কাছে আসতো তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। তাদেরকে হযরত উবাদাহর (রা) নিকট আনা হলো। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, সম্ভবত এটাই আমার শেষ দিন এবং আজকের রাত আমার আখিরাতের প্রথম রাত হতে পারে। তোমাদের সাথে আমার হাত অথবা যবান যদি কোন কঠোর আচরণ করে থাকে তাহলে আমার জীবন বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই একে একে এসে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। লোকেরা আরজ করলেন ! আপনি তো আমাদের পিতৃতুল্য ছিলেন এবং আমাদেরকে আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। হযরত উবাদাহ (রা) বললেন, তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ ? সবাই বললো, হ্যাঁ ক্ষমা করে দিয়েছি। হযরত উবাদাহ বললেন, হে আমার আল্লাহ ! সাক্ষী থেকো। অতপর বললেন, যদি কেউ প্রতিশোধ না নাও এবং সবাই ক্ষমা করে দিয়ে থাকো তাহলে আমার ওসিয়ত মুতাবেক কাজ করবে। আমার মৃত্যুর পর কেউ কাঁদবে না। বরং মৃত্যুর পর তোমরা সবাই ভালোভাবে ওজু করে মসজিদে যাবে এবং নামায পড়ে আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। আমার কবরের দিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবে। আমার পেছনে আগুন নিয়ে যাবে না এবং আমার নীচে বেগুনি রং-এর কাপড় রাখবে না। (সে যুগে জাহেলদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পেছনে পেছনে আগুন নিয়ে যাওয়ার প্রচলন ছিল।)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে ওফাতের পূর্বে পুত্র আরজ করলো, আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। বসে বললেন, "তকদিরের ওপর ইয়াকিন রেখো। নচেৎ, ঈমানের জন্য ভাল হতে পারে না।"

এই অবস্থায় তাঁর নামকরা শিষ্য প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান বিন আসিলাস সানাবাজী সেখানে উপস্থিত হলেন। মহান উস্তাদের মৃত্যু পূর্ব অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত

www.bjilibrary.com

উবাদাহ (রা) বললেন, আমি তো তোমার ওপর সন্তুষ্ট আছি। তুমি কেঁদো না। ইনশাআল্লাহ শাফায়াতের প্রয়োজন হলে শাফায়াত করবো। শাহাদাত বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হলে সাক্ষ্য দেবো। মোটকথা, যতটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করবো। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলাম, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। অবশ্য একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়নি। এখন তা বর্ণনা করছি। হাদিসটি বর্ণনা করেই শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং এভাবেই হেদায়াত সূর্য ৩৪ হিজরীতে আল্লাহ তায়ালার স্নেহ ছায়ায় অস্তমিত হয়ে গেল। এই ঘটনা ছিল হযরত ওসমানের (রা) খিলাফত কালের। তাঁর দাফন স্থল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ লিখেছেন বাইতুল মাকদাস। আবার কেউ বলেছেন, রামলাহ। মৃত্যুকালে হযরত উবাদাহ (রা) তিন পুত্র রেখে যান। তারা হলেন ঃ ওয়ালিদ, আবদুল্লাহ এবং দাউদ।

সাইয়েদেনা হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত সাইয়েদুল আনাম (সা)-এর একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক এবং হক পথের একজন মুজাহিদই ছিলেন না ; বরং জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকেও তাঁর মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে, তিনি উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি ফকিহ সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই পাঁচ সাহাবীর একজন ছিলেন, যাঁরা মহানবীর (সা) সামনেই পুরা পবিত্র কুরআন হেফজ করেছিলেন এবং স্বয়ং মহানবীর (সা) নিকট থেকে এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দ্বীনি তালিম গ্রহণ করেছিলেন যে, হাদিস ও ফিকাহতে কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এই ভিত্তিতে তিনি একক এক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মর্যাদাটি হলো ইসলামী দুনিয়ায় সবেচেয়ে পবিত্র ও সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন মুহতামিম ও শিক্ষক। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহানবী (সা) আসহাবে সুফফার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহলে সুফফাহর বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা নিতেন এবং লিখা-পড়া করতেন। ইমাম হাকিম (র) ইমাম বায়হাকী (র) ও তিবরানী (র) হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। এ জন্যে যখন কোন ব্যক্তি হিজরত করে তাঁর নিকট আসতো, তখন তিনি তাকে আমাদের মধ্যে কারো কাছে সোপর্দ করতেন। আমরা তাকে কুরআন শিখাতাম। সুতরাং বিশ্বনবী (সা) একজনকে আমাকে দিলেন। এই ব্যক্তি আমার ঘরেই থাকতো। আমি তাকে কুরআন পড়াতাম এবং সন্ধ্যার সময় খাবারও খাওয়াতাম। সে যখন চলে যাচ্ছিল তখন ধারণা করলো যে, আমার প্রতি তার কিছু হকও রয়েছে। সে একটি ধনুক আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দিল। আমি কাঠের এত সুন্দর ধনুক আর কখনো দেখিনি। আমি বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনা পেশ করলাম। মহানবী (সা) বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"তোমার দু' বাহুর মাঝখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে। যদি তুমি তা তোমার ঘাড়ে নাও।" এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত উবাদাহ (রা) লোকদেরকে বিনা মজুরীতে শুধু শিক্ষাই দিতেন না বরং তাদেরকে খাবারও খাওয়াতেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "ইসাবা" গ্রন্থে ইমাম বুখারীর (র) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত ওমর (রা)-কে লিখলেন, সিরিয়াবাসীর এমন ব্যক্তির প্রয়োজন, যে তাদেরকে কুরআনে কারিমের শিক্ষাদান করবে এবং ফিকাহর হুকুম-আহকাম বর্ণনা করবে। হযরত ওমর (রা) উবাদাহ (রা) বিন সামিত, মুয়াজ (রা) বিন জাবাল এবং আবুদ দারদাকে (রা) সিরিয়া রওয়ানা করালেন। উবাদাহ (রা) ফিলিস্তিনে অবস্থান করলেন।" হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট সম্ভবত কুরআন ও ফিকাহতে হযরত উবাদাহর (রা) ইলমি যোগ্যতা গ্রহণযোগ্য ছিল। সেই সাথে তিনি তার বীরত্বের স্বীকৃতি দানকারী ও প্রশংসাকারী ছিলেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আস মিসর প্রবেশের সৈন্য সাহায্য চাইলে সাহায্যকারী সৈন্যদের জন্যে যে চারজনকে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল, তার মধ্যে একজন ছিলেন হযরত উবাদাহ (রা)। আমীরুল মু'মিনিন হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে লিখলেন, এই ব্যক্তি এক হাজার লোকের সমান।

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত থেকে ১৮১টি হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবী ও তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত রয়েছিল। হাদিস বর্ণনা করার সময় বিশেষভাবে এই কথার ওপর জোর দিতেন যে, হাদিসটি অন্য কারোর মাধ্যম দিয়ে তার নিকট পৌছেনি ; বরং তা তিনি স্বয়ং রাসূলে করিমের (সা) পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার প্রশ্নে সবসময় তৎপর থাকতেন। বাড়ীতে হোক অথবা বাইরে, মসজিদে হোক অথবা কোন মজলিসে হোক ; সকল স্থানেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে হুজুরের (সা) বাণীসমূহ মানুষের কাছে পৌছাতেন। এমনকি গীর্জাতে গিয়েও খৃষ্টানদের সামনেও মহানবীর (সা) ইরশাদসমূহ পুনরাবৃত্তি করতেন। "তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীনেও" তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। মানুষ তাঁর নিকট অত্যন্ত জটিল সমস্যা নিয়ে আসতো এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার সমাধান করে দিতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত জুনাদাহ (র) বিন আবি উমাইয়াহ বলেছেন, হযরত উবাদাহ (রা) দ্বীনে হকের ফকিহ ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ" গ্রন্থে ইবনে হাজমের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত উবাদাহ (রা) ফতওয়ার একটি কিতাব প্রণয়ন করা যায়।

•

www.bjilibrary.com

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) আনসারি

ওহোদের যুদ্ধ (তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে) সংঘটিত হওয়ার কিছুদিন পরের ঘটনা। বিশ্বনবী (সা) একদিন নিজের একজন মাদানী সাহাবীকে বললেন, আজ তিনি তার বাড়ীতে যাবেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী মহানবীর (সা) কথা শুনে এত আনন্দিত হলেন যে, মাটির ওপর আর পা রাখতে পারছিলেন না। দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী গেলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মহানবীর (সা) মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। অতপর স্ত্রীকে বললেন ঃ

"দেখ ! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের গরীবখানায় তাশরীফ আনছেন। তুমি নিজের কাজে ব্যস্ত থেকো। কথাবার্তা বলে মহানবীকে (সা) কষ্ট দিও না।"

কিছুক্ষণ পর প্রিয় নবী (সা)-এর শুভাগমন ঘটলো। এ সময় মেযবান ও তার স্ত্রী সূর্যতুল্য মহানবীর (সা) নিজেদের বাড়ীতে আগমন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং হুজুরের (সা) সামনে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিছানা পেতে দিলেন। বিছানা পেড়ে তার ওপর বালিশও রাখলেন। অতপর মহানবীকে (সা) কিছুক্ষণ আরাম করার আরজী পেশ করলেন। তিনি (সা) বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এ সময় মেযবান নিজের গোলামকে বললেন, বকরীর সেই বাচ্চাটি জবেহ করে রান্না করে নিয়ে এসো। তিনি (সা) ঘুম থেকে জেগে হাত মুখ ধুয়ে না খেয়েই যেন চলে না যান।

বিশ্বনবী (সা) ঘুম থেকে জেগে হাত-মুখ ধুলেন। সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র খিদমতে গোশত, খোরমা এবং পানি পেশ করলেন। হুজুর (সা) অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি মেযবান বা বাড়ীওয়ালাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"সম্ভবত তুমি জানো যে, আমি খুব আগ্রহের সাথে গোশত খেয়ে থাকি।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।

বাড়ীওয়ালার গোত্রের লোকেরা জানতে পারলো যে, মহল্লার একটি বাড়ীতে মহানবীর (সা) শুভ পদার্পণ ঘটেছে। তখন তারা তাঁকে দর্শনের জন্যে ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু তাদের আবার এ ধারণাও ছিল যে, তারা যদি মহানবীর (সা) কাছে যায় তাহলে তিনি অসহ্য মনে করতে পারেন। এ জন্যে দূর থেকে তাকে দেখেই ফিরে যেতে লাগলেন।

খাওয়া শেষে মহানবী (সা) রওয়ানা দিলেন। এ সময় মেযবানের স্ত্রী ঘরের অভ্যন্তর থেকে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার স্বামী ও আমার ওপর দরুদ পড়ুন।"

বিশ্বনবী (সা) নির্দ্বিধায় মেযবান ও তার স্ত্রীর ওপর দরুদ পাঠ করে বললেন, "আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর রহমত নাযিল করুন।" অতপর হৃষ্টচিত্তে চলে গেলেন।

মদীনা মুনাওয়ারার এই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাঁর ওপর স্বয়ং মহানবী (সা) দরুদ পাঠ করেছিলেন ; তিনি ছিলেন হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী। আর তার ভাগ্যবতী স্ত্রী ছিলেন হযরত সোহায়লা (রা) বিনতে মাসউদ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খাজরাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন সালমাহ।

বনু সালমার বসবাস হাররাহ ও মসজিদে কিবলাতাইন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু স্বয়ং হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) খান্দান কবরস্থান ও একটি ছোট মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতো। হযরত জাবিরের (রা) দাদা আমর বিন হারাম এবং পিতা আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর নিজের কবিলার অন্যতম নেতা ছিলেন। আইনুল আরযাক নামক একটি ঝর্ণা ও কয়েকটি দুর্গ তাদের মালিকানাধীন ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত জাবিরের (রা) পিতা প্রায়ই ঋণগ্রস্ত থাকতেন। কেননা তিনি অধিক সন্তান ও দাতা মানুষ ছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ১৯ বছর পূর্বে হযরত জাবের (রা) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার (নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর) সময় পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, তিনি পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) এবং তিবরানী (র) স্বয়ং হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার পূর্বে আনসারদের এমন কোন মহল্লাহ ছিল না যাতে মুসলমানদের একটি দল না পাওয়া যেত। একদিন আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা আর বিশ্বনবীকে (সা) দীর্ঘদিন যাবৎ মক্কায় বন্ধুহীন ও

www.bjilibrary.com

সাহায্যকারী হিসেবে রাখবো না। তারপর আমরা হজ্জের সময় মক্কা গেলাম এবং প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গে উকবায় মিলিত হলাম।"

বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ ইসলামের ইতিহাসে এক মহান মর্যাদাকর ঘটনা। এই ঘটনায় যাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন বিশেষ মর্যাদার সাহাবী। তাঁরা ছিলেন সেই পবিত্র আত্মার মানুষ যাঁরা সমগ্র আরবের প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও মহানবীকে (সা) ইয়াসরাব আগমনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই দাওয়াতের সময় পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের জান-মাল এবং সন্তান দিয়ে মহানবীকে (সা) রক্ষা ও সাহায্য করবেন। এই বাইয়াত বা চুক্তির ফলশ্রুতিতেই কয়েক মাস পর রহমতে আলম (সা) নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে ইয়াসরাব গমন করেছিলেন এবং সেই ইয়াসরাবই "মদীনাতুন নবী (সা)" হিসেবে সুপরিচিত হয়। বাইয়াতে উকবায়ে কুবিরায় অংশগ্রহণকারীরা যেন ইতিহাসের ধারা ও মোড় পাল্টে দিয়েছিলেন। এ কাজ করে তাঁরা এমন সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যে, তাদের আর কোন জুড়ি ছিল না।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যে বদরের ময়দানে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত জাবিরও (রা) যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর তাঁকে যেতে দিলেন না। তিনি বললেন, বাড়ীতে থেকে ছোট বোনদের দেখা শুনা করো। বস্তুত তিনি ছিলেন ৯ অথবা ১০ বোনের একমাত্র ভাই। এ জন্যে পিতার নির্দেশ মানলেন। স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুজুরের (সা) সাথে যুদ্ধে গমনের সৌভাগ্য অর্জন এবং বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। ইমাম বুখারী (র) স্বলিখিত ইতিহাসে লিখেছেন, হযরত জাবির (রা) যদিও যুদ্ধে অংশ নেননি। তবুও বদরে পৌছেছিলেন এবং মুসলমানদেরকে পানি পান করিয়েছিলেন। পরবর্তী বছর কুরাইশরা বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অত্যন্ত জোরেশোরে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর চড়াও হলো এবং ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সহীহ বুখারীতে আছে যে, যুদ্ধের এক রাত আগে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর, হযরত জাবিরকে (রা) ডাকলেন এবং বললেন ঃ

"আমার অন্তর বলছে যে, এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম আমার শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য হবে। নিজের জান-মাল এবং সন্তান ও সকল বস্তু থেকে আমি প্রিয় নবীকে (সা) বেশী ভালবাসি। মহানবীর (সা) পর তুমি আমার বেশী প্রিয়। তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, বাড়ীতে থেকে নিজের বোনদের ভালোভাবে খোঁজ-খবর ও তত্ত্বাবধান করবে এবং আমার ওপর যে ঋণ রয়েছে তা আদায় করবে।"

www.bjilibrary.com

হযরত জাবির (রা) যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পিতার নির্দেশে মজবুর বা বাধ্য হয়ে পড়লেন। কেননা বোনদের মধ্যে ৬জন খুব ছোট ছিল। তিনিও যদি যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তেন তাহলে বাড়ী সম্পূর্ণ খালি হয়ে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর ওহোদের ময়দানে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। এমনিভাবে তাঁর অন্তরের সাধ পূরণ হলো। পাষাণ হৃদয় মুশরিকরা তার লাশ বিকৃত করে ফেললো (নাক, কান এবং ঠোঁট কেটে ফেললো)। লড়াই শেষ হলে মুসলমানরা লাশ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। হযরত জাবির (রা) পিতার শাহাদাতের খবর পেয়ে ওহোদের ময়দানে পৌছলেন। পিতার লাশের মুখ থেকে কাপড় সরালেন। তার অবস্থা দেখে হুহু করে কেঁদে উঠলেন। ইত্যবসরে তাঁর ফুফু হযরত হিন্দ (রা) বিনতে আমর বিন হারামও এসে পৌছলেন। ভাইয়ের লাশ এই অবস্থায় দেখে তিনিও চীৎকার দিয়ে কেঁদে ফেললেন। এই অবস্থায় রহমতে আলম (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা কাঁদো অথবা নাই কাঁদো। ফেরেশতারা নিজের পর্দা দিয়ে আবদুল্লাহর ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবিরের (রা) বোনেরা মদীনা থেকে একটি উঁট প্রেরণ করলেন। তাতে পিতার লাশ উঠিয়ে মদীনা আনা এবং বনু সালামার বংশীয় কবরস্থানে দাফন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছিল। হযরত জাবিরও (রা) তাই করতে চাইলেন। কিন্তু মহানবী (সা) অনুমতি দিলেন না এবং হযরত আবদুল্লাহকে (রা) তাঁর ভগ্নিপতি হযরত আমর (রা) ইবনুল জানুই-এর সঙ্গে ওহোদের গনজে শহীদানে একই কবরে দাফন করলেন।

তিরমিযি শরীফে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত জাবির (রা) অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হুজুর (সা) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত চিন্তান্বিত কেন ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। অনেক ঋণ রয়ে গেছে। অনেক শিশু সন্তান রেখে গেছেন। সেই চিন্তাই করছি।

হুজুর (সা) বললেন ঃ আল্লাহ পাক তোমার পিতার শাহাদাতের পর তাঁর সাথে সরাসরি এবং বিনা পর্দায় কথাবার্তা বলেছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা কারোর সাথে পর্দা ছাড়া কথাবার্তা বলেন না। তিনি তোমার পিতাকে নিজের সামনে ডেকে বললেন, হে আমার বান্দাহ ! তোমার যা ইচ্ছা, তা চাও। সে

www.bjilibrary.com

আরজ করলো, হে আমার পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। যাতে আমি আবার তোমার দুশমনদের সাথে লড়াই করতে পারি এবং শাহাদাত প্রাপ্ত হই। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, এটা আমার অকাট্য সিদ্ধান্ত ; যে দুনিয়া থেকে আসবে তাকে আর ফেরত পাঠানো হবে না। আবদুল্লাহ (রা) আরজ করলেন, হে আমার আল্লাহ্ ! আমার অবস্থার খবর আমার উত্তরাধিকারদের কাছে পৌছে দিন। একথা বলার পর আল্লাহর এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁকে মৃত মনে করো না। বরং সে জীবিত।"

মহানবীর (সা) ইরশাদ শুনে হযরত জাবিরের (রা) মনে হলো যেন, তার ক্ষতস্থানের ওপর আরামদায়ক মলম লেপন করে দেয়া হলো। এই ঘটনার কিছু দিন পর মহানবী (সা) সকালে হযরত জাবিরের (রা) বাগানে তাশরীফ নিলেন এবং তার দুই বাগান থেকে জমা করা খেজুরের স্তুপের ওপর বসে গেলেন। তার পূর্বে বিশ্বনবী (সা) হযরত জাবিরের (রা) ইহুদী ঋণ প্রদানকারীকে অনুগ্রহ করে কিছুকম নেয়া অথবা দুই কিস্তিতে তা আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে পরিষ্কার ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রিয় নবী (সা) এখন হযরত জাবিরকে (রা) খেজুর বন্টন শুরুর নির্দেশ দিলেন। তিনি খেজুর বন্টন শুরু করলেন এবং প্রিয়নবী (সা) দোয়ায় ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। আল্লাহর কি কুদরত ! খেজুরে এত বরকত হলো যে, সমস্ত ঋণ পরিশোধের পরও অনেক বেঁচে গেল। হযরত জাবির (রা) ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন। মহানবীও (সা) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তাঁর (সা) একজন একনিষ্ঠ সাহাবী সবসময়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেল। সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে এই ঘটনাকে প্রিয় নবীর (সা) মুজিজার মধ্যে পরিগণিত করা হয়েছে।

খেজুর বন্টনের পর হযরত জাবির (রা) হুজুরকে (সা) নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর (সা) সামনে গোশত, খুরমা এবং পানি পেশ করলেন। এ সময় প্রিয় নবী (সা) হযরত জাবির (রা) ও তাঁর স্ত্রীর ওপর দরূদ পড়লেন। এই ঘটনার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে।

হযরত জাবির (রা) বদর এবং ওহোদের যুদ্ধে পিতার নিষেধের কারণে অংশ নিতে পারেনি। তারপর তিনি রাসূলের (সা) যুগে সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ (র) বিন হাম্বলের বর্ণনা মুতাবিক তিনি ১৯টি যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা কতিপয় যুদ্ধের প্রসঙ্গে তাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং কোন না কোন বিশেষ ঘটনা তাঁর সাথে

www.bjilibrary.com

সংশ্লিষ্ট করেছেন অথবা তাঁর যবানীতে তার বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনার কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

পঞ্চম হিজরীতে আহযাব বা পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্যে বিরাট পরীক্ষা। হক বিরোধী আরবের সকল শত্রু একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর হামলা করে বসে। এদিকে মুসলমানদেরকে নিজেদের হেফাজতের জন্যে কঠিন পাথরের ভূমিতে খন্দক খুঁড়তে হয়। উপরন্তু খাদ্যের এত ঘাটতি ছিল যে, মুসলমানদেরকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছিল। হযরত জাবিরও (রা) অন্যান্য মুসলমানের সাথে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা খন্দক বা পরিখা খনন করছিলাম। একটি কঠিন পাথর সামনে পড়লো। লোকেরা মহানবীর (সা)-এর খিদমতে আরজ করলো যে, পরিখায় একটি বড় কঠিন পাথর দেখা যাচ্ছে। প্রিয় নবী (সা) বললেন, আমি খন্দকে অবতরণ করছি, বস্তুত তিনি কোদাল হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। সে সময় তাঁর পবিত্র পেটে (প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে) একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরা তিনদিন ধরে খন্দক খুঁড়ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে সামান্য দানাও আমাদের পেটে পড়েনি। বিশ্বনবী (সা) কোদাল দিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি প্রিয় নবীর (সা) নিকট বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, মহানবীকে (সা) আজ এমন অবস্থায় দেখেছি যে, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ঘরে কি কোন খাদ্য বস্তু আছে? সে জবাব দিল যে, সামান্য যব এবং বকরীর একটি বাচ্চা আছে। আমি বকরীর বাচ্চাটি জবেহ করলাম এবং তার গোশত হাঁড়িতে রেখে পাকাতে দিলাম। স্ত্রী যব পিষে আটা বানালো। তারপর আমি প্রিয় নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম যে, আমার বাড়িতে তাশরীফ এনে কিছু খাদ্য গ্রহণ করুন। তিনি দাওয়াত কবুল করলেন এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে খন্দকবাসী ! আজ জাবের তোমাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না যাবো ততক্ষণ যেন চুলার ওপর থেকে হাঁড়ি না নামানো হয় এবং উনুন থেকে রুটি বের করা না হয়। আমি খুব পেরেশান হলাম এবং মনে মনে বললাম, প্রিয় নবী (সা) এক বিরাট দলকে এক সা যব এবং বকরীর একটি বাচ্চা খাওয়ার জন্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, আজ তুমি আমাকে লজ্জিত করে ছেড়েছ। বিশ্বনবী (সা) খন্দক-বাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়ার জন্যে তাশরীফ আনছেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, প্রিয় নবী (সা) কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম হাঁ;

www.bjilibrary.com

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমার নিকট কতটুকু খাবার আছে। স্ত্রী বললো ঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা) বেশী অবহিত আছেন। অতপর মহানবী (সা) সাহাবা (রা) সমেত তাশরীফ আনলেন। তিনি রুটি ছিঁড়ে ছারিদ (এক ধরনের আরবীয় খাবার) বানাতে লাগলেন। চামচ দিয়ে তাতে গোশত উঠিয়ে দিতে লাগলেন এবং গোশত দিয়ে রুটি ঢেকে দিতে লাগলেন। তিনি অব্যাহতভাবে এ ধরনের করতে লাগলেন এবং লোকদের সামনে তা পেশ করলেন। পরিবেশিত এই খাবার সবাই আসুদা বা পেট পুরে খেলেন এবং তিনিও খেলেন। তারপরও সেই খাবার বেঁচে গেল। এ সময় তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমিও খাও এবং লোকদেরকেও প্রেরণ করো। কেননা, লোকজন অভুক্ত রয়েছে।"

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত মুতাবিক, যারা এ সময় খাবার খেয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। কতিপয় অন্য রেওয়ায়াতে এই সংখ্যা তিনশ' এবং ৮শ' উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনাও মহানবীর (সা) মশহুর মুজিযার মধ্যে শামিল করা হয়ে থাকে।

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত জাবির (রা) বনু মুসতালিকের যুদ্ধে হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রওয়ানার পূর্বে হযরত জাবির (রা) কোন কাজে গিয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ফিরে না এলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা) যাত্রার নির্দেশ দেননি।

এই ঘটনায় প্রকাশ পায় যে, মহানবী (সা) হযরত জাবিরকে (রা) কত ভালোবাসতেন।

মুসতালিক যুদ্ধের পর হযরত জাবির (রা) আনমারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি আনমারের যুদ্ধে প্রিয় নবীকে (সা) সওয়ারীর ওপর বসে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি।

আনমারের যুদ্ধের পর বাইয়াতে রিদওয়ানের (৬ষ্ঠ হিজরী) মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী ভাগ্যবানদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের বা বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত জাবিরও (রা) সেই সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসনাদে আহমদে আছে, বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) রাসূলে আকরাম (সা)-এর এবং হযরত জাবির (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) পবিত্র হাত ধরে ছিলেন। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হুজুর (সা) সেখানে উপস্থিত সাহাবীদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম।"

www.bjilibrary.com

বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য অর্জনের পর হযরত জাবির (রা) খায়বারের যুদ্ধ এবং জাতুর রাকা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। জাতুর রাকা যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় হযরত জাবির (রা)-এর উট একাকি থেমে গেল। হুজুর (সা) তা দেখে বললেন, তার কি হলো। তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! জানি না, কেন এ রকম বিগড়ে গেল। কোনভাবেই চলার নাম পর্যন্ত করছে না।"

বিশ্বনবী (সা) উটকে একটি কোড়া মারলেন এবং দোয়া করলেন। উটটি আগের চেয়েও বেশী দ্রুততার সাথে দৌড়াতে লাগলো। হুজুর (সা) বললেন, আমার কাছে উটটি বিক্রয় করে দাও।

তিনি আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। বিক্রি করবো না। বরং আপনাকে দিয়ে দিলাম।"

হুজুর (সা) বললেন, না, অবশ্যই দাম দেয়া হবে।

তিনি দরখাস্ত করলেন যে, মদীনা পর্যন্ত তার ওপর যাওয়ার অনুমতি দিন। হুজুর (সা) বললেন, ঠিক আছে।

মদীনা পৌছে উটের রশি ধরে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই উট গ্রহণ করুন।"

মহানবী (সা) উটের চারপাশে ঘুরছিলেন এবং বলছিলেন, কত সুন্দর উট, কত ভালো উট।

অতপর হযরত বিলালকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, হযরত জাবিরকে (রা) এত আওকিয়া স্বর্ণ মেপে দাও। তিনি স্বর্ণ মেপে দিলেন। তারপর হুজুর (সা) আরো কিছু দিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি উটের মূল্য পেয়েছ ? আরজ করলেন, "হাঁ, আল্লাহর রাসূল ! মহানবী (সা) বললেন, "যাও, উটও নিয়ে যাও। আমার পক্ষ থেকে এটা তোমার প্রতি উপহার।"

অষ্টম হিজরীর রজব মাসে প্রিয়নবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ-এর নেতৃত্বে সমুদ্রোপকূলের দিকে একটি অভিযান চালান। এই অভিযানের নাম হলো সারিয়্যাহ সাইফুল বাহর অথবা জাইশুল খাবত। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল কুরাইশের গমনাগমন বা চলাচলের খবর নেয়া। এই অভিযানে তিনশ' লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাতে হযরত জাবিরও (রা) ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যে রসদ খতম হয়ে গেল এবং সৈন্যদেরকে কিছুদিন যাবৎ গাছের পাতা ঝেড়ে ঝেড়ে খেতে হয়েছিল। ইত্যবসরে সমুদ্রের ঢেউ এক বিশাল মাছ কূলে তুলে দিল। সৈন্যবাহিনী একে আল্লাহর পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করলো এবং ১৫ দিন পর্যন্ত তা খেল। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই মাছের নাম ছিল আম্বর। লোকজন তার মাছও খেয়েছিল এবং শরীরে তার তেলও ব্যবহার করেছিল। মাছটি এত বড় ছিল যে, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তার একদিক ধরে উঁচ করলেন এবং সেনাবাহিনীর সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তিকে উটের ওপর বসিয়ে তার নীচ দিয়ে যেতে বললেন। সে চলে গেল। মুসনাদে আহমদে আছে যে, হযরত জাবির (রা) পাঁচ ব্যক্তিসহ সেই মাছের চোখের হাড়ের মধ্যে বসে গেলেন। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারলো না।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত জাবির (রা) সেই দশ হাজার পবিত্র ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রহমতে আলমের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। তাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিসনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত জাবির (রা) হুনাইনের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে তিনি তাবুকের যুদ্ধের কঠিন সফরে মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিদায় হজ্জেও (দশম হিজরী) প্রিয় নবীর (সা) সাথে ছিলেন।

একাদশ হিজরীতে রিসালাত সূর্য আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় অস্তমিত হলে হযরত জাবির (রা) দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং মসজিদে নববীতে বসে একাগ্রচিত্তে পঠন-পাঠনে মশগুল হয়ে পড়লেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি লোকদেরকে পবিত্র কুরআন পড়ানো এবং হুজুরের (সা) বাণীসমূহ তাদের নিকট পৌছানোতে ব্যয় করতে থাকেন। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর খিদমতে হাজির হতেন এবং তাঁর জ্ঞানের সাগর থেকে উপকৃত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন। হযরত জাবির (রা) মহানবীর (সা) পবিত্র মুখে শুনেছিলেন যে, শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান-এর মর্যাদা জিহাদের মর্যাদার সমান। এ জন্যে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান এবং ফতওয়া প্রদানে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বছরের পর বছর ধরে অব্যাহতভাবে নিজের জ্ঞানের ফয়েজ তিনি জনগণকে প্রদান করেছিলেন। হযরত আলী (রা) কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু-এর খিলাফতকালে হযরত আমীর মাবিয়া (রা) বিরোধী তৎপরতা শুরু করলে হযরত জাবির (রা) হযরত আলীর (রা) প্রতি জোরেশোরে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে শামিল হয়ে সিফফিনের যুদ্ধে আমীর মাবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে পূর্ণভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর আবার মদীনা মুনাওয়ারা এসে শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এটা ছিল ৩৭ হিজরীর ঘটনা। তিন বছর পর আমীর মাবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে বছর বিন আবি আরতাত মদীনা মুনাওয়ারার শাসক নিযুক্ত হয়ে

www.bjilibrary.com

এলো। এ সময় ঘোষণা করা হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত জাবির (রা) আমির মাবিয়ার (রা) আনুগত্য বা বাইয়াত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বনু সালমা নিরাপত্তা পাবে না। হযরত জাবির (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার (রা) সাথে পরামর্শ করলেন এবং নিরুপায় চিত্তে বছর বিন আবি আরতাতের নিকট গিয়ে আমীর মাবিয়ার (রা) শাসনের আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ইয়াযিদের শাসনকালে (৬১ হিজরীর মহররম মাসে) কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। তাতে হযরত জাবির (রা) সীমাহীন কষ্ট পেলেন। যখন শুনলেন যে, ইয়াযিদ কারবালার শহীদানের উত্তরাধিকাদেরকে হযরত নোমান বিন বশীরের (রা) তত্ত্বাবধানে দামেশক থেকে মদীনা প্রেরণ করেছে, তখন কঠিন বার্ধক্য সত্ত্বেও বনু হাশেমের কিছু লোকের সাথে কারবালা পৌছলেন। উদ্দেশ্য ছিল শোকার্ত কাফেলাকে মদীনা নিয়ে আসা। রাসূল (সা) বংশের মুসিবত যাদাহ্ কাফেলা যখন দামেশক থেকে কারবালা পৌছলো তখন হযরত জাবির (রা) অশ্রু পূর্ণ নয়নে ও ভাঙ্গা হৃদয়ে তাদেরকে ইসতিকবাল করলেন। হযরত যয়নব (রা) বিনতে আলী (রা) বনু হাশেম-এর লোকদেরকে এবং হযরত জাবিরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন :

"হে বনু হাশেম ! তোমাদের চাঁদ ডুবে গেছে। হে আমার নানার (সা) সাহাবী ! তুমি যে শিশুকে হযরত হোসাইন মহানবীর (সা) পবিত্র কাঁধের ওপর সওয়ার করিয়েছিলে ; তার পবিত্র দেহকে ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ঠ করা হয়েছে।"

হযরত জাবির (রা) এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মানুষ হযরত যয়নবের (রা) কথা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি সেই মুসিবত যাদাহ্ কাফেলার সাথে মদীনা পৌছলেন এবং যতদূর সম্ভব হয়েছিল রাসূলের (সা) মজলুম বংশকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসূফ ছাকাফী মদীনা মুনাওয়ারার আমীর নিযুক্ত হয়ে এলো। এ সময় সে এমনসব লোকের ব্যাপারে পুংখানুপুংখ রূপে অনুসন্ধান চালালো যাঁরা হযরত আলীকে (রা) জোরেশোরে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই সমর্থকদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক জালিলুল কদর সাহাবীও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাজ্জাজ মহানবীর (সা) সেইসব জাননিছার সাহাবীর (রা) মান-মর্যাদার প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে বরং তাদের গর্দান ও হাতে কড়া পরিয়ে দিয়েছিলো। ইবনে আছির (র.) "উসদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হাজ্জাজ হযরত জাবিরের (রা) হাতে কড়া পরিয়ে দিল। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। চোখে দেখতেন না। অত্যন্ত দুর্বল ও রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম যুগের সাহাবীদের (রা) মধ্যে তিনিই শুধু জীবিত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

এই ঘটনার কিছুদিন পর পরপারের ডাক এলো এবং ইসলামী বিশ্বের সেই মহান ব্যক্তিত্ব তাতে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ নামাযে জানাযা পড়ালো এবং অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) পুত্র আমার (রা) নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছিল।

হযরত জাবির (রা) দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল সোহায়লাহ (রা) বিনতে মাসউদ। তিনি আনসারের জাফর গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হযরত সোহায়লার (রা) প্রথম স্বামী ওহোদ যুদ্ধের আগে মারা গিয়েছিলেন। হযরত জাবিরের (রা) পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রা) ওহোদের যুদ্ধে শাহাদাত পান। এ সময় তিনি হযরত জাবির (রা) ছাড়া ৯ অথবা ১০জন অল্প বয়স্কা মেয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সম্ভবত হযরত জাবির (রা)-এর মা ইন্তিকাল করেছিলেন। এ জন্যে তিনি বোনদের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের জন্যে হযরত সোহায়লাহ (রা) বিনতে মাসউদকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা) যখন জানতে পারলেন তখন তিনি হযরত জাবিরকে (রা) বললেন ঃ "জাবির তুমি একজন বিধবাকে বিয়ে করেছ। যদি একজন কুমারীকে বিয়ে করতে তাহলে উভয়েই আনন্দ করতে পারতে।

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! বোনরা ছিল অল্প বয়েস্কা। এজন্যে কোন হুশিয়ার মহিলা প্রয়োজন ছিল। যে তাদের চুল ছেটে দিতে উকুন বাছতে এবং কাপড় সেলাই করে পরিধান করাতে পারতো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি ঠিক করেছ।"

হযরত জাবির (রা) দ্বিতীয় বিয়ে করেন উম্মে হারিছাকে। উম্মে হারিছ ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাহ আনসারীর কন্যা।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, বিয়ের পূর্বে হযরত জাবির (রা) চুপিসারে উম্মে হারিছকে দেখেছিলেন। কেননা ইসলামে মেয়ে দেখে বিয়ে করার অনুমোদন রয়েছে।

হযরত জাবিরের (রা) এই দুই স্ত্রীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। তারা হলো ঃ আবদুর রহমান (অথবা আবদুল্লাহ) আকিল, মুহাম্মাদ, মাইমুনা, হামিদা এবং উম্মে হাবিবা।

হযরত জাবির (রা) সেইসব সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত যাঁরা ইলম ও মর্যাদার দিক থেকে উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির থেকে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার

সাথে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) বিন জাররাহ (রা), হযরত আবু হুর-াইরা (রা), হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত উম্মে শুরায়েক (রা), হযরত উম্মে মালিক (রা) এবং আরো অনেক জালিলুল কদর সাহাবী (রা) ও মহিলা সাহাবী (রা) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এভাবে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ও সাগরে পরিণত হন। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহতে তার বিশেষ পাণ্ডিত্ব ছিল। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র মদীনাবাসীই নন বরং এই জ্ঞান সূর্যের আলো থেকে মক্কা মুয়াজ্জমা, ইয়েমেন, ইরাক এবং মিসরের লোকেরা পর্যন্ত আলোকিত হয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবির (রা) সেইসব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা মদীনা মুনাওয়ারাতে ফতওয়া প্রদান করতেন এবং তাঁদের ফতওয়ার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যেত।

হাদীস বর্ণনার দিক থেকে হযরত জাবির (রা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হতেন। তার থেকে এক হাজার পাঁচশ' চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে এবং বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার দিক থেকে শুধুমাত্র হযরত আবু হুরাইরা (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) তাঁর থেকে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও হযরত জাবির (রা) হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সকল ধরনের তাবেয়ীই উপকৃত হয়েছেন। অবশ্য যাঁরা তাঁর খাস শাগরিদদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন তাঁদের কতিপয় হলেন ঃ

ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (র), মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাসান (রা), আছিম বিন ওমর বিন কাতাদাহ (রা), মু হাম্মাদ বিন মুনকাদার (র), হাসান বিন মুহাম্মাদ হানিফাহ (র), সাঈদ বিন আবি বেলাল (র) ও সায়াদ বিন মিনার (র)।

হযরত জাবিরের (রা) জ্ঞান ও মর্যাদা সমকালীনদের মধ্যে স্বীকৃত ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে লজ্জাবোধ করতেন না।

ইমাম বুখারী (র) "তারিখুস সগীরে" হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে কোন একজন বললো, কিসাসের ব্যাপারে হুজুরের (সা) একটি হাদীস আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিসের নিকট রয়েছে। তিনি সে সময় সিরিয়াতে ছিলেন। আমি একটি উট কিনলাম এবং সেই হাদীস শ্রবণের জন্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সিরিয়া পৌছলাম। সেখানে আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিসের বাড়ি পৌছলাম এবং তাঁকে বলে পাঠালাম যে জাবির আপনার সাথে

www.bjilibrary.com

সাক্ষাত করতে এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন জাবির, আবদুল্লাহ (রা) পুত্র ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। একথা শুনে তিনি এই অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন যে, তার গায়ের চাদর পায়ের তলায় পড়ে যাচ্ছিল। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতপর আমি বললাম যে, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নিকট কিসাস সম্পর্কিত মহানবীর (সা) একটি হাদীস রয়েছে। আমি এই হাদীস শুনতে আপনার নিকট এসেছি। হযরত আবদুল্লাহ বিন আনিস বললেন, আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাহদেরকে একত্রিত করবেন। সবাই উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় থাকবে এবং বুহম হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বুহমের অর্থ কি ? তিনি বললেন, কারোর নিকট কিছুই থাকবে না। অতপর আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলবেন, আমি বদলা দিব। আমিই মালিক। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক জান্নাতীকে প্রত্যেক দোজখী থেকে এবং প্রত্যেক দোজখী থেকে প্রত্যেক জান্নাতীকে হক আদায় করে না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে জান্নাতে অথবা দোজখে নিক্ষেপ করবোন না। এমনকি একটি সাধারণ থাপ্পড়ের কিসাস বা বদলাও আদায় করে দেব। আমরা সবাই (উপস্থিত) আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এই বদলা কিভাবে দেয়া হবে। কারণ, আমরা তখন সবাই উলঙ্গ ও শূন্য হস্ত থাকবো। হুজুর (সা) বললেন, নেকী ও বদী দিয়ে ফায়সালা করা হবে। এই হাদীস শোনার পর হযরত জাবির (রা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলেন।

তিবরানী "আল আওসাত"–এ বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) একটি হাদীস শোনার জন্যে হযরত মাসলামাহ (রা) বিন মুখাল্লাদ আনসারীর নিকট মিসরেও গিয়েছিলেন। হযরত মাসলামাহ (রা) যখন তাঁকে বললেন ঃ "আমি প্রিয় নবী (সা) থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দোষ ঢেকে রাখে, সে যেন জীবিত কবর দেয়া কন্যাকে জীবিত করলো।" একথা শুনে হযরত জাবির (রা) খুব খুশী হলেন এবং মিসরে অবস্থান ছাড়াই মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই হাদীসের শব্দাবলী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইকে পর্দাপুশি বা ঢেকে রাখে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে ঢেকে রাখবেন।"

হযরত জাবির (রা)-এর কম-বেশী দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে মহানবীর (সা) সান্নিধ্য ও বন্ধুত্বের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এ সময় তিনি প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র যবান থেকে যা কিছু শুনেছেন তাই জীবনের মন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনিভাবে বিশ্বনবীর (সা) যুগে যেসব ঘটনা তাঁর চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছিল তা তিনি খুব ভালোভাবেই সংরক্ষণ করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

তিনি এ ধরনের ঘটনাবলী এবং হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ অত্যন্ত বিনয় ও আনন্দচিত্তে মানুষের সামনে বর্ণনা করতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

❑ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) একটি বকরীর মৃত বাচ্চার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই মৃত ছাগ শিশুর নাক ও কান কাটা ছিল। তিনি (সা) লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এই মৃত ছাগ শিশুকে এক দিরহামের বিনিময়ে কিনবে ? লোকেরা আরজ করলো, আমরা তো তা বিনা পয়সাতেও নিতে পারি না। এখনতো তা মৃত। যখন জীবিত ছিল তখনো দোষযুক্ত হওয়ার কারণে এক দিরহামের বিনিময়ে তা ছিল চড়া দামের। একথা শুনে মহানবী (সা) বললেন, আল্লাহর কসম ! এই মৃত বকরীর বাচ্চা তোমাদের নজরে এত নগণ্য নয় যত নগণ্য এই দুনিয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

❑ প্রিয় নবী (সা) একবার খুতবায় বলেছিলেন, আমি স্বয়ং মুসলমানদের থেকে বেশী তাদের কল্যাণকামী। যদি কোন মুসলমান মারা যায় এবং সম্পদ রেখে যায়। তাহলে তার ওয়ারিশ তার আত্মীয়রা হবেন। কিন্তু ঋণ অথবা গরীব মুহতাজ আত্মীয় রেখে গেলে তা আদায় ও গরীব আত্মীয়ের প্রতিপালন আমার দায়িত্বে। (মুসলিম)

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন যে কোন জিনিস কেনা-বেচার সময় নরম হয়। উপরন্তু দাবী করার সময় নরম হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী)

❑ মহানবী (সা) থেকে কখনো এমন কিছু চাওয়া হয়নি যে, তিনি (সা) তার জবানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। (সহীহ বুখারী)

❑ প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। যখন কোন রোগের ঔষধ পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে সে সুস্থ হয়ে যায়।

❑ আমি মহানবীর (সা) সাথে জোহরের নামায আদায় করলাম। অতপর তিনি (সা) নিজের বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। সামনে কয়েকটি শিশু এসে পড়লো। তিনি তাদের প্রত্যেকের গণ্ডদেশে হাত রেখে আদর করলেন। যখন আমার পালা এলো তখন তিনি আমার দুই গণ্ডদেশেই হাত রেখে আদর করলেন। এ সময় আমি তাঁর পবিত্র হাত খুব ঠাণ্ডা মনে করলাম এবং সুগন্ধি অনুভব করলাম। মনে হলো যেন এইমাত্র আতর বিক্রেতা আতরের পাত্র থেকে তার হাত বের করেছে। (সহীহ মুসলিম)

www.bjilibrary.com

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তায়ালার কাছে সুন্দর ধারণা রাখতে হয় (অর্থাৎ তার রহমতের ওপর পূর্ণ ভরসা করা উচিত)। (সহীহ মুসলিম)

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মুসলমান কোন মুসলমানের সাহায্য করা থেকে এমন সময় পিছু হটে যায় যখন তার মান-সম্মান পদদলিত করা হয়। তাহলে আল্লাহপাকও এই নাজুক সময়ে তার সাহায্য-সহযোগিতা পরিত্যাগ করে। অথচ তিনি চান যে, কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসুক। এবং যে মুসলমান কোন মুসলমানের সাহায্যের জন্যে এমন সময় দাঁড়িয়ে যায় যেখানে তার মান-ইজ্জত পদদলিত করা হয় ; তাহলে আল্লাহ তায়ালাও এমন স্থানে তাকে সাহায্য করে। যেখানে তিনিও চান যে কেউ তাকে সাহায্য করুক। (মুসনাদে আবু দাউদ)

❑ আমরা এক যুদ্ধে রাসূলের (সা) সাথে ছিলাম। (হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, এটা ছিল বনি আল-মুসতালিকের যুদ্ধ) এমন সময় একজন মুহাজির একজন আনসারীকে লাথি মারলো। এই ঘটনার পর মুহাজির ব্যক্তিটি অন্যান্য মুহাজিরকে সাহায্যের জন্যে ডাকালো এবং আনসারীও অন্যান্য আনসারীকে ডাকলো। তিনি (সা) এই শোরগোল শুনে বললেন, এটাতো জাহেলী যুগের আওয়াজের মত শোনা যাচ্ছে। লোকেরা আরজ করলো, এক মুহাজির কোন এক আনসারীকে লাথি মেরেছে (তাতে কিছু হাঙ্গামা হয়েছে)। হুজুর (সা) বললেন, এই আশোভন কথাবার্তা পরিত্যাগ করো। এই ঘটনার কথা (মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ বিন উবাইও শুনলো। সে বললো, কি একজন মুহাজির এই কাজ করেছে ? ঠিক আছে মদীনা পৌছতে দাও। ইজ্জত ওয়ালা গোষ্ঠী নীচু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অপমান করে বের করে দেবে। হযরত ওমর (রা) ইবনে উবাই-এর কথা জানতে পারলেন। এ সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি অনুমতি দিলে আমি এই মুনাফিকের গরদান উড়িয়ে দিতে পারি। তিনি (সা) বললেন, রাখো ; লোকজন বলবে যে, আমি নিজের লোকদেরকেও কতল করে থাকি। ইবনে উবাই-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা) পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! তুই মদীনায় সেই সময় পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবি না যতক্ষণ নিজের মুখে স্বীকার না করবি যে তুই নিজে নীচ এবং মহানবী (সা) সম্মানিত ব্যক্তি। শেষে সে তা স্বীকার করলো। (তিরমিযি)

❑ আমি এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নজদের দিকে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে আমরা এমন এক উপত্যকায় পৌছলাম যেখানে অসংখ্য কাঁটাদার বৃক্ষ পেলাম। হুজুর (সা) স্বয়ং এক বাবলা গাছের তলায় নামলেন। সেনাবাহিনী

www.bjilibrary.com

অন্যান্য সদস্য বিভিন্ন গাছের ছায়ায় পৌছার জন্যে এদিক-ওদিক চলে গেলেন। হুজুর (সা) নিজের তরবারী সেই বাবলা গাছে ঝুলিয়ে দিলেন। অতপর বাহিনীর সকল সিপাহী ঘুমিয়ে গেলেন। হঠাৎ করে আমরা মহানবীর (সা) কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি আমাদেরকে ডাকছিলেন। আমরা উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, একজন গোঁয়াড় বা গ্রাম্য মানুষ তাঁর (সা) সামনে দাঁড়ানো। তিনি (সা) বললেন, আমি শুইতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এই ব্যক্তি আমার ওপর তরবারী উঁচু করে ধরলো এবং বললো যে, আমার হাত থেকে তোকে কে বাঁচাতে পারে ? আমি বললাম, আল্লাহ। তারপর তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। আমি এই তরবারী উঠিয়ে তাকে বললাম, এখন তোমাকে কে বাঁচাতে পারে ? তাতে সে লজ্জা প্রকাশ করলো এবং ক্ষমা চাইলো। হুজুর (সা) সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন এবং কোন শাস্তি দিলেন না। সেই ব্যক্তি যখন স্বজাতির কাছে ফিরে গেল তখন বলতে লাগলো যে, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি, যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ। (সহীহ বুখারী)

❑ হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল একদিন নিজের কওমকে নামায পড়াতে গিয়ে সূরায়ে বাকারাহ পড়া শুরু করলেন। (তাঁর লম্বা কিরাতের কারণে) এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে হাল্কাভাবে নামায পড়ে নিল। হযরত মুয়াজ (রা) ঘটনা জানতে পেরে বললেন, এই ব্যক্তি মুনাফিক। সে ব্যক্তি একথা শুনে হুজুরের (সা) খিদমতে পৌছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা শ্রমজীবি মানুষ। স্বহস্তে মজদুরী করি এবং উটের মাধ্যমে পানি ভরি। আজ রাতে মুয়াজ (রা) আমাদের নামায পড়িয়েছে এবং তাতে সূরায়ে বাকারাহ পড়া শুরু করে দেয়। এ জন্যে আমি প্রথৃকভাবে নিজের নামায পড়েছি। তাতে মুয়াজের ধারণা যে আমি মুনাফিক। মহানবী (সা) [হযরত মুয়াজকে (রা) ডেকে] বললেন ঃ মুয়াজ ! ফিতনা সৃষ্টি করতে চাও ? তিনবার এই বাক্য উচ্চারণ করলেন। শুধু ওয়াসশামছি ওয়া দুহাহা এবং সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আ'লা-এর মত সূরা পাঠ করবে। (সহীহ বুখারী)

❑ হুদাইবিয়াতে লোকজন পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। নবীয়ে আকরামের (সা) সামনে ছোট একটি পাত্র দিল। এই পাত্র দিয়ে তিনি ওজু করছিলেন। লোকজন ঘাবড়াতে ঘাবড়াতে তাঁর কাছে এলো। তিনি (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? সাহাবারা আরজ করলেন, আমাদের কাছে পান করার এবং ওজু করার পানি নেই। তিনি (সা) নিজের সামনের বরতনে বা পাত্রে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন। এ সময় পানি তাঁর (সা) আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে এমনভাবে প্রবাহিত হতে লাগলো যেভাবে ঝরণা দিয়ে প্রবাহিত হয়। সেই পানি আমরা পান এবং ওজু করলাম। সে সময় আমরা ১৫০০ মানুষ ছিলাম।(সহীহ বুখারী)

www.bjilibrary.com

হযরত জাবিরের (রা) নৈতিক ও চারিত্রিক বাগানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফুল হলো ইসলামে অগ্রবর্তীতা, রাসূল প্রেম, ঈমানী আবেগ, সহজ-সরলতা, জ্ঞানের প্রতি চরম আকর্ষণ এবং হক কথন। এসব সুন্দর গুণের কারণে তিনি মহানবীর (সা) নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যেভাবে তিনি মহানবীকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং পদে পদে তাঁর আনুগত্য, সম্মান ও সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন তেমনি মহানবীও (সা) তাঁকে সীমাহীন স্নেহ ও ভালোবাসতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, কোন সময় মহানবীর (সা) ঋণের প্রয়োজন হলে কোন লৌকিকতা ছাড়াই হযরত জাবিরের (রা) নিকট থেকে তা নিয়ে নিতেন। একবার ঋণ আদায়ের সময় সন্তুষ্টি প্রকাশের নিমিত্তে কিছু বেশীই দিয়ে দিলেন।

যখনই সুযোগ হতো তখনই হযরত জাবির (রা) বিশ্বনবীকে (সা) দাওয়াত দিতেন এবং তিনিও (সা) সন্তুষ্টচিত্তে তা কবুল করতেন। পরিখার যুদ্ধে তিনি যে ইখলাসের সাথে প্রিয় নবীকে (সা) দাওয়াত দিয়েছিলেন তার বিবরণ চরিতকাররা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। হুজুর (সা) একবার হযরত জাবিরের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। খাওয়ার পর তিনি তার ও তার স্ত্রীর ওপর দরূদ পড়লেন। অন্য আরেকবার হুজুর (সা) হযরত জাবিরের (রা) গৃহে তাশরীফ রাখলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি মোটাতাজা বকরীর বাচ্চা জবেহ করতে চাইলেন। হুজুর (সা) তা দেখে বললেন, বংশ এবং দুধ কেন বিচ্ছিন্ন করছো ? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এখনো বাচ্চা হলেও খুব মোটাতাজা। তারপর তা জবেহ করে গোশত পাকানো হলো এবং মহানবীকে (সা) খাবার খাইয়ে বিদায় দিলেন।

একদিন হুজুরের (সা) খিদমতে উন্নত ধরনের খেজুর পেশ করলেন। এই খেজুরের মধ্যে বিচি ছিলো না। হুজুর (সা) বললেন, আমি একে গোশত মনে করেছি। তৎক্ষণাৎ তিনি বাড়ি গেলেন এবং বকরী জবেহ করে স্ত্রীকে দিয়ে গোশত রান্না করিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করলেন।

একবার ঢালু স্থানে খেজুর নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে প্রিয় নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত হলো। হযরত জাবির (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে খেজুর পেশ করলেন। তিনি (সা) তা কবুল করলেন।

মুসনাদে আহমদে আছে যে, স্বয়ং বিশ্বনবীও (সা) কখনো কখনো স্নেহস্বরূপ হযরত জাবিরকে (রা) দাওয়াত করতেন এবং কোন সময় অন্য

www.bjilibrary.com

কোন স্থানে দাওয়াত হলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। একদিন মহানবী (সা) তাঁর হাত ধরে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন এবং পর্দা উঠিয়ে ঘরের লোকদেরকে ডাকলেন। ভেতর থেকে তিনটি রুটি এলো। সেই সাথে একটি পাত্রে সিরকা ছিল। হুজুর (সা) দেড়টি করে তিন রুটি ভাগ করলেন এবং বললেন, সিরকাও কি সুন্দর তরকারী, সিরকাও কি সুন্দর তরকারী। হযরত জাবির (রা) অত্যন্ত উৎসাহের সাথে খাবার খেলেন এবং সারা জীবন সিরকা অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

একবার রাসূলে আকরাম (সা) ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। হযরত জাবির (রা) একথা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন। সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে মহানবীর (সা) শুশ্রূষার জন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন।

জাতুর রাকা যুদ্ধে হুজুর (সা) হযরত জাবিরের (রা) নিকট থেকে উট কিনলেন এবং মূল্য ছাড়া কিছু অতিরিক্ত অংশও দিলেন। অতপর উটও উপহার স্বরূপ তাঁকে ফেরত দিয়ে দিলেন। হুজুর (সা) তাঁকে বখশিশ হিসেবে যে অংশ দিয়েছিলেন তা তিনি তাবাররুক মনে করে একটি থলিতে সংরক্ষণ করেন। বছরের পর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হিররার ঘটনার সময় সিরিয়াবাসী তার বাড়ির ওপর হামলা চালিয়ে অন্যান্য সামানের সাথে সেই থলিও নিয়ে যায়।

একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুজুর (সা) স্বয়ং শুশ্রূষার জন্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত জাবির (রা) তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হুজুর (সা) ওজু করে মুখের ওপর পানির ছিটা মারতেই জ্ঞান ফিরে এলো। সে সময় পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তান ছিল না। মাতা-পিতা ওফাত পেয়েছিলেন। ইসলামে এ ধরনের ব্যক্তিকে কালালাহ্ বলা হয়ে থাকে। মহানবীকে (সা) তাঁর মাথার কাছে বসা দেখে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মারা গেলে আমার ওয়ারিশ কে হবে ? আমি কি আমার মিরাছ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ বোনদেরকে দিয়ে দেব ? হুজুর (সা) বললেন, ঠিক আছে দিয়ে দাও। পুনরায় তিনি আরজ করলেন, যদি অর্ধেক দেই ? বললেন, দিতে পারো। একথা বলে মহানবী (সা) বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই ফিরে এসে বললেন, জাবির ! তুমি এই অসুস্থতায় মারা যাবে না। হাঁ, তোমার প্রশ্নের জবাব হিসেবে আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশ নাযিল হয়েছে ঃ

"(হে পয়গাম্বর) তোমার কাছে লোকেরা কালালাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে। তুমি বলে দাও যে, এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হলো, তোমরা বোনদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ দিতে পারো।"

একবার হুজুর (সা) তাঁকে বললেন, যদি বাহরাইন অঞ্চল থেকে সম্পদ আসে তাহলে আমি তোমাকে এতো এতো দেবো। কিন্তু সম্পদ আসার পূর্বেই মহানবীর (সা) ওফাত হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত -কালের প্রারম্ভে বাহরাইন থেকে সম্পদ এলে রাসূলের (সা) খলিফা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তির সাথে রাসূল (সা) কোন ওয়াদা করেছেন অথবা তাঁর (সা) দায়িত্বে কোন ঋণ রয়েছে ; সে যেন আমার নিকট আসে। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি হযরত আবু বকরের (রা) খিদমতে হাজির হলাম এবং তাঁকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, আমি তোমাকে এতো এতো দেবো। হযরত আবু বকর (রা) দু' হাত মিলিয়ে দিরহাম পূর্ণ করে আমাকে দিলেন। আমি তা গুণে দেখলাম পাঁচশ' দিরহাম। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, এও তোমার এবং তা থেকে দ্বিগুণ আরো নিয়ে নাও। (বুখারী)

বিশ্বনবীর (সা) প্রতি হযরত জাবিরের (রা) ভালোবাসা ও আস্থা এমন তুঙ্গে পৌছেছিল যে, তাঁর (সা) ইন্তিকালের পরও নিজের সকল কাজে হুজুরের (সা) বাণীসমূহ ও আমল সামনে রাখতেন। বরং কোন কোন সময় এমন সব কাজেও তাঁর (সা) আনুগত্য করতেন যাতে তাঁর (সা) আনুগত্য তার প্রতি ওয়াজিব নয়। একবার শুধু এক কাপড় পরিধান করে নামায পড়লেন। শিষ্যরা আরজ করলো, আপনার নিকট চাদরও ছিল। তা কেন গায়ে দিলেন না। তাহলে তো দু' কাপড় হয়ে যেত। তিনি বললেন, আমি একবার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। এখন আমি হুজুরের (সা) আনুগত্য এ জন্যে করেছি যে, তোমাদের মত বেওকুফ হুজুরের (সা) এই রুখসত কাজকে দেখে অভিযোগ উথাপন করতে পারো।

মহানবী (সা) একবার মসজিদে ফাতাহতে পরপর তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) দোয়া করেছিলেন। তৃতীয় দিন আল্লাহপাকের তরফ থেকে দোয়া কবুলের সুসংবাদ পেলেন। ফলে বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র চেহারা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। এ ঘটনা হযরত জাবিরের (রা) সামনে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং যখনই কোন মুশকিল সামনে আসতো তখনই মসজিদে ফাতাহতে গিয়ে দোয়া করতেন। আল্লাহ তায়ালা এই মুশকিল আসান করে দিতেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে এবং বিনয়ী ছিলেন। মুসলমানদের কল্যাণের আবেগ সবসময়ই অন্তরে প্রবহমান থাকতো। কারোর অসুস্থতার কথা শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন এবং শুশ্রূষার জন্যে তাশরীফ নিতেন। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ কোন সফর থেকে ফিরে এলে তার সাথেও আগেভাগে সাক্ষাত করতেন। মেহমানের আগমন ঘটলে ঘরে যা কিছু থাকতো তাই অত্যন্ত

www.bjilibrary.com

আনন্দচিত্তে তার সামনে পেশ করতেন এবং তাঁকে লৌকিকতা থেকে বাঁচার পরামর্শ দিতেন।

হক কথন প্রশ্নে এমন ছিলেন যে, কোন রকমের আপসকামীতা তাঁকে হক কথা বলা থেকে বিরত রাখতে পারতো না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী মদীনার গবর্ণর হয়ে এলো। এ সময় সে নামাযের সময়ে কিছু পরিবর্তন করতে চাইল। হযরত জাবির (রা) শুনে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায দ্বিপ্রহরের পর, আসর সূর্য পরিষ্কার ও আলোময় থাকা পর্যন্ত, মাগরিব সূর্য ডোবার পর এবং ফজর অন্ধকারের মধ্যে পড়তেন। এশার সময়ে মানুষের জন্যে অপেক্ষা করতেন। লোকজন যদি তাড়াতাড়ি এসে যেতো তাহলে তাড়াতাড়ি পড়ে নিতেন। তা না হলে দেরী করে পড়তেন। হাজ্জাজ তাঁর ফতওয়া শুনলো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করলো।

একবার এক ব্যক্তি (এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্র) নিজের বাগানের ফল তিন বছরের জন্যে বিক্রি করে দিলেন। হযরত জাবির (রা) তা জানতে পেরে কিছু লোক নিয়ে মসজিদে এলেন এবং সবার সামনে বর্ণনা করলেন যে, হুজুর (সা) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পেকে খাওয়ার উপযুক্ত না হয় ; ততক্ষণ তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়।

হযরত জাবিরের (রা) গৃহ মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে এসে পড়তেন। যত গরম বা প্রখর রোদ হোক না কেন তার কোন পরওয়া করতেন না। একবার মসজিদে নববীর নিকটে কয়েকটি বাড়ি খালি হলো। হযরত জাবির (রা) সেখানে চলে আসতে চাইলেন। কিন্তু হুজুর (সা) যখন বললেন যে, নামাযে আসার লক্ষ্যে প্রত্যেক কদমে সওয়াব হয়। এ জন্যে দূর থেকে আসায় বেশী সওয়াব হয়ে থাকে। ফলে তিনি তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মাইল দূর থেকে এসে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। এমনকি যখন চোখে দেখতে পেতেন না তখনো কারোর সাহায্য নিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে আসতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত নুমানুল আ'রাজ (রা) আনসারী

নুমান নাম। লকব হলো আ'রাজ। পা খোঁড়া হওয়ার কারণে এই লকব বা উপাধি ছিল। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

নু'মান বিন মালিক বিন ছা'লাবা বিন আহরাম (অথবা আছরাম) বিন ফাহর, বিন ছা'লাবা বিন গানামুল খাজরাজী।

ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন আম্মারাহ (র) বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধে তিনি বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধেও শরীক হন। কথিত আছে যে, ওহোদের দিন নিজের শাহাদাতের আকাংখা এমনিভাবে বর্ণনা করেন ঃ হে আল্লাহ ! তোমার কসম, সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে নিজের এই খোঁড়া পা নিয়ে সবুজ-শ্যামলিমা জান্নাতে চলা-ফিরা করতে চাই।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করলেন। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতে পৌছলেন।

বিশ্বনবী (সা) হযরত নু'মানের (রা) শাহাদাতের কথা শুনে বললেন ঃ "নু'মানুল আ'রাজ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তার ধারণা অনুযায়ী কাজ করেছেন। আমি নু'মানকে জান্নাতে চলা-ফেরা করতে দেখলাম এবং তার পায়ে ল্যাংরাপনা ছিল না।"

---

www.bjilibrary.com

হযরত বারা' (রা) বিন মা'রুর আনসারি

রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওরায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মদীনার আনসাররা অন্তর খুলে তাঁর (সা) সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু হুজুর (সা) তাদের মধ্যে একজন জাননিছার আনসারীকে দেখতে পেলেন না। এই আনসারী বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর (সা) বাইয়াত করেছিলেন এবং উচ্চস্বরে আল্লাহর কসম খেয়ে এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন যে, হুজুর (সা) মদীনা তাশরীফ নিলে সে নিজের জীবন ও সন্তান-সন্ততি সহ তাঁকে (সা) হেফাজত করবে। হুজুর (সা) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, তিনি এক মাস পূর্বে পরপারে যাত্রা করেছেন। বিশ্বনবী (সা) এই খবর শুনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি (সা) সাহাবীদেরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাঁর কবরে তাশরীফ রাখলেন এবং চার তাকবিরের সাথে জানাযার নামায পড়লেন। এই সৌভাগ্যবান রাসূলের (সা) সাহাবী (রা) যাঁর কবরে সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনাবিন বিশ্বনবী (সা) স্বয়ং তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং নিজের ২০জন সাহাবী সমেত তাঁর মাগফিরাত কামনা করেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত বারা' (রা) বিন মারুর আনসারী।

সাইয়েদেনা আবু বিশর বিন বারা' (রা) বিন মারুর-এর সম্পর্ক ছিল খাজরাজ খান্দানের 'বনু সালমাহ' গোত্রের সাথে। নসবনামা হলো ঃ বারা' বিন মারুর বিন ছাখার বিন সাবিক বিন সানান বিন উবায়েদ বিন আদি বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ বিন সায়াদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারওয়াহ বিন ইয়াযিদ বিন জাশম বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল রুবাব বিনতে নুমান। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল আওস হযরত সা'দ (রা) বিন মায়াজ-এর আপন ফুফু। হযরত বারা' (রা) বনু সালমার নেতা এবং কয়েকটি দুর্গের মালিক ছিলেন। ইমারত ও নেতৃত্বের সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাঁকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। নবুওয়াতের ১২ বছর পর হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের মদীনা মুনাওয়ারা আসেন এবং নিজের তাবলিগী প্রচেষ্টা দ্বারা যাঁদেরকে মুসলমান বানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন মারুরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মদীনার যে ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তি মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ; হযরত বারা' (রা) বিন মারুর তাদের মধ্যে শুধু শামিলই ছিলেন না বরং তিনি সে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) এবং ইবনে হিশাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের (রা)

www.bjilibrary.com

উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারীর এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন যে, আমরা স্ব কওমের মুশরিকদের সাথে হজ্জে রওয়ানা হয়ে গেলাম, আমাদের (মুসলমান) সাথে আমাদের বুজর্গ এবং সরদার বারা' (রা) বিন মারুরও ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বললেন, আমার একটি মত আছে। জানি না, তোমরা সেই মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে ; না দ্বিমত প্রকাশ করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, মতটা কি ? তিনি বললেন, আমার মত হলো, আমি কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ি এবং সেদিকে পিঠ না দিই। আমরা বললাম, আমরা তো জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার (বাইতুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকেন। আমরা তো তাঁর (সা) তরিকার খিলাফ কাজ করবো না। কিন্তু বারা' (রা) বিন মারুর কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়তে লাগলেন এবং আমরা তাকে এ কাজে বাধা দিতে লাগলাম। আমরা যখন মক্কা পৌঁছলাম তখন বারা' (রা) আমাকে বললেন ঃ

"ভ্রাতুষ্পুত্র, চলো রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হই এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, কা'বার দিকে মুখ করে আমার নামায পড়া জায়েজ না নাজায়েজ ? কেননা তোমাদের মতবিরোধের কারণে আমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।"

সুতরাং আমরা দু'জন মক্কার এক ব্যক্তির নিকট থেকে তাঁর (সা) ঠিকানা জেনে হেরেম শরীফ গেলাম। সেখানে তিনি (সা) নিজের চাচা আব্বাস (রা) সহ উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁকে সালাম করলাম। তিনি (স) আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই দু'জনকে চিনেন ? আব্বাস (রা) বাণিজ্য ব্যাপদেশে আমাদের এখানে আসতেন এবং আমাদেরকে চিনতেন। তিনি বললেন, হাঁ। ইনি হলেন বারা' (রা) বিন মারুর, আর ইনি হলেন কা'ব (রা) বিন মালিক। বারা' (রা) তাঁকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং সফর করে আমি এখানে এসেছি। আমার ধারণা হলো, আমি কা'বার দিকে পিঠ না দিয়ে বরং সেদিকে মুখ করে নামায পড়ি এবং আমি এভাবেই নামায পড়ে থাকি। কিন্তু আমার সঙ্গীরা এর বিরোধী। এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি ? বিশ্বনবী (সা) বললেন, "তুমি এক কিবলার ওপর নিশ্চয়ই রয়েছ। তবে, এখনো ধৈর্য ধরতে হবে। সুতরাং বারা' (রা) তাঁর (সা) আনুগত্যে বাইতুল মুকাদ্দাস এর দিকে মুখ করে নামায পড়তে লাগলেন।"

আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে বিশ্বনবী (সা) হযরত আব্বাসের (রা) সমভিব্যাহারে উকবা তাশরীফ আনলেন। এখানে মদীনার সকল হকপন্থী (মুশরিকদের) থেকে পৃথক হয়ে একত্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ মহানবী (সা) এবং আনসারদের মধ্যে আলোচনা হলো। সে সময় যখন আনসাররা বললেন যে,

www.bjilibrary.com

আপনি (সা) আপনার জন্যে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, তা নিয়ে নিন। তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ

"আমি তোমাদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি বা বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা আমাকে সেইভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকবে যেভাবে স্বয়ং নিজের পরিবার-পরিজনকে করে থাকো।"

ইমাম আমহদ (র) এবং ইমাম বায়হাকী (র) লিখেছেন, হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত বারা' (রা) বিন মারুর হুজুরের (সা) পবিত্র হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আরজ করলেন ঃ

"জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম ! যিনি আপনাকে হকের সাথে প্রেরণ করেছেন। আমরা আমাদের জীবন ও সন্তান-সন্তুতির মত আপনাকে হেফাজত করবো। হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের নিকট থেকে বাইয়াত নিন। আমরা যুদ্ধ অভিজ্ঞ মানুষ এবং তা নিজেদের বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।"

ওয়াকেদী এক বর্ণনায় সে সময়ে হযরত বারা' (রা) বিন মারুর-এর এই বাক্যাবলী উদ্বৃত করেছেন ঃ

"আমরা অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম ও লড়াই-এর শক্তি রাখি। আমাদের এই অবস্থা তখন ছিল যখন আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম। ভালো, এখন আমাদের অবস্থা কি হবে। এখনতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। এই হেদায়াত থেকে অন্যরা রয়েছে বঞ্চিত এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।"

ইবনে সায়াদ এক বর্ণনায় বাইয়াতে উকবার সময় হযরত বারা' (রা) বিন মারুরের প্রতি এই বাক্যাবলী আরোপ করেছেন ঃ

"হে আব্বাস, আমরা আপনার কথা শুনেছি (অর্থাৎ তোমরা খুব চিন্তা-ভাবনা করে নাও যে, সমগ্র আরবের বিরোধিতার মোকাবিলা করার শক্তি তোমাদের আছে কি না)। আল্লাহর কসম ! আমাদের অন্তরে অন্য কিছু থাকলে তা পরিষ্কার করে বলে দিতাম। কিন্তু আমরা তো রাসূলের (সা) সাথে সত্যিকার ওয়াদা পূরণ এবং তাঁর (সা) জন্যে জীবন দান করতে চাই।"

এই বর্ণনা থেকে হযরত বারা' (রা) বিন মারুরের নিষ্ঠা এবং ঈমানী আবেগের আন্দাজ করা যায়। এই আলোচনার পর মদীনার সকল হকপন্থী হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত হয়ে গেলেন। ইতিহাসে এই বাইয়াত উকবায়ে কবিরা অথবা লাইলাতুল উকবা নামে প্রসিদ্ধ।

বাইয়াতের পর হুজুর (সা) আনসারদেরকে বললেন, নিজেদের মধ্য থেকে ১২জন নকিব নির্বাচন করে দাও। এসব নকিব স্ব স্ব কবিলার দায়িত্বশীল

হবেন। সুতরাং আনসাররা ১২জন নকিব নির্বাচন করলেন। তাদের মধ্যে ৯জন ছিলেন খাজরাজি এবং ৩জন আওস-এর। খাজরাজের ৯জন নকিবের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত বারা' (রা) বিন মারুর। তাঁকে বনু সালমার নকিব নির্বাচিত করা হয়েছিল।

বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য মণ্ডিত হয়ে হযরত বারা' (রা) বিন মারুর মদীনা ফিরে এলেন এবং প্রতিদিন হুজুরের (সা) প্রতীক্ষায় অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটাতে লাগলেন। কিন্তু আফসোস ! এই দুনিয়ায় মহানবীর (সা) চেহারা মুবারক দেখার আর ভাগ্য হলো না। প্রিয়নবী (সা) হিজরতের এক মাস পূর্বে সফর মাসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বাঁচার আর যখন আশা রইলো না তখন ওসিয়ত করলেন যে, কবরে যেন তাকে কিবলামুখী রাখা হয় এবং যখন মহানবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনেন তখন তার সকল সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যেন তাঁর খিদমতে পেশ করা হয়। তারপর নিজের মুখ কিবলামুখী করলেন এবং সেই অবস্থাতেই মহান আল্লাহর নিকট নিজের জীবন সপে দিলেন।

বিশ্বনবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনার পর তাঁর কবরে গমন করলেন এবং তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করলেন। হযরত বারা'র (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করা হলো। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তার উত্তরাধিকারদের নিকট ফেরত দিয়ে দিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন মারুর বিশার (রা) নামক একজন পুত্র এবং সালাফাহ (রা) নাম্নী একজন মেয়ে রেখে যান। তাঁরা উভয়েই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন মারুর যদিও বিশ্বনবীর (সা) মদীনা হিজরতের আগেই ওফাত পেয়েছিলেন ; তবুও তিনি মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কেননা তিনি লাইলাতুল উকবাতে যে ঈমানী আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছিল নজিরবিহীন। চরিতকাররা তাঁকে মুত্তাকী, সম্মানী এবং ফকিহ এর লকবে স্মরণ করে থাকেন।

www.bjilibrary.com

হযরত বিশর বিন বারা' আনসারী (রা)

সাইয়েদেনা হযরত বিশর (রা) জালিলুল কদর সাহাবী হযরত বারা' (রা) বিন মারুরুল আনসারী আল-খাজরাজী আস সালমী আল-উকবান নকিব-এর পুত্র ছিলেন। নসবনামা হযরত বারা' (রা) বিন মারুর-এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বিশর (রা) মহানবীর (সা) হিজরতের এক বছর পূর্বে পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের সময় তাঁর সঙ্গে মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত বারা' (রা) রহমতে আলম (সা)-এর মদীনা শুভ পদার্পণের এক মাস পূর্বে ইনতিকাল করেছিলেন। তিনি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হুজুরের (সা) পক্ষে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত বিশর (রা) এই সম্পদ মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) তা গ্রহণ করে পুনরায় হযরত বিশরকে (রা) ফেরত দিয়ে দিলেন।

হযরত বিশর (রা) আনসারদের অন্যতম বাহাদুর যুবক ছিলেন। মহানবীর (সা) প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রিয় নবীও (সা) তাকে খুব স্নেহ করতেন। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত বারা' (রা) বিন মারুর-এর ওফাতের পর বনু সালমার এক মালদার ব্যক্তি জাদ বিন কায়েস তাদের সরদার হয়ে গেল। হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি বনু সালমার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমাদের সরদার কে? তারা আরজ করলেন, জাদ বিন কায়েস। হুজুর (সা) বললেন, তাকে তোমরা সরদার বানিয়েছ কেন? তারা আরজ করলো, শুধু মালদার হওয়ার কারণেই তাকে সরদার বানানো হয়েছে। সে একজন নিম্নশ্রেণীর বখিল। হুজুর (সা) বললেন, "ভালো, বখিলা থেকে বড় কোন রোগ আছে? সে তোমাদের সরদার হতে পারে না।"

বনু সালমার আনসাররা আরজ করলো, তাহলে আপনিই ইরশাদ করুন : আমাদের নেতা কে হবেন? তিনি বললেন, তোমাদের নেতা বা সরদার হলো বিশর (রা) বিন বারা' (রা) বিন মারুর। সুতরাং সেদিন থেকে হযরত বিশর (রা) বনু সালমার সরদার নির্ধারিত হলেন।

বাইয়াতে উকবার মর্যাদা লাভের পর হযরত বিশর (রা) বদরী সাহাবী হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধে

www.bjilibrary.com

বীরত্বমূলক খিদমত আঞ্জাম দেন। খায়বারের যুদ্ধেও বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর যয়নব বিনতে হারিছ নাম্নী একজন মহিলা মহানবীর (সা) সামনে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত রাখলো। সে সময় যত সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলকেই হুজুর (সা) তাতে শরীক করলেন এবং সর্বপ্রথম নিজেই খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু এক লোকমাহ মুখে দিয়েই হাত টেনে নিলেন এবং বললেন, এই খাবারে বিষ আছে। একথা শুনতেই সকল সাহাবী (রা) খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। ইত্যবসরে হযরত বিশর (রা) কয়েক লোকমা খেয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর বর্ণনা হলো, এই খাবারের স্বাদ তার নিকটও খারাব মনে হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাসূলে আকরামের (সা) সামনে খাবার উগড়ে ফেলাটা বেয়াদবী মনে করলেন। যার পরিণতিতে বিষক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ লিখেছেন যে, এক বছর অসুস্থ থাকার পর তিনি ওফাত পেয়েছিলেন।

যয়নব বিনতে হারিছের পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, হুজুর (সা) তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। এ সময় সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছিল। সে বলেছিল, এজন্যে সে খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিল যে, যদি তিনি পয়গম্বর হন তাহলে বিষ তাঁর ওপর ক্রিয়া করবে না। আর যদি তিনি পয়গম্বর না হন তাহলে তারা তার থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। এখন সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি সত্যিকার পয়গম্বর। অতপর সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো। হুজুর (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হুজুর (সা) তাকে হযরত বিশরের (রা) কিসাসে হত্যা করিয়েছিলেন।

তৃতীয় বর্ণনা হলো, হুজুর (সা) যয়নবকে হযরত বিশরের (রা) উত্তরাধিকারদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস সাওয়াব (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)। হযরত বিশর (রা) জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আওস (রা) বিন ছাবিত আনসারী

খাজরাজের "বনু নাজ্জার" খান্দানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আওস (রা) বিন ছাবিত বিন মানযির বিন হারাম বিন আমর বিন যায়েদ বিন মানাত বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন খাজরাজ।

হযরত আওস (রা) রাসূলের (সা) কবি হাসসান (রা) বিন ছাবিতের বৈপিত্রীয় ভাই ছিলেন। তাঁর দাদারা কবিলার সরদার পরিগণিত হতেন। হযরত আওস (রা) মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ঈমান আনার সৌভাগ্য এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের মওসুমে মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় শরীক হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। এই ব্যাপারে তিনি নিজের শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিত-এর চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

রহমতে দো আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ এবং কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। এ সময় আওসকে (রা) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) দ্বীনি ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে হযরত ওসমান (রা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এসেছিলেন। তখন হযরত আওসই (রা) তাঁকে নিজের মেহমান বানিয়েছিলেন।

হযরত আওস (রা) একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন এবং তিনি নিজের জীবন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি বদরের যুদ্ধে জীবন উৎসর্গের নমুনা প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

www.bjilibrary.com

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক আনসারী

রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াছরাবে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় খেজুর বৃক্ষে ঘেরা এই পুরাতন শহরে নব বসন্তের আবির্ভাব ঘটলো। শহরটি ইয়াছরাব থেকে "মদীনাতুন নবী" শহরে পরিবর্তিত হলো। তার অলি-গলি নবুওয়াতের আলোয় ঝল-মলিয়ে উঠলো। প্রতিটি আনাচে-কানাচে রিসালাতের সুবাসে সুরভিত হয়ে গেল। সে যুগেরই কথা, একদিন মদীনা মুনাওয়ারার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর সাথে ছিল ৯-১০ বছরের একটি সুদর্শন কিশোর। কিশোরটির কপাল সৌভাগ্যের বিভায় আলোকজ্জল ছিল। মহিলাটি অত্যন্ত আদবের সাথে হুজুর (সা)-কে সালাম করলেন। তারপর সেই কিশোরের হাত ধরে এভাবে আরম্ভ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ হলো আমার কলিজার টুকরা। তাকে আপনার কাছে অর্পণ করলাম। তাকে আপনি গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমত করবে।"

বিশ্বনবী (সা) মহিলার নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের প্রশংসা করলেন। কিশোরটির মাথায় হাত দিয়ে স্নেহের পরশ বুলালেন। তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন। অতপর মহিলাটির আকাংখা অনুযায়ী কিশোরটিকে নিজের রহমতের ছায়ায় স্থান দিলেন।

মদীনা ভূমির এই সৌভাগ্যবান কিশোর ও ন'/দশ বছর বয়সে সে সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত সাইয়েদুল মুরসালিন সাহিবে কাবা কাওসাইন (সা)-এর খাদিম হওয়ার মহান মর্যদা লাভ করেছিল এবং যে ব্যক্তি হুজুর পুরনূর (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত মন ও অন্তর দিয়ে তাঁর (সা) খিদমতের হক আদায় অব্যাহত রেখেছিলেন ; তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা) বিন মালিক আনসারী।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক সেই সকল মহান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। তাঁর কুনিয়ত আবু হামযাহ এবং আবু ছুমামাহ উভয়ই ছিল। লকব ছিল "খাদিমে রাসূলুল্লাহ।" তিনি খাজরাজের সম্ভ্রান্ততম খান্দান "বনু নাজ্জারের" সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

www.bjilibrary.com

আনাস (রা) বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন জামজাম বিন জায়েদ বিন হারাম বিন জুন্দুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন আন-নাজ্জার।

হযরত আনাস (রা)-এর মাতার নাম ছিল উম্মে সুলাইম (রা)। তিনি মহান মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের দু'-তিন বছর পূর্বে হযরত আনাসের (রা) বয়স যখন ৭-৮ বছর ; তখনই মদীনায় ইসলামের চর্চা এবং বিস্তার ঘটতে থাকে। তাঁর নেক স্বভাব মা নির্দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাথেই হযরত আনাসের (রা) চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নজর, খালা হযরত উম্মে হারাম (রা) এবং মামা হযরত হারাম (রা) বিন মিলহানও মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) নিজের শিশু পুত্র আনাসকেও (রা) নিজের রঙে রঞ্জিত করতে চাইলেন। তিনি তাকে কালেমা পড়াতেন এবং ইসলামী শিষ্টাচার শিখাতেন। দুর্ভাগ্য বশত হযরত আনাসের (রা) পিতা মালিক বিন নজর শুধুমাত্র পৈত্রিক ধর্মের ওপরই অটল রইলেন না বরং হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) ইসলাম গ্রহণেও খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে নিজের পুত্র আনাসকে (রা) কালেমা পড়াতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ইসলামের নেশাতো এমন ছিল না যে ভয়-ভীতি বা উৎসাহের মাধ্যমে তা দূর করা যেতে পারে। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামের ওপর কায়েম রইলেন এবং শিশু আনাসকেও (রা) সেই রাস্তায় চালাতে লাগলেন। ফল এই দাঁড়ালো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হলো। মালিক বিন নজর নারাজ হয়ে মদীনা থেকে সিরিয়া চলে গেলেন এবং সেখানেই মারা গেলেন। (এক বর্ণনা অনুযায়ী কোন শত্রু তাঁকে হত্যা করে।) এটা ছিল বাইয়াতে উকবায়ে উলার পূর্বেকার ঘটনা। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বিধবা হয়ে গেলেন এবং তাঁর শিশু পুত্র হয়ে গেল ইয়াতিম। কিছুদিন পর চারদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে লাগলো। কিন্তু তিনি প্রত্যেক পয়গাম বা প্রস্তাবের জবাবে একই কথা বললেন যে, যতদিন পর্যন্ত আনাস (রা) মজলিসসমূহে উঠা-বসা এবং আলোচনা করার যোগ্য না হবে ততদিন পর্যন্ত আমি কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

হযরত আনাসের (রা) বয়স প্রায় ৯ বছর ছিল। এ সময় তার কবিলার আবু তালহা (রা) নামের এক ব্যক্তি হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আবু তালহা (রা) সে সময় মুশরিক ছিলেন এবং কাষ্ঠ নির্মিত একটি মূর্তির পূজা করতো। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) জবাবে বলে পাঠালেন যে, আমি এক আল্লাহ এবং তার সত্য রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং তুমি হলে একজন স্বনির্মিত কাঠের মূর্তির পূজারী। এই মূর্তি কারোর কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। এই অবস্থায় জীবন সফরে তুমি আমার সঙ্গী কি করে হতে পারো?

www.bjilibrary.com

আবু তালহা (রা) হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) কথাগুলো ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলেন। কথাগুলো তাঁর নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। কিছুদিন পর তিনি হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) নিকট এলেন এবং বললেন, আমার ওপর হক পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আমি তোমার দ্বীন কবুল করতে প্রস্তুত।

হযরত আবু তালহার (রা) কথা শুনে হযরত উম্মে সুলাইম (রা) খুব খুশী হলেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে বললেন ঃ

"অতপর তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমার আর কোন আপত্তি নেই। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, এইটেই আমার মহরানা।"

হযরত আবু তালহা (রা) কোন চিন্তা-ভাবনা না করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইবনে সায়াদ এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আনাস (রা) নিজের মায়ের বিয়ে হযরত আবু তালহার (রা) সাথে পড়িয়েছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী বলতেন, আমি কোন মহিলার মহর উম্মে সুলাইমের (রা) মহর থেকে ভালো শুনিনি। আবু তালহার (রা) সাথে বিয়ের পর হযরত উম্মে সুলাইম (রা) হযরত আনাসকে (রা) তাঁর বাড়িতেই নিয়ে গেলেন এবং হযরত আনাস (রা) সেখানেই বড় হতে লাগলেন।

বিশ্বনবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পা রাখলেন। এ সময় যাঁরা তাঁকে সুস্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আনাসের (রা) পিতা-মাতাও ছিলেন। হযরত আনাসও (রা) অন্যান্য বালকের সাথে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাইতে লাগলেন جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ [রাসূল (সা) তাশরীফ এনেছেন, রাসূল (সা) তাশরীফ এনেছেন]। তাঁরা শহরময় আনন্দ উল্লাস করে ঘুরে বেড়ালেন। এই আনন্দপূর্ণ দিনটি সারা জীবন তাঁর স্মরণে ছিল। তিনি বলতেন আমি ঐদিন থেকে বেশী মুবারক ও আনন্দপূর্ণ দিন আর দেখিনি যেদিন প্রিয়নবী (সা) মদীনায় শুভাগমন করেছিলেন। সেদিন মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলি আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পর হযরত উম্মে সুলাইম (রা) নিজের কলিজার টুকরাকে হুজুরের (সা) খাদেম বানিয়ে দিয়েছিলেন। এক রাওয়ায়েতে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আনাসকে (রা) স্বামী হযরত আবু তালহার (রা) সাথে মহানবী (সা) নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কোন খাদেম নেই। আনাস (রা) একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং হুশিয়ার ছেলে। তাকে আপনার খিদমতের জন্য এনেছি। হুজুর (সা) হযরত আবু তালহার (রা) নিষ্ঠাপূর্ণ

www.bjilibrary.com

আবেগ দেখে হযরত আনাসকে (রা) নিজের খিদমতের জন্য গ্রহণ করলেন। দিনটি—হযরত আনাসের (রা) জীবনের সবচেয়ে বড় "সৌভাগ্যের দিন" ছিল। এই দিন তাঁর জীবনের সেই পবিত্র অধ্যায়ের সূচনা করেছিল ; যা তাঁর অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও মহান সাহাবীদের কাতারে এনে শামিল করেছিলেন। তিনি ১০ বছর পর্যন্ত সার্বক্ষণিক অব্যাহতভাবে রহমতে দো আলম ফখরে মওজুদাত সাইয়্যেদুল মুরসালিনকে (সা) জান-প্রাণ দিয়ে খিদমত করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে প্রিয় নবীর (সা) স্নেহদৃষ্টি তাঁর উপর ঝমঝম করে বর্ষিত হয়েছিল।

হযরত আনাস (রা) নিজের মালিক ও মাওলার (সা) সম্মতি অনুযায়ী সময়কে এভাবে সাজিয়ে দিলেন ঃ ফজরের পূর্বে মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হতেন এবং দ্বিপ্রহরে সামান্য সময়ের জন্য নিজের বাড়ী ফিরে যেতেন। মধ্যাহ্নে দ্বিতীয়বার প্রিয় নবীর (সা) কাছে উপস্থিত হতেন এবং আসর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন। আসরের নামায আদায় করে বাড়ী ফিরে আসতেন। কোন কোন সময় সারা রাত মহানবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত থাকতেন।

মহানবীর (সা) বিশেষ খাদেম হওয়ার কারণে হযরত আনাস (রা) হুজুরকে (সা) একদম কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং নিজের কর্মক্ষমতা ও আনুগত্য দিয়ে তাঁকে (সা) সন্তুষ্ট করার প্রশ্নে সামান্যতম কার্পণ্যও করেননি। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি দশ বছর আমার আকা ও মাওলার (সা) খিদমত করেছি। কিন্তু হুজুর (সা) আমার ওপর কোন সময় অসন্তুষ্ট হননি এবং কোন সময় আমার ওপর ডাঁট ও দাপটও দেখাননি। এমনকি কোন সময় এমন কথাও বলেননি যে, অমুক কাজ কেন করেছ বা অমুক কাজ কেন করোনি।

বাইহাকী (র) "শুয়ুবুল ঈমানে" তাঁর কথা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন ঃ "যদি কোন সময় আমার দ্বারা কোন ক্ষতিও হয়ে যেত, তাতেও তিনি আমাকে কোন সময় গালি দিতেন না। বাড়ীর অন্য কেউ যদি কোন সময় কিছু বলতো তাহলে তিনি (সা) বলতেন ঃ রাখ, কিছু বলো না। তকদিরে যদি ক্ষতি না থাকতো তাহলে এটা হতো না।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার হযরত আনাস (রা) প্রিয় নবীর (সা) কাজ শেষ করে নিজের বাড়ী রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে একস্থানে ছেলেরা খেলা করছিল। হযরত আনাস (রা) সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খেলা দেখতে লাগলেন। ইত্যবসরে বিশ্বনবী (সা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (সা) তাঁকে কোন কাজের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বালকদের খেলাধূলায় মশগুল হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত

www.bjilibrary.com

হওয়ার পর মহানবী (সা) তাঁর অনুসন্ধানে বাইরে তাশরীফ আনলেন। বালকেরা দূর থেকে হুজুরকে (সা) দেখলেন। এ সময় হযরত আনাসকে (রা) বললো, রাসূলুল্লাহ (সা) আসছেন। হযরত আনাস (রা) ঘাবড়ে গিয়ে পালানোর পরিবর্তে আদবের সাথে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হুজুর (সা) নিকটে এসে তাঁর হাত ধরলেন এবং কোন কাজে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আনাস (রা) যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাজ শেষ করে ফিরে না এলেন, হুজুর (সা) এক প্রাচীরের ছায়ায় বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই কাজ শেষ করতে তাঁর অনেক দেরী হয়ে গেল। বাড়ী পৌঁছলে মা হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, প্রিয় নবীর (সা) এক কাজে ব্যস্ততার জন্য দেরী হয়ে গেছে। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কাজটা কি ছিল। হযরত আনাস (রা) জবাব দিলেন, হুজুর (সা) এ ব্যাপারে কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম বললেন, পুত্র ! একথা কাউকে বলবে না, বস্তুত হযরত আনাস (রা) একথা আমৃত্যু নিজের অন্তরের অন্তস্থলে হেফাজত বা আমানত রেখেছিলেন এবং মহানবী (সা) তাঁকে কোন্ কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন তা কখনো কাউকে বলেননি।

হযরত আনাসের (রা) অধিকাংশ সময়ই এই সৌভাগ্য ঘটতো যে, তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে প্রিয় নবীর (সা) ওজুর সরঞ্জাম কাছে এনে দিতেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) যদি কোন কিছু মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করতে চাইতেন, তাহলে প্রায় সময়ই হযরত আনাসের (রা) হাতেই প্রেরণ করতেন। একবার হযরত আবু তালহা (রা) বাড়ীতে এলেন এবং হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেন, বিশ্বনবী (সা) অভুক্ত রয়েছেন। কিছু খাদ্য তাঁর (সা) খিদমতে পাঠিয়ে দাও। তিনি কয়েকটি রুটি হযরত আনাসকে (রা) দিলেন এবং বললেন, এক্ষণি গিয়ে হুজুরকে (সা) খাইয়ে দাও। হযরত আনাস (রা) যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছলেন তখন সেখানে হুজুরের (সা) চারপাশে সাহাবীদের ভিড় লেগেছিল। প্রিয় নবী (সা) হযরত আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে ?" তিনি আরজ করলেন, "জ্বী, আল্লাহর রাসূল।" অতপর জিজ্ঞেস করলেন, "খাওয়ার জন্য ?" তিনি বললেন, "জ্বী, হাঁ।"

হুজুর (সা) উপস্থিত সকল সাহাবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত আনাসের (রা) বাড়ী তাশরীফ রাখলেন। হযরত আবু তালহা (রা) চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন এত মানুষের জন্য খাবারে কুলোবে না। হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেন, এসব সাহাবীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা কি করে হবে। তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে বললেন, এটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) ভালো বোঝেন। অতপর যতটুকুন খাবার ছিল তা তিনি রাসূলে আকরাম

www.bjilibrary.com

(সা) ও সাহাবীদের সামনে হাজির করলেন। আল্লাহ পাক এই খাবারে এত বরকত দিলেন যে, সবাই পেট পুরে খেলেন।

একদিন হযরত আনাস (রা) নিয়ম অনুসারে ফজরের নামাযের পূর্বে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বললেন, আজ আমি রোযা রাখতে চাই। কিছু খাইয়ে দাও। হযরত আনাস (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু খেজুর ও পানিসহ উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) সেহরী খেলেন এবং অতপর ফজরের নামাযের জন্য প্রস্তুত হলেন।

হযরত আনাস (রা) যেমন মহানবীকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন তেমিন প্রিয় নবীও (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যে সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমত করতে এসেছিলেন সে সময় তাঁর কোন পারিবারিক নাম বা ডাকনাম ছিল না। প্রিয় নবী (সা) জানতে পেলেন যে, আনাস (রা) "হামযাহ" নামক এক ধরনের সবজী খুব পসন্দ করে থাকেন। এজন্য তিনি (সা) তাঁর ডাকনামই "আবু হামযাহ" রেখে দিলেন। বিশ্বনবী (সা) হযরত আনাসকে (রা) স্নেহ করে "বেটা" অথবা "আনিস" বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই স্নেহাধিক্যে তাঁর মাথার ওপর নিজের স্নেহের হাত বুলাতেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা) তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে তাঁকে নেক কথা শুনাতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, হে আমার ছোট শিশু ! যতদূর সম্ভব নিজের দিন ও রাত এমনভাবে কাটাও যে, তোমার অন্তরে যেন কপটতা না আসে। এটা আমার সুন্নাত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

হুজুর (সা) কখনো কখনো হযরত আনাসের (রা) সাথে হাসি-ঠাট্টামূলক কথাও বলতেন। একবার কৌতুক করে বললেন, "হে দুই কান ওয়ালা।"

আল্লামা বালাযুরী "আনসাবুল আশরাফে" লিখেছেন, হযরত আনাসের (রা) পিতা মালিক বিন নজর-এর মিষ্টি পানির কূপ ছিল। হুজুর (সা) তার পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রা) প্রায়ই সেই কূপের পানি মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করতনে।

হযরত আনাসের (রা) সতালো পিতা হযরত আবু তালহা (রা) প্রিয় নবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস ও জাননিছার সাহাবী ছিলেন। এমনিভাবে তাঁর মা হযরত উম্মে সুলাইমও (রা) প্রিয় নবীকে (সা) পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। তিনি হুজুরের (সা) পরদাদী সালমার ভাইয়ের পুতি ছিলেন। এই নিসবতে তিনি ও তাঁর বোন হযরত উম্মে হারাম (রা) মহানবীর (সা)

www.bjilibrary.com

খালা হিসেবে মশহুর হয়ে যান। যদিও এই সম্পর্ক দূরের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিশ্বনবীর (সা) নিকট ছিল তা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি (সা) স্নেহবশত হযরত উম্মে সুলাইম (রা) এবং হযরত উম্মে হারাম (রা) উভয়ের বাড়ীতেই গমন করতেন। হিজরতের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) বাড়ীতেই মুহাজির এবং আনসারদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী (সা) প্রায়ই হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) বাড়ী তাশরীফ নিতেন। খেজুর অথবা যে কোন খাবার পেতেন তা খেতেন। দুপুরের সময় হলে আরাম করতেন। নামাযের সময় হলে সেখানেই চাটাই-এর ওপর নামায আদায় করতেন। মহানবীর (সা) প্রতি হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) ভালোবাসার প্রকৃতিটা এমন ছিল যে, তিনি (সা) যখন তাঁর গৃহে আরাম করতেন তখন সে তাঁর গায়ের পবিত্র ঘাম ও পড়ে যাওয়া পবিত্র গোফ একটি শিশিতে তাবাররক হিসেবে একত্র করতেন। মুসনাদে আবু দাউদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার মাথায় চুলের গোছা ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মা বলেন, আমি তা (কখনো) কাটবো না, (অথবা কাটতে দিব না) কেননা প্রিয় নবী (সা) (ভালোবেসে) তা টানতেন এবং হাত বুলাতেন।

একবার প্রিয় নবী (সা) হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পুত্র আনাসের জন্য দোয়া করুন। হুজুর (সা) দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন এবং শেষে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَه وَوَلَدَه وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ـ

"হে আল্লাহ্ ! তুমি তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং তাকে জান্নাতে দাখিল কর।"

এই দোয়া কবুল হয়েছিল। হযরত আনাস (রা) ধন-সম্পদে সকল আনসারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান আধিক্যের ব্যাপারটা এমন ছিল যে, মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনীর সংখ্যা একশ'র ওপর ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে হক-বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত আনাসের (রা) বয়স ছিল ১২ বছর। কম বয়স হওয়ার কারণে যুদ্ধে যোদগানের যোগ্য ছিলেন না। কেননা মহানবী (সা) যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বয়স সীমা কমপক্ষে ১৫ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বদরের ময়দানে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বদরে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে

সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। তাদের সন্দেহের কারণ হলো সে সময় তাঁর বয়স ১৫ বছরের কম ছিল। কিন্তু একবার যখন স্বয়ং তাঁর কাছে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন, বদরে আমি কি করে অনুপস্থিত থাকতে পারতাম ? বস্তুত বদরের যুদ্ধের কতিপয় ঘটনা তাঁর থেকে বর্ণিত রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময়ও হযরত আনাসের (রা) বয়স যুদ্ধের যোগ্য হয়নি। কিন্তু এবারও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি এই যুদ্ধের চোখে দেখা ঘটনাবলী মানুষকে শুনাতেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার চাচা, যাঁর নামও আমার মত আনাস [অর্থাৎ আনাস (রা) বিন নযর] ছিল। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি। এ ব্যাপারে তিনি একবার মহানবীর (সা) খিদমতে আরজ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে আপনি অংশ নিয়েছেন ; তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু এখন যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ আপনার সাথে বাধে তাহলে আল্লাহ পাক জানবেন যে, আমি কি করি। অতপর যখন ওহোদের যুদ্ধের সময় এলো এবং মুসলমানদের পরাজয় ঘটলো তখন আমার চাচা আনাস (রা) এই দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এই ময়দান থেকে হটে যাওয়া মুসলমানদের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং বিরোধী মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ও সীমালংঘন প্রশ্নে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করছি।"—একথা বলে তিনি মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হলেন। সামনে পেলেন সাহাবী হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজকে। তিনি তাঁকে বললেন, হে সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ! এখনতো জান্নাত লাভের সুযোগ এসেছে। আল্লাহর কসম ! আমিতো ওহোদের দিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। (একথা বলে তরবারী চালাতে চালাতে কাফের বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।) আমরা তাঁর শরীরে ৮০টিরও বেশী জখম পেয়েছিলাম। এসব আঘাত তরবারী, নেযা ও তীর দিয়ে করা হয়েছিল। শত্রুরা তাঁর কান, নাক ইত্যাদি কেটে নিয়েছিল। আমরা তো তাঁকে চিনতেই পারিনি। তাঁর সহোদরা [রুবাই (রা) বিনতে নযর] তাঁর আঙ্গুলের একটি গিরা দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেন, ওহোদের দিন যখন মুসলমানরা এদিক-ওদিক বিশৃংখল হতে লাগলো তখন শুধুমাত্র হযরত আবু তালহা (রা) নিজের ঢাল দিয়ে মহানবীকে (সা) রক্ষা করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তাঁর ধনুকের ছিলা ছিল অত্যন্ত শক্ত। সেদিন দুই অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। যখন হুজুর (সা) পবিত্র মাথা উঁচু করে দুশমনদের প্রতি তাকাচ্ছিলেন তখন আবু তালহা (রা) আরজ করেছিলেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। মাথা

www.bjilibrary.com

ওপরে ওঠাবেন না। যদি কোন তীর এসে লাগে। আমার সিনা আপনার সিনার আগে রয়েছে। সে সময় আমি দেখলাম যে, হযরত আয়েশা (রা) এবং উম্মে সুলাইম (রা) মশক ভরে পানি আনছেন। তাঁদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল। তাঁরা আহতদের মুখে পানির ছিটকা দিচ্ছিলেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আরো এনে আহতদের মুখে দিচ্ছিলেন।

ওহোদের পর হযরত আনাস (রা) পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের এবং অব্যবহিত পরই বনু কোরায়জার যুদ্ধে মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া নামকস্থানে বাইয়াতে রিদওয়ানের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এ সময় যেসব সাহাবী (রা) বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র হাতে হাত রেখে মরা ও মারার বাইয়াত করেছিলেন ; তাদেরকে আল্লাহ্ পাক প্রকাশ্য ভাষায় তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হযরত আনাসও (রা) এসব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন।

বাইয়াতে রিদওয়ানের পর হযরত আনাস (রা) খায়বারের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। মুসনাদে আবু দাউদে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি খায়বারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহকে (সা) একটি গাধার ওপর সওয়ার দেখলাম। গাধাটির বাগ খেজুরের ছাল দিয়ে বানানো হয়েছিল। এই রেওয়ায়াতেই তিনি বলেন, প্রিয় নবী (সা) গাধার ওপরও সওয়ার হয়ে যেতেন। পশমের তৈরী কাপড়ও পরিধান করতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, বিজয়ের পর (খায়বরে প্রবেশের সময়) হযরত আনাস (রা) হযরত আবু তালহার (রা) সাথে উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। তাদের উট এবং প্রিয় নবীর (সা) সওয়ারী এত নিকটবর্তী ছিল যে, তাদের পা হুজুরের (সা) পবিত্র পা স্পর্শ করে গেল। তাড়াতাড়ী নিজেরা পা পিছু হটিয়ে নিলেন। এ সময় পা প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র ইযারের সাথে জড়িয়ে গেল। ফলে ইযার মুবারকে টান পড়ায় মহানবীর (সা) পবিত্র উরুর একাংশ মানুষের নজরে পড়ে গেল। সাধারণ অবস্থায় হুজুর (সা) নিজের পবিত্র উরু কাপড়হীন হয়ে যাওয়াটা কোনক্রমেই সহ্য করতেন না। কিন্তু এ সময় তিনি ক্ষমা করে দিলেন এবং হযরত আনাসকে (রা) কিছুই বললেন না।

সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) ওমরাহ কাযা করার জন্য মক্কা তাশরীফ নিলেন। এ সময় যেসব জাননিছার তাঁর সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আনাসও (রা) ছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন।

www.bjilibrary.com

অতপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। নবম হিজরীতে হযরত আনাস (রা) হুজুরের (সা) সাথে গা ঝলসে দেয়া আগুন ঝরা গরমে তাবুকের দীর্ঘ সফরের পীড়াদায়ক মারাত্মক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তারপর দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আনাসের (রা) ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তিরমিযী শরীফে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, যেদিন মহানবী (সা) মদীনা প্রবেশ করেছিলেন সেদিন সমগ্র মদীনা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল এবং যেদিন তাঁর ওফাত হয়েছিল সেদিন মদীনা অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল।

স্নেহপরায়ন আকা ও মাওলার (সা) বিচ্ছেদ শোকের পাহাড় হযরত আনাস (রা) অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে বরদাশত করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে হযরত আনাস (রা) নিশ্চিন্তে রাসূলের (সা) খলিফার বাইয়াত করেন। সে সময় তাঁর বয়স কেবলমাত্র ২০ বছর হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর যাবৎ মহানবীর (সা) অব্যাহত সাহচর্যে তাঁকে প্রভুত যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলেছিল। সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) পরামর্শে তাঁকে বাহরাইনের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আনাস (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে মুরতাদ বিরোধী কয়েকটি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। এই সিলসিলার সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ামামা ময়দানে মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে হযরত আনাসের (রা) ভাই হযরত বারা (রা) বিন মালিক অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন কারণে এটা স্পষ্ট হয় যে, হযরত আনাসও (রা) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে হযরত আনাসের (রা) এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত বারা (রা) মুসায়লামার যুদ্ধের দিন বাগান ওয়ালাদের ওপর (অর্থাৎ মুরতাদদের ওপর যারা বাগানের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরে মোচা তৈরী করে রেখেছিলেন) একাকী তীর নিক্ষেপ এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। ফলে তারা বাগানের দরযা খুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সে সময় তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর ৮০টি আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। তাঁকে সেখানে চিকিৎসার লক্ষ্যে নিজের তাঁবুতে পাঠানো হয়েছিল এবং তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে সেখানে এক মাস অবস্থান করতে হয়েছিল।

ত্রয়োদশ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এ সময় জিহাদের জযবা হযরত আনাসকে (রা) অস্থির করে তুলেছিল। তিনি আমীরুল মু'মিনিনের (রা) অনুমতি নিয়ে ইরানের যুদ্ধ ময়দানে পৌছে গেলেন এবং ফারুকী যুগের অনেক যুদ্ধে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা

www.bjilibrary.com

দেখিয়েছিলেন। তাঁর জানবাজ ভাই হযরত বারা'কে (রা) বিন মালিকও এসব যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলেন। আল্লামা বালাজুরি (র) "আনসাবুল আশরাফ" গ্রন্থে লিখেছেন, সেই যুগে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আনাস ও বারা' (রা) বসরাতে হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রা) সাথে হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শুবার বিরুদ্ধে হযরত আবু বাকরাহ (রা) উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তের জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক হারিক যুদ্ধ এবং সুস্তার (তিস্তার) বিজয় প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) ও হযরত বারা'র (রা) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিবরানী (র) এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা) বিন মালিক এবং তাঁর সহোদর বারা' (রা) বিন মালিক ইরাকের হারিক নামক স্থানে দুশমনের এক দুর্গ অবরোধে শরীক ছিলেন। দুশমনেরা গরম জিঞ্জিরে লোহার আংটা লাগিয়ে মুসলমানদের দিকে নিক্ষেপ করতো। এ সময় যে মুসলমান দুর্গের প্রাচীরের নিকট থাকতো তাকে ওপরে টেনে নিতো। এক সময় হযরত আনাস (রা) প্রাচীরের নিকটে গিয়েছিলেন অথবা প্রাচীরের ওপর ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। তখন তিনিও দুশমনের আংটায় ফেঁসে গিয়েছিলেন। তারা তাঁকে ওপরে টেনেই নিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত বারা'র (রা) দৃষ্টি পড়লো সেদিকে। তিনি লাফ দিয়ে সেদিকে গেলেন এবং জিঞ্জিরকে এমন জোরে টান মারলেন যে, ওপরের রশি ছিঁড়ে গেল এবং হযরত আনাস (রা) মাটির ওপর এসে পড়লেন। গরম জিঞ্জির টান দেয়ার কারণে হযরত বারা'র (রা) হাতের সকল গোশত জ্বলে গেল এবং হাড় বের হয়ে পড়লো। যেহেতু হযরত আনাস (রা) বেশী উঁচু থেকে পড়েননি ; এ জন্যে সাধারণ আঘাত পেয়েছিলেন।

সুস্তার যুদ্ধে হযরত আনাস (রা) পদাতিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন এবং হযরত বারা' (রা) ছিলেন দক্ষিণ বাহুর অফিসার। সুস্তার অবরোধ দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। এ সময় ইরানীদের সাথে মুসলমানদের কয়েক দফা সংঘর্ষ বাধে। এসব সংঘর্ষে হযরত আনাস (রা) এবং হযরত বারা' (রা) চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকবারই ইরানীদেরকে দুর্গে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। অবরোধকালে একদিন হযরত আনাস (রা) হযরত বারা'র (রা) তাঁবুতে গেলেন। এ সময় তিনি সূর করে কিছু কবিতা পাঠ করছিলেন। হযরত আনাস (রা) তাঁকে বললেন, ভাই আমার ! আল্লাহ পাক আপনাকে কুরআন শরীফ দান করেছেন। কুরআন শরীফ এসব কবিতা থেকে উত্তম। তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করুন। তিনি বললেন, আনাস (রা) ! সম্ভবত তুমি ভয় পাচ্ছো যে, আমি বিছানাতেই মারা যাব। কিন্তু আল্লাহর কসম ! এমনতরো হবে না। আমি মরলে ময়দানেই মরবো।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ পাক হযরত বারা'র (রা) কসম এমনিভাবে পূরণ করলেন যে, তিনি সেই যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে ইরানী সিপাহসালার হুরমুযানের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। যাহোক, হযরত বারা' (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদদের জীবনের বিনিময়ে ইরানীদের অপমানজনক পরাজয় ঘটলো এবং হুরমুযান নিজের পরিবার-পরিজনসহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। তাকে ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার হযরত আবু মূসা আশয়ারীর (রা) সামনে পেশ করা হলো। এ সময় তিনি তাকে হযরত আনাসের (রা) সাথে খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করলেন। এই সফরে হুরমুযানের হিফাজতের জন্য তিনশ' সওয়ার হযরত আনাসের (রা) অধীন ছিল। হযরত আনাস (রা) হিফাজতের সাথে হুরমুজানকে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে দিলেন। হুরমুযান মদীনা পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আনাস (রা) শুধুমাত্র যুদ্ধের ময়দানেই বাঘ ছিলেন না, বরং তিনি জ্ঞানের আকাশেরও চাঁদ ছিলেন। বসরা আবাদ হওয়ার কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুক (রা) অনুভব করলেন যে, সেখানকার মানুষের ফিকাহর তালিমের জন্য কিছু মুয়াল্লিম আবশ্যক। এই লক্ষ্যে তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্য থেকে একটি দল নির্বাচন করলেন। এই দলে হযরত আনাসও (রা) শামিল ছিলেন। আমীরুল মু'মিনিন ৯ অথবা ১০জন সাহাবী সমন্বয়ে গঠিত এই দলকে জরুরী হিদায়াতসহ বসরা প্রেরণ করলেন। হযরত আনাস (রা) বসরা পৌঁছে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাহাদাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) খেলাফতের দায়িত্ব পান। এ সময় হযরত আনাস (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগত এবং কল্যাণকামী ছিলেন। তাঁর খেলাফতের শেষ যুগে বিদ্রোহীরা চরম ফিতনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বসলো। এমনকি তারা মদীনা পৌঁছে খলীফার বাড়ী অবরোধ করলো। এসব ঘটনার খবর বসরায় পৌঁছলে হযরত আনাস (রা), হযরত ইমরান (রা) বিন হাসিন (রা) এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁরা বসরা-বাসীদেরকে আমীরুল মু'মিনিনের (রা) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু এই সাহায্য মদীনা না পৌঁছতেই আমীরুল মু'মিনিনের (রা) শাহাদাতের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন। তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকেই উষ্ট্রের যুদ্ধের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। তারপর হযরত আলী (রা) এবং আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে যুদ্ধের এক দীর্ঘ সিলসিলা শুরু হলো। সেই ভয়ংকর যুগে হযরত আনাস (রা) নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন এবং কোন যুদ্ধ অথবা বাদ-বিসম্বাদে অংশ নেননি। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পরও

www.bjilibrary.com

তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সাধারণত একাকীত্বেই কাটিয়েছেন। ইমাম জাহবী (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রা) যুগে তিনি কিছু দিন বসরাবাসীদের ইমামতি করেছিলেন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফতকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী বসরার আমীর নিযুক্ত হন। এ সময় সে হযরত আনাসের (রা) ওপর নির্যাতন চালালো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হাজ্জাজ হযরত আনাসের (রা) বিরুদ্ধে বনু উমাইয়ার সমর্থনের অভিযোগ আরোপ করলো এবং মানুষের কাছে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তার ঘাড়ে মোহর লাগিয়ে দিল। হযরত আনাস (রা) অত্যন্ত ধর্যের সাথে এই শাস্তি বরদাশত করলেন। কিন্তু বাড়ী এসে খলিফা আবদুল মালিককে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রে তিনি হাজ্জাজের জুলুম ও হুমকির বিবরণী বর্ণনা করেছিলেন। আবদুল মালিক "খাদিমে রাসূলের (সা)" পত্র পাঠ করে থরথর করে কেঁপে উঠলেন এবং তিনি হাজ্জাজকে কঠোর ভাষায় একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে তিনি তাকে অবিলম্বে হযরত আনাসের (রা) কাছে পৌঁছে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খলিফার পত্র পেয়েই হাজ্জাজ নিজের দরবারীদের সঙ্গে নিয়ে হযরত আনাসের (রা) খেদমতে উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে ক্ষমা চাইলো। আল্লাহ পাক হযরত আনাসকে (রা) গভীর দূরদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র তাকে ক্ষমাই করে দেননি বরং তার দরখাস্তে আবদুল মালিককে নিজের সন্তুষ্টির চিঠিও লিখে দিলেন।

৯৩ হিজরীতে হযরত আনাস (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর। পরিবার-পরিজন গুণগ্রাহী এবং শিষ্যরা চিকিৎসাও সেবা-শুশ্রূষার কমতি করেননি। কিন্তু দুর্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যখন জীবনের আর কোন আশা রইলো না তখন খাস শাগরিদ ছাবিত বানানীকে (র) বললেন, আমার জিহবার নীচে আল্লাহর রাসূলের (সা) পবিত্র গোফ রেখে দাও। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। এই অবস্থায় পবিত্র রূহ উর্ধজগতে উড়ে গেল (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সে সময় হযরত আবু তোফায়েল (রা) ছাড়া আর কোন সাহাবী এই ধরা ধামে জীবিত ছিলেন না। হযরত আনাসের (রা) ইনতিকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য মানুষ নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য এসে উপস্থিত হলো। কাতান (র) বিন মদরক কালাবী জানাযার নামায পড়ালেন। অতপর হাজার হাজার মানুষ ইসলামের এই মহান সন্তানকে বসরার নিকট তাফ নামক স্থানে দাফন করলো।

হযরত আনাস (রা) অধিক সন্তানের পিতা ছিলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ৮০টি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে দান করেছিলেন। এছাড়া মৃত্যুকালে ২০জনের বেশী পুত্রও ছিলেন। হযরত আনাসের (রা) কয়েকজন সাহেবজাদা হাদীস শাস্ত্রে শেখ এবং ইমামের মর্যাদায় সমাসীন

www.bjilibrary.com

ছিলেন। প্রখ্যাত বসরী মুহাদ্দিস আবু উমায়ের আবদুল কবির বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাফছ বিন হিশামও (২৯১ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত) তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন। হযরত আনাস (রা) নিজের সন্তানদেরকে খুবই ভালোবাসতেন এবং তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে স্বয়ং শিক্ষা দিতেন।

হযরত আনাস (রা) হেদায়াত আকাশের সেইসব প্রোজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে পরিগণিত হতেন যাদের জ্ঞান ও মর্যাদার আলো সমগ্র ইসলামী দুনিয়াকে আলোকিত করে রেখেছিল। হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে প্রথম তবকার সাহাবী রূপে পরিগণিত হতেন। তিনি ১২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীসের মধ্যে সহীহ্ বুখারীতে ৮০টি এবং সহীহ্ মুসলিমে ৭০টি হাদীস পৃথকভাবে স্থান পেয়েছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ১৮০টি ঐকমত্যের (মুত্তাফাকুন আলাইহি) হাদীস আছে। হযরত আনাস (রা) ওহির প্রস্রবণ থেকে উপকৃত হওয়া ছাড়াও নীচের জালিলুল কদর মহান সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের (রা) নিকট থেকেও জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেছিলেন ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত ওসমান গণি (রা), হযরত ফাতিমাতুজ্জ জোহরা (রা) বিনতে রাসূল (সা), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, হযরত আবু যর গিফারী (রা), হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব, হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল, হযরত উবাদাহ (রা) বিন ছামেত, হযরত আবু তালহা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস, হযরত উম্মে সুলাইম (রা) (মা), হযরত উম্মে হারাম (রা) (খালা) এবং হযরত উম্মুল ফজল (রা) [হযরত আব্বাসের (রা) (রাসূলের (সা) চাচা) স্ত্রী]।

হযরত আনাসের (রা) জ্ঞান সাগরে যারা অবগাহন করেছিলেন তাদের সংখ্যাও অনেক। কতিপয় প্রখ্যাত ছাত্রের নাম হলো ঃ

হযরত খাজা হাসান বসরী (র), সোলায়মান তাইমী (র), ছাবিত নাবানী (র), কাতাদাহ (র), আবু কালাবাহ (র), হামিদুত তাবিল (র), ছামামাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আনাস (রা), ইসহাক বিন আবি তাহলাহ (র), আবু ওসমান (র), জায়াদ (র), আবু বকর বিন আবদুল্লাহ মুযনি, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ (র), মুহাম্মাদ বিন সিরিন (র), আনাস বিন সিরিন (র), রবিয়াতুর রায় (র), সাঈদ বিন জাবির (র) এবং সালমাহ বিন দরদান (র)।

মুসনাদে আহমদে (র) বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন চূড়ান্ত সতর্কতা হিসেবে বলতেন ঃ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص [অথবা যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)

বলেছেন] যেসব হাদীস বুঝতে লোকদের ভুল ধারণা হতে পারতো হযরত আনাস (রা) সেসব হাদীস বর্ণনাই করতেন না। তাছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনা করার সময় পরিষ্কার করে বলে দিতেন যে, আমি এই হাদীস সরাসরি রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনেছি অথবা রাসূলের (সা) অমুক সাহাবীর কাছ থেকে।

হাদীস শাস্ত্র ছাড়া হযরত আনাস (রা) ফিকাহ শাস্ত্রেও সাগরের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন দ্বীনি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য ফতওয়া ও ইজতিহাদ কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। এসব ফতওয়া এবং ইজতিহাদ তাঁর তাফাককুহ ফিদ্বীন বা দ্বীনের সমঝ-এর স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি সাহাবীদের (রা) মধ্যে সেই কতিপয় ফকীহ সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাদেরকে হযরত ওমর ফারুক (রা) বসরাতে ফিকাহর তালিম দানের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। বসরায় হযরত আনাসের (রা) শিক্ষা প্রদানের এত জনপ্রিয়তা ও সুখ্যাতি হয়েছিল যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্ব থেকে জ্ঞান পিপাসুরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এমনকি মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা থেকেও ছাত্ররা বসরা এসে তাঁর ছাত্রের দলে শরীক হতেন। হযরত আনাস (রা) নিয়ম অনুসারে এবং ধারা পরম্পরা বজায় রেখে বছরের পর বছর লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। তিনি অত্যন্ত বাগ্মীতার ঢং-এ শিক্ষা প্রদান করতেন। পাঠদান অনুষ্ঠানে যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করতেন তাহলে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার জবাব দিতেন। হযরত আনাসের (রা) জীবনের ৬০-৭০ বছর জ্ঞানের প্রবাহ ধারা হিসেবে প্রবাহমান ছিল। জ্ঞান পিপাসুরা সাধ্য অনুযায়ী নিজেদের জ্ঞানের পাত্র পূর্ণ করেছিলেন।

হযরত আনাসের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাসূল (সা) প্রেম, সুন্নাতের অনুসরণ, জ্ঞান পিপাসা, বীরত্ব, জিহাদের আকাংখা, ন্যায় কাজের নির্দেশ এবং সত্য কথন সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। হযরত আনাসের (রা) জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে নিজের বাড়ীতে প্রথমদিন থেকেই ইসলামের আলোক রশ্মির ঝলমল রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মা হযরত উম্মে সুলাইম (রা), সতালো পিতা হযরত আবু তালহা (রা), চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নযর, সহোদর হযরত বারা' (রা) বিন মালিক, খালা হযরত উম্মে হারাম (রা) এবং মামা হযরত হারাম (রা) মিলহান সকলেই বিশ্বনবীর (সা) মুখলিস প্রেমিক ছিলেন। বংশে সবসময় মহানবীর (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের চর্চা হতো। এই পবিত্র পরিবেশে কিশোর আনাসের (রা) অন্তরে হুজুরের (সা) প্রতি ভালোবাসার বীজ অংকুরিত হয়েছিল। তারপর তিনি অব্যাহত দশ বছর পর্যন্ত রহমতে দো আলমের (সা) খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ সময় তাঁকে প্রিয়নবীর (সা) নজীরবিহীন উন্নত চরিত্র এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, তিনি নিজের স্নেহপরায়ণ আকা ও মাওলার (সা) সত্যিকার

www.bjilibrary.com

আশেক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত হুজুরকে (সা) এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খিদমত করেছিলেন যে, তিনি (সা) সবসময় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন। বিশ্বনবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আনাসের (রা) দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু নিজের আকার (সা) ইরশাদ অনুযায়ী অস্থিরচিত্ত না হয়ে তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং নিজেকে মহানবীর (সা) শিক্ষা ও ইরশাদ উম্মাতের কাছে পৌছানোর জন্যে ওয়াক্ফ করেছিলেন। তবুও রহমতে আলমের (সা) স্মরণ তাঁকে সবসময় ব্যথিত করে রাখতো। তাঁর এমন কোন মজলিশ ছিল না যাতে হুজুরের (সা) উল্লেখ হতো না। নবী যুগের কোন ঘটনা কারো কাছ থেকে শুনতেন অথবা নিজে বর্ণনার সময় চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। একদিন বিশ্বনবীর (সা) হুলিয়া মুবারক-এর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। "আমি কখনো কোন রেশম রাসূলের (সা) হাতের তালু থেকে বেশী নরম পাইনি এবং কোন খোশবু বা সুগন্ধি হুজুরের (সা) বদন মুবারক থেকে বেশী খোশবুদার পাইনি।" এভাবে বর্ণনা করতে করতে ভালোবাসার আধিক্যে বেকারার হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে এলো ঃ

"কিয়ামতের দিন রাসূলের (সা) যিয়ারত নসিব হলে আরজ করবো, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার নগণ্য গোলাম আনাস উপস্থিত।"

মহানবীর (সা) প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রভাব এমন ছিল যে, প্রায় সময়ই স্বপ্নে মহানবীর (সা) যিয়ারত লাভ ঘটতো।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর নিকট দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু থেকে প্রিয় ছিল। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন বস্তু এমন ; যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে তা পাওয়া যায় তাহলে সে যেন ঈমানের মর্যাদাই পেয়ে গেল। প্রথম হলো, আল্লাহ এবং তার রাসূল ব্যক্তিটির নিকট সমগ্র দুনিয়া থেকেও প্রিয়। দ্বিতীয় হলো, যাকে সে ভালোবাসবে তাকে যেন আল্লাহর খাতিরেই ভালোবাসবে। তৃতীয়, ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন সে এমনভাবে অপসন্দ করবে যেমন আগুনে পড়ে যাওয়াকে অপসন্দ করে।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন, কোন এক ব্যক্তি মহানবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলো ; কিয়ামত কবে আসবে। তিনি (সা) বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি সামান সংগ্রহ করেছ। আরজ হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমিতো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (সা) ভালোবাসি। তিনি (সা) বললেন, ঠিক আছে, যাকে ভালোবাসো তার সাথে তোমার হাশর হবে। হুজুরের (সা) এই ইরশাদ শুনে আমরা যতখানি খুশী হয়েছিলাম কখনো অন্য কথা শুনে

www.bjilibrary.com

ততখানি খুশী হইনি। আমার আশা যে, নবী (সা), হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁদের সাথে থাকবো। প্রকৃতপক্ষে আমার আমল তাঁদের আমলের মত নয়।

নিজের সন্তান এবং সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য প্রিয় নবীর (সা) মহান চরিত্রের উল্লেখ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

❑ মহানবী (সা) কখনো কোন খাদ্যদ্রব্যের ত্রুটি বের করেননি। যদি তিনি পসন্দ করতেন তাহলে খেয়ে নিতেন। যদি পসন্দ না হতো তাহলে তা খেতেন না। –সহীহ বুখারী

❑ প্রিয় নবীর (সা) নিকট যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিস চাইতেন তখন তিনি তাঁকে সেই জিনিস দিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি মহানবীর (সা) নিকট এলো। তিনি (সা) এক মরূদ্যানে বিচরণরত (নিজের সকল) বকরী তাকে দিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি নিজের কওমে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলো যে, মুহাম্মাদ (সা) তো এমন ব্যক্তির মত দান করে, যার দারিদ্রতার কোন ভয়ই নেই। কোন কোন সময় কোন ব্যক্তি শুধু সম্পদ হাসিলের জন্য মুসলমান হতো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সকল বস্তু থেকে প্রিয় হয়ে যেতো। –সহীহ মুসলিম

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দার প্রতি সেই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যান, যখন সে কোন লোকমা খায় এবং তা খাওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যখন পানির ঢোক পান করে তখনো আল্লাহর প্রশংসা করে। –সহীহ মুসলিম

❑ প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রশস্ততা এবং তার মৃত্যুর পর তার কথা অবশিষ্ট থাকুক তা চায় ; তাহলে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে। –সহীহ বুখারী

❑ মহানবী (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা নিজের ভাইয়ের জন্য পসন্দ না করে। –সহীহ বুখারী

❑ প্রিয় নবী (সা) আমাকে বলেছেন, বেটা ! যখন তুমি নিজের গৃহে প্রবেশ কর তখন ঘরের লোকদের সালাম কর। এই সালাম তোমার এবং তোমার ঘরের লোকদের জন্য বরকতের কারণ হবে। –তিরমিযি শরীফ

❑ বিশ্বনবী (সা) কতিপয় শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি (সা) তাদেরকে সালাম জানালেন। প্রিয় নবীর (সা) এই মুবারক অভ্যাসই ছিল। –সহীহ বুখারী

www.bjilibrary.com

☐ মহানবীর (সা) এটা পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি নিজের বিছানায় যেতেন তখন এই দোয়া করতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই যিনি আমাদেরকে খাইয়েছে এবং পান করিয়েছেন ও আমাদের জরুরাত পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আরাম করার স্থান দিয়েছেন। কয়েক ধরনের মানুষ আছে, যাদের না প্রয়োজন পূরণ হয়েছে। না তারা আরামের স্থান পেয়েছে।
—সহীহ মুসলিম

বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র জীবন সবসময়ই হযরত আনাসের (রা) দৃষ্টিতে থাকতো। এজন্য নিজের সকল কাজেই হুজুরের (সা) অনুসরণের চেষ্টা থাকতো। ইবাদাত হোক অথবা মুয়ামালাত সকল কাজেই রাসূলের (সা) উত্তম আদর্শের ওপর আমল করতেন। নামাযে খুশু-খুজুর অবস্থা এমন ছিল যে, দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সকল বস্তু সম্পর্কে বেখবর হয়ে যেতেন। একবার হযরত আবু হুরাইরা (রা) তাঁকে নামায পড়তে দেখে বললেন, আমি ইবনে উম্মে সুলাইমের (রা) [আনাস (রা)] চেয়ে বেশী কাউকেই রাসূলের (সা) মত করে নামায পড়তে দেখিনি।

সুন্নাত অনুসরণের আগ্রহ হযরত আনাসের (রা) মধ্যে এতবেশী ছিল যে, কখনো কোন কাজ রাসূলকে (সা) একবার করতে দেখলেও তা অনুসরণের চেষ্টা করতেন। একবার তিনি দেখলেন যে, প্রিয় নবী (সা) শিশুদেরকে আগেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি সারাজীবন এমনকি বার্ধক্য কালেও শিশুদেরকে আগে সালাম দিতেন।

একবার সফরে নামাযের সময় হলো। তিনি উটের পিঠেই নামায পড়ে নিলেন। উট কিবলামুখী ছিল না। শিষ্যরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলকে (সা) একবার এভাবে নামায পড়তে দেখেছিলাম।

একবার একই কাপড়ে নামায পড়ছিলেন। ইবরাহিম বিন রবিয়াহ (র) তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। হযরত আনাসের (রা) নামায শেষ হলে ইবরাহিম (র) জিজ্ঞেস করলেন আপনি এক কাপড়ে নামায পড়েন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি হুজুরকেও (সা) এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছিলাম। [মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হুজুর (সা) সর্বশেষ নামায হযরত আবু বকরের (রা) পেছনে পড়েছিলেন এবং তা এক কাপড়েই আদায় করেছিলেন।]

হযরত আনাসের (রা) জ্ঞানার্জনের এত আগ্রহ হচ্ছিল যে, তিনি শুধু মাত্র নবীর (সা) সাহচর্যেই অব্যাহতভাবে ১০ বছর কাটাননি বরং মহান সাহাবীদের (রা) নিকট থেকে যথাসাধ্য জ্ঞান অর্জন করেছেন। ফল স্বরূপ তিনি ইলম ও ফজলের "মাজমাউল বাহরাইন" বা দুই সাগরের সমাগমে পরিণত হন।

www.bjilibrary.com

অতপর এই ইলম বা জ্ঞানকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং সারা জীবন তা বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

বীরত্ব এবং সাহসিকতাতেও হযরত আনাস (রা) যুবক আনসারদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত পারদর্শী ও উঁচু ধরনের অশ্বারোহী ছিলেন। ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আগ্রহের সাথে অংশ নিতেন। শৈশবকালে এত দ্রুত বেগে দৌড়াতেন যে, একবার বন্য খরগোশ-এর পিছনে দৌড়ে তাকে ধরে ফেলেন। অথচ তাঁর সকল সমবয়সী বালক তাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। হযরত আনাস (রা) নিজের সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান ছাড়া তীর চালনার প্রশিক্ষণও দিতেন। তাদের নিশানা ভুল হলে স্বয়ং এমনভাবে তাক করে নিশানা লাগাতেন যে, তীর নির্ভুলভাবে যথাস্থানে গিয়ে লাগতো। জিহাদে এত উৎসাহ ছিল যে, বয়স না হওয়া সত্ত্বেও মহানবীর (সা) যুগে ৯টি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে অনেক যুদ্ধে নিজের তরবারীর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। ভালো কাজের নির্দেশ এবং সত্য কথন প্রশ্নে হযরত আনাস (রা) কোন সমালোচক বা বড় বড় ব্যক্তিত্বের কোন পরোয়া করতেন না। ভুল কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে বাধাদান এবং হক কথা বলার প্রশ্নে কোন সংকোচ-সংশয় প্রকাশ করতেন না। একবার মাসয়াব বিন যোবায়ের (রা) বসরা শাসনকালে শহরের একজন সম্মানিত আনসারীকে ষড়যন্ত্রের সন্দেহে গ্রেফতার করেন। হযরত আনাস (রা) একথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ দারুল ইমারাতে গিয়ে পৌছলেন। মাসয়াব আমীরের আসনে বসেছিলেন। হযরত আনাস (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, মহানবী (সা) আমীর ও শাসকদেরকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আনসারদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করতে হবে। তাদের মধ্যে যারা ভালো তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং যারা খারাপ তাদের ব্যাপারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাসয়াব "খাদিমে রাসূল (সা)" থেকে এ হাদীস শুনে আসন থেকে নেমে নিজের মুখমণ্ডল ফরাশের ওপর রেখে বললেন, রাসূলের (সা) ইরশাদ শিরোধার্য আমি তাঁকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

হযরত আনাস (রা) একবার উমাইয়া হুকুমাতের এক আমীর হাকাম বিন আইয়ুবের বাড়ী গেলেন। সেখানে দেখলেন যে, লোকজন একটি মুরগীর পা বেঁধে তার ওপর নিশানা ঠিক করছে। যখন তীর লাগছে তখন মুরগী ফড়ফড় করে উঠছে। হযরত আনাস (রা) ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বললেন, প্রিয় নবী (সা) এ ধরনের কাজ নিষেধ করেছেন। যবানহীন পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।

www.bjilibrary.com

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীর পুত্র একবার বসরার কাজী হওয়ার খাহেশ করলো। হাজ্জাজ তাকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলো। হযরত আনাস (রা) একথা জানতে পারলেন। তিনি হাজ্জাজের কাছে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি ইমারতের কাজী পদ লাভের খাহেশ করে ; রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের ব্যক্তিকে সেই পদে নিয়োগদানে নিষেধ করেছেন।

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত ইমাম হোসাইনের (রা) পবিত্র মাথা ইরাকের গবর্ণর উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের সামনে আনা হলো। এ সময় হযরত আনাসও (রা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। উবায়দুল্লাহ নিজের হাতের ছড়ি সাইয়েদেনা হোসাইনের (রা) পবিত্র চোখের ওপর মেরে তাঁর (রা) মুখমণ্ডল সম্পর্কে অশোভন এবং অপমানকর উক্তি উচ্চারণ করলো। হযরত আনাসের (রা) পবিত্র চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ

"তুমি কি জানো এই [সাইয়েদেনা হোসাইন (রা)] চেহারার সাথে মহানবীর (সা) আলোকজ্জল চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে।"

একবার উমুব্বী খলিফা আবদুল মালিক হযরত আনাসকে (রা) আনসারের একটি দলের সাথে দামেস্ক ডেকে পাঠালো। সেখান থেকে ফিরতি সফরে ফাজ্জুন নাকাহ নামক স্থানে আসরের সময় হলে হযরত আনাস (রা) দুই রাকায়াত নামায পড়িয়ে নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গীরা চার রাকায়াত পুরো করলেন। হযরত আনাস (রা) একথা জানতে পেরে খুব নাখোশ হলেন এবং বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হয় না। আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি, সেই যামানা আগত যখন মানুষেরা দ্বীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে অথচ বাস্তবত তারা দ্বীনের রূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে।

হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজ শাহজাদা অবস্থায় উমাইয়া হুকুমতের পক্ষ থেকে মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নর নিয়োজিত হলেন। সে সময় হযরত আনাসও (রা) মদীনা অবস্থান করছিলেন।

হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজ শাহী খান্দানে লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং দ্বীনি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে খুব বেশী জ্ঞাত ছিলেন না। লোকদেরকে নামায পড়ানোর সময় কোন না কোন ভুল হয়ে যেতো। হযরত আনাস (রা) তাঁকে সবসময় শুধরে দিতেন। তাঁর বার বার ভুল শুধরানোর জন্য হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজের মেযাজ খিটখিটে হয়ে গেল। একদিন

www.bjilibrary.com

হযরত আনাসকে (রা) বললেন, আপনি আমার পেছনে কেন লেগে রয়েছেন এবং আমার বিরোধিতায় সবসময় কোমর বেঁধে লেগে থাকার কারণ কি।

হযরত আনাস (রা) বললেন, "আমি রাসূলকে (সা) যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি, আপনি যদি সেইভাবে নামায পড়ান তাহলে আমার চেয়ে কেউ বেশী খুশী হবে না। নচেৎ আমি আপনার সাথে নামায পড়াই ছেড়ে দেব।"

হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজ অত্যন্ত চরিত্রবান ও সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। হযরত আনাসের (রা) ইরশাদে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাকে দ্বীনের রহস্য সম্পর্কে তালিম প্রদানের জন্য তার কাছে দরখাস্ত করলেন। এ ব্যাপারে তাঁর আর কি ওজর থাকতে পারতো। তিনি অত্যল্প সময়ে হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজকে শরীয়াতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন। অতপর সে সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ নামায পড়াতে লাগলেন। হযরত আনাস (রা) এই ভাষায়, স্বীকৃতি দিলেন যে, এখন এই যুবকের নামায নবী করীমের (সা) নামাযের সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে।

একবার ইরাকের গভর্নর উবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদের মজলিশে হাওজ-কাউসার-এর উল্লেখ হলো, সে হাউজ-কাউসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ এবং সংশয় প্রকাশ করলো। হযরত আনাস (রা) এ খবর জানতে পেরে অস্থির হয়ে পড়লেন। উঠে সোজা উবায়েদুল্লাহর দরবারে গেলেন এবং তাকে হাউজ-কাউসার সম্পর্কিত মহানবীর (সা) বাণীসমূহ অবহিত করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাওজ কাউসারের অস্তিত্ব মেনে না নিল ততক্ষণ তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন না।

একবার আসরের নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় সাক্ষাতের জন্য কিছু লোক এলো। তারা জিজ্ঞেস করলো কোন্ সময়ের নামাযের প্রস্তুতি বললেন, আসরের। তারা বললো, আমরাতো কেবল জোহর পড়ে আসছি।

হযরত আনাস (রা) খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, লোকজন বেকার বসে থাকে এবং নামাযের জন্য উঠেনা। যখন সময় খুব কম হয়ে যায় তখন তাড়াতাড়ি উঠে মোরগের মত চার ঠোঁট মেরে নেয়। এ ধরনের নামায হলো মুনাফিকের—মুমিনের নয়।

হযরত আনাসকে (রা) আল্লাহ পাক যেমন অত্যন্ত পবিত্র চরিত্র দান করেছিলেন। তেমনি তাঁকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও পবিত্র সুরতও দান করেছিলেন। চোহরা ছিল সুন্দর কমনীয় এবং আলোকোজ্জল। মিযাযে ছিল অতি পবিত্রতা। চুলে মেহেন্দি লাগাতেন এবং সুগন্ধিবস্তু খুব পছন্দ করতেন। খলুক নামক এক ধরনের খোশবু বা সুগন্ধি সবসময় হাতে লাগাতেন। বার্ধক্যের সময়, দাঁত নড়-বড় করতে শুরু করলো। এ সময় তিনি তা সোনার তার দিয়ে বাঁধলেন।

আংটি পরতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই হাদীস সামনে রাখতেন যাতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তোমাকে তার নিয়ামতসমূহ প্রদান করেছেন। অতএব এমন লেবাস বা পোশাক পরিধান কর যাতে আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ পায়। খোলা আবহাওয়া খুব পসন্দ করতেন। এজন্য বসরার উপকণ্ঠে তিফ নামক গ্রামে এক আলিশান প্রশস্ত বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। সেখানেই খুব উৎসাহের সাথে একটি বাগান রচনা করেছিলেন। এই বাগানে ফলের চারা ও ফুল প্রভূত পরিমাণে হতো। বাগানটির গাছ থেকে বছরে দু'বার ফল পাওয়া যেত এবং তাতে এক ধরনের এমন ফুল হতো যা থেকে মিশকের সুগন্ধি সুবাসিত হতো। অত্যন্ত সুন্দর খাবার খেতেন। দস্তরখানে প্রায় সময়ই চাপাতি ও গোশত থাকতো। কোন কোন সময় গোশতে তরকারীও দেয়া হতো। লাউয়ের মওসূমে প্রায়ই লাউ দিয়ে গোশত পাকানো হতো। কেননা, তাঁর আকা ও মাওলা (সা) লাউ খুব ভালোবাসতেন। অত্যন্ত দানশীল ব্যাক্তি ছিলেন। খাওয়ার সময় যত ছাত্র উপস্থিত থাকতেন ! পীড়াপীড়ি করে তাদেরকে খাওয়ায় শরীক করিয়ে নিতেন।

অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন। সাধারণত প্রতিটি বাক্য তিনবার বলতেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, কারো বাড়ী তাশরীফ নিলে ভেতরে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতেন।

সীমাহীন ধৈর্যশীল ও বিনয়ী ছিলেন। যদিও তিনি উঁচু মর্যাদার সাহাবী, সরদার এবং জ্ঞান গরিমার অধিকারী ছিলেন। তবুও সাধারণ মানুষের সাথে সকল স্থানে এবং সবসময় লৌকিকতাহীনভাবে মেলামেশা করতেন। এমনিভাবে শাগরিদ বা ছাত্রদের সাথেও খোলামেলা মিশতেন এবং তাদেরকে তার তা'জিমের জন্য উঠে দাঁড়ানো থেকে বাধা দিতেন। প্রায়ই বলতেন যে, আমরা বসে থাকতাম এবং প্রিয় নবী (সা) তাশরীফ আনতেন। এ সময় আমাদের কেউই তা'জিমের জন্য উঠে দাঁড়াতো না। এটা এজন্য যে, প্রিয় নবী (সা) এ ধরনের লৌকিকতা অপসন্দ করতেন। নচেৎ তাঁর চেয়ে বেশি আমাদের প্রিয় অন্য কেউ ছিল না। মোটকথা হযরত আনাস (রা) সুন্দর চরিত্রের এক আধার ছিলেন। তিনি চরিত্র ও গুণ মাধুর্যের যে নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তা আজও আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে।

www.bjilibrary.com

হযরত মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী

তিনি আওস গোত্র শাখা বনু আমর বিন আওফ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নসব নামা হলো ঃ মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার বিন যানবার বিন যায়েদ বিন উমাইয়াতা বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস। মাতার নাম ছিল নুসাইবাহ। সেও বনু আমর বিন আওফের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইবনে সায়াদ (রা) তাঁর নসবনামা এভাবে দিয়েছেন ঃ নুসাইবাহ বিনতে যায়েদ বিন জাবিয়াহ বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ। বিশ্বনবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের বসবাস ছিল কুবাতে। হিজরতের পর প্রিয় নবী (সা) কুবাতে শুভ পদার্পণ করলে আমর বিন আওফ-এর গোত্রই তাঁর মেযবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেন। কুবায় অবস্থানকালে মদীনার সকল খাজরাজী নেতা হুজুরের (সা) খেদমতে হাজির হন। কিন্তু তাতে বনু নাজ্জারের নকিব হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ [যিনি মহানবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস সাহাবী] ছিলেন না। প্রিয় নবী (সা) কুবাবাসীদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন হযরত মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার, তাঁর সহোদর আবু লুবাবাহ রাফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার এবং হযরত সায়াদ বিন খাইছুমা আওসী (রা) আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! সায়াদ বুয়াসের যুদ্ধে আমাদের কবিলার একজন সরদার নাবতাল বিন হারিছকে হত্যা করেছিল। সেজন্য সে এখানে আসতে ইতস্তত করছে।" দ্বিতীয় দিন হুজুর (সা) এই তিনজনকে ডেকে বললেন, "আমার ইচ্ছা হলো, তোমরা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহকে আশ্রয় দেবে।" তাঁরা আরজ করলেন, আপনি এটা চাইলে আমরা অবশ্যই তা করবো। সুতরাং হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) তৎক্ষণাৎ হযরত আসয়াদের (রা) বাড়ী গেলেন আবং তাঁর হাত ধরে নিজেদের গোত্রে নিয়ে এলেন। বনু আমর বিন আওফ এর অন্যান্য সদস্যরা যখন মহানবীর (সা) ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেলেন তখন তাঁরা সকলেই হযরত আসয়াদকে (রা) আশ্রয় দিলেন। কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এ সময় হযরত মুবাশশারকে (রা) হযরত আকিল (রা) বিন আবি বাকিরের দ্বীনি ভাই বানিয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত মুবাশশার (রা) এই যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ এবং আবেগের সাথে অংশ নিলেন এবং জীবন বাজি রেখে লড়াই করতে করতে আবুছুর নামক একজন মুশরিকের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি ওহোদে নিঃসন্তান অবস্থায় শহীদ হন। এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, তিনি খায়বারে শাহাদাত পিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই লিখেছেন, তিনি বদরের যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু লুবাবাহ রাফায়াহ (রা) হযরত মুবাশশার (রা) এর সহোদর ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত নু'মান (রা) বিন মালিক আনসারী

তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের "বনু কাওকাল"-এর সঙ্গের নসবনামা হলোঃ নু'মান (রা) বিন মালিক বিন ছা'লাবা বিন রায়াদ বিন ফাহার বিন ছা'লাবা বিন গানাম বিন আওফ বিন খাজরাজ।

অত্যন্ত মুখলিস এবং আবেগোদ্দীপ্ত মুসলমান ছিলেন। সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে তরবারীর নিপুণতা দেখিয়েছিলেন। তৃতীয় হিজরীতে মহানবী (সা) ওহোদের যুদ্ধে রওনা হলেন। এ সময় হযরত নোমানও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে ছিলেন। রওয়ানার প্রাককালে তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবো।"

হুজুর (সা) বললেন, "তা কেমন করে ?" আরজ করলেন ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি (সা) আল্লাহর রাসূল । আমি যুদ্ধ থেকে কখনো ভেগে যাবো না।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি সত্য বলেছ।"

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত নুমান (রা) জীবন বাজী রাখার হক আদায় করলেন এবং অবশেষে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কসম রক্ষা করলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া তাঁকে শহীদ করেন।

কতিপয় চরিতকার হযরত নুমান (রা) বিন মালিক এবং হযরত নু'মানুল আরাজকে (রা) একই ব্যক্তি বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'জন পৃথক ব্যক্তিত্ব। যদিও উভয়ের দাদা ছিলেন একজন। নু'মানুল আরাজ (রা)-এর পরদাদার নাম ছিল আহরাম (আছরাম) বিন ফাহার এবং নু'মান (রা) বিন মালিকের পর দাদার নাম ছিল রায়াদ বিন ফাহার। তাছাড়া নু'মানুল আরাজ (রা) আল্লাহকে নিজে জান্নাতে দাখিল করার জন্য কসম দিয়েছিলেন। আর নু'মান (রা) বিন মালিক স্বয়ং কসম খেয়ে ছিলেন যে, তিনি জান্নাতে দাখিল হবেন।

www.bjilibrary.com

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারী

রহমতে আলম (সা) একদিন মসজিদে নববীতে (সা) বসেছিলেন। কয়েকজন জাননিছার সাহাবীও প্রিয় নবীর (সা) পাশে উপস্থিত ছিলেন এবং হুজুরের (সা) মহান বাণী শ্রবণ করছিলেন। ইত্যবসরে একজন এসে খবর দিল যে, আপনার (সা) একজন মাদানী সাহাবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। হুজুর (সা) এই খবর শুনে বেচাইন হয়ে পড়লেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সঙ্গে নিয়ে শুশ্রূষার জন্য তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলেন। এর আগে হুজুর (সা) কখনো তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহানবীকে (সা) ইসতিকবাল করার জন্য রাস্তায় বিছানা বিছিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ হুজুর (সা) তাঁর গৃহে পদার্পণ করলেন। অথচ তাঁর কোন খবর নেই। কঠিন ব্যাথায় দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার কোন বস্তু সম্পর্কেই তাঁর কোন খবর ছিল না। এমন বেহুশ ছিলেন যে, তাঁকে দেখে কেউ কেউ মৃতুই মনে করছিলেন। কেউ বললেন, ওফাত পেয়েছেন । কেউ বললেন, শুধু নিশ্বাসটুকু বাকী রয়েছে। হুজুর (সা) তাঁর এই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মহানবীর (সা) এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামও (রা) কাঁদতে লাগলেন। এ সত্ত্বেও হুজুর (সা) সবাইকে ভরসা দিলেন। রুগীর রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করলেন এবং অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ফিরে গেলেন। রাসূলের এই রুগ্ন সাহাবী যাঁর সঙ্গে সাইয়েদুল আনামের (সা) এমন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারী। সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি খাজরাজ-এর শাখা "বনু সায়িদাহর" আশার আলো ছিলেন এবং ইমারত ও রিয়াসত তাদের গৃহের দাসী ছিল। এজন্য সাইয়েদুল খাজরাজ উপাধিতে মশহুর ছিলেন। কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু কায়েসও ছিল। আবার আবু ছাবিততও ছিল। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিন দুলাইম বিন হারিদাহ বিন আবিখুযাইমাহ বিন ছা'লাবাহ বিন তোরাইফ বিন খাজরাজ বিন সায়িদাহ বিন কায়াব বিন খাজরাজ আকবার।

মাতার নাম ছিল উমরাহ (রা) বিনতে মাসদি। তিনিও ইসলাম গ্রহণ এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত সায়াদের (রা) দাদা

www.bjilibrary.com

দুলাইম এবং পিতা উবাদাহ নিজের সায়িদাহ খান্দানের সরদার এবং খাজরাজ গোত্রের প্রতিপত্তিশালী নেতা ছিলেন। তারা শুধু নামের সরদারই ছিলেন না বরং অন্তরেরও সরদার ছিলেন এবং তাদের দস্তরখানে হাজার হাজার মানুষ প্রতিপালিত হতো। দুলাইমের আমলে তাঁদের খান্দানে একটি নিয়ম ছিল। নিয়মটি হলো প্রতিদিন দুর্গের ওপর থেকে এক ব্যক্তি এই মর্মে ঘোষণা দিত যে, কোন ব্যক্তি যদি উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গোশত এবং তেল কামনা করে সে যেন আমাদের এখানে আগমন ও অবস্থান করে। দুলাইমের এই সাধারণ দাওয়াতে মুসাফির ও স্থানীয় সকল ধরনের মানুষই উপকৃত হতেন। এজন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁদের এই বদান্যতা ও দানশীলতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের খান্দানী মূর্তির নাম ছিল মানাত। প্রতি বছর মক্কা গিয়ে ১০টি উট তার মান্নত হিসেবে জবেহ করা হতো। দুলাইমের পর উবাদাহ এবং উবাদাহর পর সায়াদ (রা) ও নিজেদের খান্দানী রীতি বজায় রেখেছিলেন এবং নিজেদের দানশীলতা ও বদান্যতা জোরেশোরেই অব্যাহত ছিল। ইসলামপূর্ব যুগে আরবে মানুষ সাধারণত জাহেল ছিল এবং খুব কম সংখ্যক মানুষই লেখাপড়া জানতো। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ মদীনার সেই অল্প সংখ্যক মানুষের অন্যতম ছিলেন যারা জাহেলী যুগে ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে আরবী লিখতে পারতেন। তিনি শুধুমাত্রই লিখন-পঠনেই পারদর্শী ছিলেন না বরং একজন অভিজ্ঞ তীরন্দাজও ছিলেন। এজন্য লোকদের মধ্যে তিনি "কামিল" উপাধিতে মশহুর ছিলেন।

নবুওয়াতের ১১ বছর পর মদীনার ৬জন ভাগ্যবান খাজরাজী মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে ফিরে এলেন। এ সময় খাজরাজের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন । তিনিও সেই যুগে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিশিক্ত হয়ে ছিলেন। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে (নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরে) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, তিনি তার আগেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবুওয়াতের তের বছর পর মদীনাবাসীদের একটি বড় কাফেলা হজ্জের জন্য মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হচ্ছিল। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সমেত ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তিও সেই কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন। তাঁরা সেই বুলন্দ হিম্মত ও বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা একটি নির্ধারিত রাতের অন্ধকারে মুশরিক সঙ্গীদের থেকে পৃথক হয়ে উকবা গিরিপথে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। এ সময় তাঁরা আরেকটি প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা মহানবীকে (সা) মদীনা তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন মহানবী (সা) মদীনা

www.bjilibrary.com

গেলে তাঁরা তাদের জান-মাল এবং সন্তানসহ তাঁকে (সা) হিফাজত ও সাহায্য করবেন। বাইয়াতের পর মদীনাবাসী হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুসারে নিজেদের মধ্য তেকে ১২জন নকিব নির্বাচন করেছিলেন। এই ১২জনের মধ্যে ৯জন ছিলেন খাজরাজী এবং ৩ জন আওসী। খাজরাজী নকিবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। ইতিহাসে এই মহান ঘটনা বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা অথবা বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা নামে খ্যাত। এই ঘটনা বিশ্বনবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) মদীনায় হিজরতের ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যদিও বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার ঘটনা সম্পূর্ণরূপে সংগোপনে ঘটেছিল। তবুও মক্কার মুশরিকদের কানে কোন না কোনভাবে তার আওয়াজ গিয়ে পৌছে ছিল। তারা প্রত্যুষে কাফেলাওয়ালাদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বললো ঃ

"হে খাজরাজের দল ! আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুহাম্মাদের (সা) কাছে বাইয়াত করেছ।" ইয়াসরাবের (মদীনা) মুশরিকরা এই বাইয়াত সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তারা কসম খেয়ে বললো, এমন ধরনের কোন কথা হয়নি। তাদের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে আমার কাছে তা গোপন থাকতো না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই জবাবে মুতমায়েন হয়ে ফিরে চলে গেল। কিন্তু শীঘ্রই তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে পেলো। তখন তারা কাফেলার পেছনে ছুটলো। কাফেলা তো ইতিমধ্যে চলে গেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এবং হযরত মুনযির (রা) বিন আমর কাফেলা থেকে পেছনে পড়ে গেছে। মুশরিকরা তাঁদেরকে আজাখির (অথবা হাজিয) নামক স্থানে গিয়ে ধরে ফেললো। মুনযির (রা) কোনভাবে তাদের হাত থেকে ছুটে যেতে পারলেন। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ তাদের নির্মম হাতে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। জালেমরা উটের হাওদার চামড়ার লম্বা টুকরার সাথে তাঁর হাত গর্দান পেঁচিয়ে বেঁধে দিলো এবং তাঁকে মারতে মারতে এবং মাথার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে মক্কা নিয়ে এলো। অতপর যে কেউ সেখানে আসতো সেই তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতো এবং তার মাথার চুল ধরে টানা হেঁচড়া করতো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বর্ণনা করেছেন, "আমি যখন মক্কায় কুরাইশদের নির্যাতনের নিশানা ছিলাম তখন গৌরাঙ্গ ও আলো ঝলমল চেহারার এক ব্যক্তিকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। এই ব্যক্তি ছিলেন সোহায়েল বিন আমর। (তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।) আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, আমি যদি কারো কাছ থেকে উত্তম ব্যবহারের আশা করি তাহলে এই ব্যক্তির কাছ থেকেই করতে পারি। কিন্তু যখন সে

www.bjilibrary.com

আমার কাছে এলো তখন এতো জোরে আমার মুখের ওপর ঘুঁষি মারলো যে, আমার মুখ ঘুরে গেল। তখন আমি বুঝলাম যে এরা সবাই জালেম এবং কালো দিলের মানুষ। ইত্যবসরে আরো এক ব্যক্তি এলো (সে ছিল আবুল বখতার বিন হিশাম। সে বললো, "আরে ভাই ! এভাবে আর কত দিন মার খেতে থাকবে। মক্কায় তোমার পরিচিত কেউ নেই ?" আমি বললাম হাঁ, আমি হারিছ বিন উমাইয়া (বিন আবদি শামছ বিন আবদি মানাফ) ও জুবায়ের বিন মাতয়িন বিন আদিকে চিনি। এই দুই ব্যক্তি বাণিজ্য উপলক্ষে আমাদের ইয়াসরাব শহরে যাতায়াত করে থাকেন। আমি বহুবার তাঁদের বাণিজ্যিক কাফেলার হিফাজত করেছি—একথার পরিপ্রেক্ষিতে সে বললো, তাহলে ঐ দুই ব্যক্তির নাম নিয়ে দোহাই দাও এবং লোকদেরকে বলো যে তোমার ও তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে। আমি এভাবেই বললাম। ওদিকে সেই ব্যক্তি শহরে গেল এবং তাদের উভয়কে কা'বার হেরেমে উপস্থিত পেয়ে বললো, খাজরাজের এক ব্যক্তি 'আবতাহ'-তে মক্কাবাসীদের হাতে মারাত্মকভাবে পিটুনী খাচ্ছে এবং সে তোমাদের দু'জনের নামের দোহাই দিচ্ছে ও বলছে তার এবং তোমাদের মধ্যে আশ্রয়ের (প্রতিবেশীর) সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলো, সে তার নাম কি বলে ? সে বললো, সায়াদ বিন উবাদাহ। তাঁরা বললো, গজব হয়ে গেছে। এই সায়াদ তো খাজরাহ গোত্রের মহান নেতা এবং আল্লাহর কসম ! সে যা কিছু বলছে তা সবই ঠিক। সবসময় সে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়ে থাকে এবং সে ইয়াসরাবে কাউকে আমাদের ওপর জুলুমের ইজাজত দেয়নি। অতপর তারা দৌড়াতে দৌড়াতে এলো এবং আমাকে ঐ সব জালেমদের পাঞ্জা থেকে নাজাত দিল।"

হযরত সায়াদ (রা) মুক্তি পেয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। ইতিমধ্যে পথে তিনি নিজের আনসার ভাই মক্কার দিকে ফিরে যাওয়া অবস্থায় পেলেন। সে তাঁর খোঁজেই আসছিল। এখন তাঁকে সাথে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হিজরতের পর রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় আনসাররা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। হযরত সায়াদও (রা) তাদের মধ্যে ছিলেন। মহানবী (সা) বনু সায়িদার মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! এটা আমার গরীব খানা। এখানে শুভ পদার্পণ করুন।" হুজুর (সা) তাঁকে দোয়া খায়ের করলেন। এবং বললেন, "আমার উটনীকে চলতে দাও! যেখানে নির্দেশ আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে।"

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর (সা) মেযবানীর মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং মহানবীর (সা) উটনী তার দরজার সামনে গিয়ে বসে পড়লো এবং আবু আইয়ুবের গৃহ মহানবীর (সা) আলোয় ঝলমল করে উঠলো। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন, বিশ্বনবী (সা) আবু আইয়ুবের (রা) গৃহে অবস্থানের সাথে সাথে আনসারদের বাড়ী থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তাঁর খিদমতে পৌছা শুরু হলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর বাড়ী থেকে ছুরায়েদ (এক ধরনের মূল্যবান সুস্বাদু খাবার) ভর্তি একটি বড় পাত্র রাসূলের (সা) খিদমতে পৌছলো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখছেন যে, হযরত সায়াদ (রা) প্রায়ই হুজুরের (সা) খিদমতে খাবার প্রেরণ করতেন। হিজরতের প্রথম বছরের শেষে অথবা দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকে প্রিয় নবী (সা) আবওয়া যুদ্ধে গমন করেন। এ সময় তিনি হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরুল কুবরা যুদ্ধের আগে হুজুর (সা) মক্কা থেকে কুরাইশ বাহিনীর রওয়ানার খবর পেলেন। এ সময় তিনি দুশমনের সাথে মোকাবিলা প্রশ্নে নিজের জাননিছারদের সাথে পরামর্শ করলেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে কতিপয় সাহাবী অত্যন্ত আগুন ঝরা বক্তৃতা করলেন এবং মহানবীকে (সা) নিশ্চয়তা দিলেন যে, তারা হকপথে জীবন বাজি লাগিয়ে দেবেন। তাদের কুরবানীর আবেগ দেখে প্রিয় নবী (সা) খুব খুশী হলেন। তা সত্ত্বেও তিনি বললেন এখন অন্য সাহাবীরাও মত প্রকাশ করবেন। এই ইরশাদের লক্ষ্য ছিল আনসারদের মত জানা। কেননা আনসাররা বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাতে শুধু এই ওয়াদা করেছিল যে, তারা মদীনা মুনাওয়ারাতে তাঁর (সা) হিফাজত ও সাহায্য করবে। একথা বলেননি যে, তারা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বাইরে বের হয়েও মহানবীর (সা) সাহায্যে লড়াই করবেন। হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) ইচ্ছা বুঝতে পারলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন।

"হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভবত আপনি আমাদের ইচ্ছার কথা জানতে চান।"

হুজুর (সা) বললেন "হাঁ" হযরত সায়াদ (রা) আরজ করলেন।

"হে আল্লাহর রাসূল (সা) সেই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন রয়েছে, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বো। আর যদি শুকনো স্থানে নির্দেশ হয় তাহলে আমরা বারকুল গামাদ (ইয়ামেনের এক দূরবর্তী স্থান) পর্যন্ত পৌছতে উটের কলিজা গলিয়ে ফেলবো।"

www.bjilibrary.com

এক বর্ণনা অনুযায়ী এই বাক্যাবলী আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আশহালি আনসারির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ ও হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ উভয়েই স্ব স্ব গোত্রের উঁচুপর্যায়ের নেতা ছিলেন। এজন্য হতে পারে যে, উভয়েই নিজেদের আবেগ ও ত্যাগের কথা একই ধরনের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। যাহোক, বিশ্বনবী (সা) তাঁর আবেগপূর্ণ কুরবানীর ঘোষণায় খুবই খুশী হয়েছিলেন। আনন্দে মহানবীর (সা) চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি (সা) প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বদরের যুদ্ধে গমনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কুকুরে কামড় দেয়। ফলে তিনি প্রিয় নবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হন। মহানবী (সা) এ খবর শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, যুদ্ধে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর বড় আশা ছিল। তবুও তিনি (সা) তাঁকে বদরের সাহাবীদের মধ্যে শামিল করলেন এবং গনিমতের মাল থেকে তাঁকে অংশ দিলেন। ইবনে সায়াদের (র) বিপরীত ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর নিকট হযরত সায়াদ (রা) বদরের যুদ্ধে কার্যত শরীক ছিলেন।

পরবর্তী বছর তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনাসহ তাতে অংশ নিলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মক্কার কাফেদের হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লো। এ সময় মদীনাবাসী শহরের চারপাশে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছিল। এ সময় বিশ্বনবীর (সা) বাড়ীর হিফাজতের দায়িত্ব নিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। তিনি কতিপয় ব্যক্তিসহ সশস্ত্র হয়ে মসজিদে নববীতে পৌছে গেলেন এবং সারারাত প্রিয় নবীর (সা) বাড়ী পাহারা দিলেন। পরবর্তী দিন মহানবী (সা) যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ান হলেন। এ সময় খাজরাজের ঝান্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে প্রদান করলেন। তিনি এবং আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ঝান্ডা উঁচিয়ে সেনাবাহিনীর আগে আগে চলতে লাগলেন। যুদ্ধ শুরু হলে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। তিনি যখন রাসূলে আকরামের (সা) আহত হওয়ার খবর পেলেন তখন অস্থির হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুজ জাররাহ এবং অন্য কতিপয় সাহাবীও হুজুরের (সা) নিকট পৌছে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই মিলে মহানবীর (সা) শুশ্রূষা ও হেফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেন।

ওহোদের যুদ্ধের কয়েক মাস পর বনু নজিরের ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোমর বেঁধে লাগলো। এসময় মহানবী (সা) তাদেরকে অবরোধ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের শক্তি শেষ হয়ে গেল এবং পরাজয় স্বীকার করে নিল। (হুজুর (সা) তাদেরকে মদীনা থেকে শুধুমাত্র বহিষ্কারই করলেন) বনু নজির অবরোধকালে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ নিজের খরচে মুজাহিদদের মধ্যে খেজুর বন্টন করেছিলেন।

পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে প্রিয় নবী (সা) বনু মুসতালিককে উৎখাতের জন্য মাররে ইয়াসি তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। এবার সকল আনসার (আওস এবং খাজরাজ উভয়)-এর ঝান্ডা তাঁর কাছে ছিল।

সে বছরই খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে আরবের সকল মুশরিক ও ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা মুনাওয়ার ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। কিন্তু তারা নিজেদের ঈমানী শক্তির বলে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। যুদ্ধকালে এক সুযোগে মহানবী (সা) বনু গাতফানের নেতৃস্থানীয়দেরকে কাফেরদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য গাতফান সরদারকে আলোচনার জন্য ডাকলেন। তারা দাবী করলো যে, মদীনায় উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দিলে তারা ফিরে যাবে। হুজুর (সা) পরামর্শের জন্য হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ, হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ এবং হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে গাতফানীদের দাবী সম্পর্কে অবহিত করলেন। এই তিনজন আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এ ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন হুকুম নাযিল হয়নি তো ? হুজুর (সা) বললেন ঃ "না" অতপর তিনজন একবাক্যে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এই গাতফানীদেরকে তো আমরা জাহেলী যুগেও কোন সময় ঘাসও দেইনি এখন তো আল্লাহ তায়ালা আপনার সাহায্যে আমাদেরকে হেদায়াতের রাস্তা দেখিয়েছেন এবং ইসলাম আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছে। এখন কেন আমরা তাদেরকে খিরাজ দিব ? তাদের জন্য তো আমাদের তরবারীই আছে এবং তাই যথেষ্ট।"

বিশ্বনবী (সা) তাদের দ্বীনি মর্যাদাবোধ দেখে খুব খুশী হলেন এবং তাদের জন্য দোয়া খায়ের করলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধেও আনসারদের ঝাণ্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার নিকট ছিল।

খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) বনু কোরায়জার ইহুদীদেরকে অবরোধ করলেন। অবরোধকালে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ অবরোধকারী মুজাহিদদের রসদপত্তর নিজের কাছ থেকে সরবরাহ করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানীতে বনু গাতফান ও বনু ফাযারার লুটেরারা মদীনার কয়েক মাইল দূরে গাব্বাহ নামক স্থানে হুজুরের (সা) উটগুলো লুটে নিল। এ সময় তিনি (সা) তাদের উৎখাতের জন্য জি কারদ তাশরীফ নিলেন। তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত এবং তিনশ' মুজাহিদকে শহর রক্ষার জন্য তাঁর অধীনে দিয়ে যান। ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, সফরকালে হুজুর (সা) রসদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তখন তিনি (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খবর পাঠালেন। তিনি মদীনা থেকে ১০টি উট ও খেজুরের অনেকগুলো বস্তা প্রেরণ করলেন। হুজুর (সা) জি কারদ নামক স্থানে এগুলো পেয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হুদাইবিয়া নামক স্থানে "বাইয়াতে রিদওয়ানের" মহান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সেই ১৪শ' মাথা বিক্রিকারী সাহাবায়ে কেরামের (রা) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা হুজুরের (সা) পবিত্র হাতে "মৃত্যুর" বাইয়াত করেছিলেন এবং যারা প্রকাশ্য ভাষায় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সা) খায়বারের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা দিলেন। এ সময় ইসলামী বাহিনীকে তিনটি ঝাণ্ডা প্রদান করলেন। এর মধ্যে একটি ঝাণ্ডা তিনি (সা) হযরত সায়াদকে (রা) দিলেন।

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) মক্কা বিজয়ের ইরাদা করলেন। এ সময় তিনি খাস নিজের ঝাণ্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার হাতে সোপর্দ করলেন। মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করলো। তখন হযরত সায়াদ (রা) ঝাণ্ডা উড়িয়ে অত্যন্ত শান-শাওকতের সাথে আনসারদের আগে আগে চলছিলেন। সে সময় তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার এক আশ্চর্যজনক অবস্থা ছিল। কুরাইশ সিপাহসালার আবু সুফিয়ানের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর সীমাহীন আবেগ মুখ দিয়ে যুদ্ধ গাথায় প্রকাশ পেল ঃ

اليوم يوم الملحمد اليوم تستحل الحرمه

(আজ কঠিন রক্তাক্তের দিন আজ কা'বা হালাল হয়ে যাবে।)

হযরত আবু সুফিয়ান এই যুদ্ধ গাথা শুনে কেঁপে উঠলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর পর হুজুরের (সা) বিশেষ বাহিনী তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো। এ সময় আবু সুফিয়ান চেঁচিয়ে বললো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি আপনার কওমকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, এই কওমের ওপর রহম করুন। সায়াদ (রা) বিন

www.bjilibrary.com

উবাদাহ এখনই এই হুমকি দিয়ে অতিক্রম করে গেল যে, আজ কঠিন রক্তা-রক্তির দিন, আজ সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হবে এবং কুরাইশদেরকে বরবাদ করা হবে। আমি আপনাকে (সা) আপনার কওমের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াস্তে দিচ্ছি। আপনি তো (সা) সকল মানুষের মধ্যে উত্তম এবং সেফায়েল রেহেমী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে থাকেন।"

এ সময় হযরত ওসমান গনি (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আওফও হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন, আমরা ভয় পাচ্ছি যে, সত্যি সায়াদ (রা) কুরাইশদের ওপর তরবারী চালিয়ে না দেন। ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি জিরার বিন খাত্তাবের দরদে ভরা কবিতা হুজুরের (সা) সামনে পড়া শুরু করে দিলেন। এই কবিতায় মহানবীর (সা) নিকট ফরিয়াদ করে বলা হয়েছিল যে, সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ মক্কাবাসীদের কোমর ভেঙ্গে দিতে চায়। এ সময় আপনি (সা) ছাড়া কুরাইশকে আর কেউ আশ্রয় দানকারী নেই। তাদের জন্যে জমীন ছোট হয়ে গেছে। এবং আকাশ তাদের শত্রু।

হুজুর (সা) এসব শুনলেন। তাঁর রহমতের দরিয়া আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। বললেন ঃ "সায়াদ ভুল বলেছে। আজ কা'বার মর্যাদা দ্বিগুণ হবে। আজ রহম বা ক্ষমার দিন। আজ কুরাইশকে ইজ্জত দেয়া হবে। আজ কা'বাকে গিলাফ পরানো হবে।"

অতপর তিনি (সা) হযরত আলীকে (রা) হযরত সায়াদের (রা) নিকট প্রেরণ করলেন। বলে দিলেন ঝাণ্ডা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েসের (রা) কাছে দিতে হবে। হযরত সায়াদ (রা) ঝাণ্ডা প্রদানে ইতস্তত করছিলেন। তিনি বললেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ না পাবো যে প্রকৃতপক্ষেই হুজুর (সা) আমার নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, ততক্ষণ আমি ঝাণ্ডা কাউকে দিব না। হুজুর (সা) এই খবর পেলেন। তিনি নিজের পাগড়ী মোবারক হযরত সায়াদের (রা) নিকট প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি ঝাণ্ডা নিজের পুত্র কায়েসের (রা) হাওয়ালা করে দিলেন। অতপর হুজুরের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার ভয় হয় যে, কায়েসও (রা) কুরাইশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়ে না যায়।" একথায় হুজুর (সা) হযরত কায়েস (রা)-এর কাছ থেকেও ঝাণ্ডা নিয়ে নিলেন এবং তা হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের কাছে সোপর্দ করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত সায়াদ (রা) হুনাইনের রক্তাক্ত লড়াইয়ে হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হুনাইনের যুদ্ধে খাজরাজের ঝাণ্ডাবাহী হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহই ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হুনাইনের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) গনীমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় কতিপয় নওমুসলিমের মন যোগানোর জন্য বিশেষভাবে বড় বড় অংশ প্রদান করা হলো। তাতে আনসার যুবকরা মনোক্ষুণ্ন হলো এবং তাদের মধ্যে এ ধরনের কানাঘুষা শুরু হলো যে, মুশরিকদের রক্ত এখনো আমাদের তরবারী বেয়ে পড়ছে। অথচ গনীমতের মাল কুরাইশ ও তার মিত্রদেরকেই দেয়া হচ্ছে। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এসব কথা শুনলেন এবং হুজুরের (সা) নিকট গিয়ে বলেদিলেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, সকল আনসারকে অমুক তাঁবুতে একত্রিত কর। যখন সবাই একত্রিত হলো তখন হুজুর (সা) তাদেরকে বললেন, এমন এমন কথা শুনলাম। তাদের মধ্যে কেউ আরজ করলেন ঃ "হে রাসূল ! বয়স্ক লোক এবং আমাদের নেতারা এমন ধরনের কথা বলেননি। অবশ্য যুবকরা বয়সের কারণে অবশ্যই এ ধরনের কথা বলেছে।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হে আনসাররা ! এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে। আমি তোমাদেরকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে হক পথে এনেছি এবং জান্নাতের হকদার বানিয়েছি। তোমরা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলে। আমি তোমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করেছি। আরব গোত্রসমূহে তোমাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। আমি তোমাদেরকে সম্মানিত স্থানে সমাসীন করেছি।"

আনসাররা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আর কি আরজ করবো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরাই বলো ! তোমাকে স্বগৃহে থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল ; আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম। তোমার কোন সাহায্যকারী ছিল না। আমরা তোমাকে সাহায্য করেছি। তুমি সহায়সম্বলহীন ছিলে। আমরা তোমাকে ধনী বানিয়েছি। সমগ্র বিশ্ব তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। আমরা তোমাকে সত্য বলেছি। তোমরা এই জবাব দিয়ে যাবে এবং আমি বলে যাব যে, তোমরা সত্য বলছো। কিন্তু হে আনসাররা ! তোমরা কি এটা পসন্দ কর না যে, অন্যান্য মানুষ উট, বকরী এবং ধন-সম্পদ স্বগৃহে নিয়ে যাক। আর তোমরা মুহাম্মাদকে (সা) আপন ঘরে নিয়ে যাও।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে আনসারদের অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে তাদের শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো এবং অযাচিতভাবে বলে উঠলো ঃ "আমরা শুধু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহকে (সা) চাই।"

তারপর হুজুর (সা) বললেন ঃ "আনসাররা আমার এবং আমি আনসারদের। হে আল্লাহ ! আনসার ও আনসার পুত্রদের ওপর রহম কর। হে

www.bjilibrary.com

আনসারের দল। কুরাইশদেরকে এ জন্য বেশী মাল দেয়া হয়েছে যাতে তাদের মন যোগানো হয়। কেননা কেবলমাত্র তারা মুসলমান হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের হক বেশী।"

আনসাররা বিশ্বনবী (সা) সহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলো। এ সময় আনন্দের আধিক্যে তাদের পা যেন আর মাটিতে ধরছিলো না।

নবম হিজরীতে হুজুর (সা) মুসলমানদেরকে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে খরচের উৎসাহ দিলেন। এ সময় ত্যাগ ও কুরবানীর বিস্ময়কর দৃশ্য প্রতিভাত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঘরের সুঁই সূতা পর্যন্ত এনে মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) গৃহের অর্ধেক মাল-আসবাব নিয়ে এলেন। হযরত ওসমান গনি (রা) পালানসহ এক হাজার উট এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেশ করলেন। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীও (রা) উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। কথিত আছে যে, এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিরাট অংকের অর্থ দান করেছিলেন। তারপর তিনি তাবুকের কঠিন সফরে হুজুরের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন। মুসলমানদের ওপর তখন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও এলো যে, মুসলিম উম্মাহর সামান্য সময়ের জন্যও নেতৃত্বহীন থাকাটা ঠিক নয়। সুতরাং হুজুরের (সা) ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের প্রশ্ন উঠে দাঁড়ালো। আনসাররা সাকিফায়ে বনু সায়িদাহ নামক স্থানে একত্রিত হলো। স্থানটির মালিক ছিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। হযরত সায়াদ (রা) কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তবুও লোকজন তাঁকে ধরে ইজতিমা স্থলে নিয়ে এলো। সেখানে তিনি কাপড় উড়িয়ে বালিশ ঠেস দিয়ে বসে গেলেন। তারপর তিনি একটি ওজস্বী বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি আনসারদের কুরবানী ও মর্যাদার বর্ণনা দিলেন। তিনি গৌরব প্রকাশ করে বললেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) সবসময় আনসারদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন যে, আনসাররাই খিলাফাতের সবচেয়ে বেশী হকদার। এজন্য তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফাতুর রাসূল নির্বাচন করে নেয়।

অন্য কতিপয় বুজর্গ আনসারও হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর মতের পক্ষে বক্তৃতা করলেন এবং সংখ্যাধিক মতে এটাই সিদ্ধান্ত হলো যে, আনসারদের মধ্যে খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। ইত্যবসরে মুহাজিররাও এই ইজতিমার খবর পেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত আবু উবায়দাহ

www.bjilibrary.com

(রা) ইবনুল জাররাহকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সাকিফায়ে বনু সায়িদাহতে পৌছে গেলেন। অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনা এবং সমস্যার সকল দিক বিবেচনার পর অধিকাংশ সাহাবী (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে খিলাফতের বাইয়াত করলেন। এই সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ? অনেক নেতৃস্থানীয়, চরিতকার এবং ঐতিহাসিক যেমন ইবনে আছির, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং ইবনে কুতাইবা (র) বলেছেন, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করেননি এবং মনোক্ষুণ্ন হয়ে হাওরান (সিরিয়া) চলে গিয়েছিলেন। ১৫ হিজরীতে সেখানে তাঁকে কেউ শহীদ করে ফেলেছিল। ইবনে আবদুর রাব্বিহির "ইক্‌দুল ফরিদ" গ্রন্থে কালবি থেকে এমনকি এটাও বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে এজন্যই হত্যা করেছিল যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) [এবং তাঁর পর হযরত ওমর ফারুক (রা)]-এর বাইয়াতের অস্বীকৃত জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু এমন রেওয়ায়াতও আছে যে, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) যুক্তিতে মুতমায়েন হয়ে মুহাজিরদের খিলাফতের হকদার হওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং সিদ্দীকে আকবারের (রা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। ইবনে জারির তাবারি নিজের ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর বাইয়াতের উল্লেখ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় করেছেন। তিনি লিখেন :

تتابع القوم على البيعد وبايع سعد

"কওম বাইয়াতে পরস্পরের অনুসরণ করলো এবং সায়াদও (রা) বাইয়াত করলেন।"

তাবারিরই অন্য এক রেওয়ায়াতে স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর মুখে তাঁর বাইয়াতের স্বীকৃতি উল্লেখ রয়েছে এবং এ বর্ণনাও রয়েছে যে, যদি তিনি বাইয়াত না করতেন তাহলে লোকজন তাঁকে সিরিয়া গমনের জন্য জীবিত রাখতো না।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের একটি মুরসাল রেওয়ায়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সন্তুষ্ট চিত্তে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করেছিলেন। সেই রেওয়ায়াতের বাক্যাবলী নিম্নরূপ :

"হামিদ (রা) বিন আবদুর রহমান হুমায়রী বলেন, রাসূলের (সা) যখন ওফাত হলো তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মদীনার কোন্ অংশে ছিলেন। এই হৃদয়বিদারক মৃত্যুর খবর শুনে তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র দেহের

www.bjilibrary.com

পাশে এলেন এবং তাঁর (সা) চেহারা মোবারক থেকে চাদর উঠিয়ে বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনি জীবিত অবস্থাতেও এবং ওফাতের পরও কত সুন্দর। তারপর বললেন, কা'বার রবের কসম ! মুহাম্মাদ (সা) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অতপর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) দ্রুততার সাথে আনসারদের নিকট গেলেন। হযরত আবু বকর (রা) ভাষণ দিলেন এবং তাতে আনসারদের প্রতি সেই মর্যাদার উল্লেখ করলেন যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অথবা রাসূলে করীম (সা) যা বর্ণনা করেছেন। তারপর বললেন, অবশ্যই রাসূল (সা) বলেছেন, যদি সকল মানুষ এক উপত্যকার দিকে যায় এবং আনসাররা অন্য কোন উপত্যকার দিকে ; তাহলে আমি আনসারের উপত্যকাকে গ্রহণ করবো। এবং হে সায়াদ ! (বিন উবাদাহ) তুমিও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলে। যখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, কুরাইশরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। লোকদের মধ্যে যারা ভালো তারা কুরাইশদের মধ্যেকার ভালো লোকদেরকে আনুগত্য করবে এবং লোকদের মধ্যে যারা খারাপ তারা কুরাইশের খারাপ লোকদের আনুগত্য করবে। হযরত সায়াদ (রা) (বিন উবাদাহ) বললেন, অবশ্যই আপনি সত্য বলেছেন। আমরা আনসাররা হলাম উযির বা মন্ত্রী এবং আপনারা হলেন আমীর।"

মুহাদ্দিস হাইছামী (র) এই রেওয়ায়াতকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মশহুর শাফেয়ী ফকীহ ইবনে হাজার হাইতামী (র) নিজের গ্রন্থ "আস সাওয়ায়িকিল মাহরিকা"তে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর বাইয়াত না করার ধারণাকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কানযুল উম্মালের লিখকও হযরত সায়াদের (রা) বাইয়াত করার রেওয়ায়াতকে গ্রহণ করেছেন এবং তা নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

সাহাবীদের (রা) মহান মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ঐকমত্য ভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে কোন মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের (রা) সম্পর্কে সুধারণা পোষণই সর্বোত্তম পন্থা। এ জন্য আমরা সেইসব রেওয়ায়াতকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করে নিয়েছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর ওফাতের সাল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ১১, ১৪ এবং ১৫ হিজরী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জমহুরে ওলামা ১৫ হিজরীর রেওয়ায়াতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ওফাত কিভাবে হলো ? সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায়নি। এক বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তি তীর মেরে শহীদ করে ফেলেছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তি শহীদ করে ঘরের

www.bjilibrary.com

গোসলখানায় নিক্ষেপ করেছিল। বাড়ীর লোকজন যখন দেখলো তখন দেহ নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে কে শহীদ করেছিল এবং এই নিষ্ঠুরতার কি উদ্দেশ্য ছিল ? এ ব্যাপারেও কিছু জানা যায়নি।

হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রীর নাম ছিল ফাকিহাহ (রা) বিনতে উবায়েদ আনসারী। তিনি হযরত সায়াদের (রা) চাচার কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুখলিস মহিলা সাহাবী। এক বর্ণনায় আছে, অষ্টম হিজরীতে তিনি হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে নিজের গোলামকে মসজিদে নববীর জন্য মিম্বর তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর গোলাম গাব্বার ঝাউ কাঠ দিয়ে মিম্বর বানিয়েছিলেন।

মৃত্যুকালে হযরত সায়াদ (রা) তিন পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তারা হলেন ঃ কায়েস (রা), সাঈদ ও ইসহাক। তাদের মধ্যে হযরত কায়েস (রা) মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। দেহাকৃতি লম্বা ও সুঠাম দেহী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির থাকতেন এবং বিশেষ করে মদীনায় (শহরে) "পুলিশের" দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।

হযরত সায়াদ (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত সাঈদ (রা) বিন মুসাইয়্যিবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বর্ণনায় আছে, হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) কতিপয় ইরশাদ লিখে রেখেছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, ঈমানের জোশ জিহাদের আবেগ, আল্লাহর পথে ব্যয় এবং দান ও বদান্যতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজের কুরবানীর জযবাহ এবং অন্যান্য নেক গুণাবলীর কারণে তিনি রাসূলের (সা) নৈকট্যলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। হুজুর (সা) তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, প্রায়ই তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিতেন। কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং হুজুর (সা) তাঁর অসুস্থতার খবর পেলে বেচাইন হয়ে যেতেন। তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষার জন্য তিনি তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিতেন। হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর (সা) তাঁর জন্য এই দোয়া করেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আপনার বরকত ও রহমত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর পরিবারের ওপর নাযিল করুন।"

অন্য আরেক সময়ও তিনি (সা) এই দোয়া করেছিলেন ঃ "আল্লাহ ! আনসারদেরকে কল্যাণকর প্রতিদান দিন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম ও সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে।"

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবী (সা) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলে হযরত সায়াদ (রা) প্রায়ই তাঁর (সা) খিদমতে খাবার প্রেরণ করতেন। তাছাড়া কোন কোন সময় বিশেষভাবেও মহানবীকে (সা) দাওয়াত করতেন। ইবনে আসাকির (র) হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ রাসূলে আকরাম (সা)-কে দাওয়াত এবং তাঁর (সা) সামনে রুটি ও খেজুর পেশ করলেন। হুজুর (সা) তা খেলেন। এ সময় তাঁর খিদমতে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হলো। হুজুর (সা) তা পান করলেন এবং বললেন ঃ তোমার খাবার ভালো মানুষ খাবে ও তোমার নিকট রোযাদার ইফতার করবে এবং ফেরেশতারা তোমার জন্য দোয়া করবে।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রা) বলেন যে, সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হুজুরের (সা) খিদমতে খাবার পেশ করলেন। এই খাবারের মধ্যে তেল ও খেজুর ছিল।

ইবনে আসাকির স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ "আমি রাসূলের (সা) খিদমতে উটের মজ্জাস্থির একটি বড় পেয়ালা পূর্ণ করে আনলাম। তিনি (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু ছাবিত ! এটা কি ? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আজ ৪০টি বড় কলজে ওয়ালা উট জবেহ করেছি। আমার অন্তরে আপনাকে এই উটের মজ্জাস্থি খাওয়ানোর সাধ জাগলো। এই পেয়ালায় সেই মজ্জা রয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) তা খেলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন।"

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার উদারতা, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভংগী, দানশীলতা ও বদান্যতার অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমসাময়িক যুগের একজন বড় দানশীল ছিলেন এবং এ কারণে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) হযরত উরওয়ার (রা) এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমি সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে নিজের হাভেলীর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে ডাকতে শুনেছি। তিনি ডেকে ডেকে বলতেন, কেউ যদি চর্বি অথবা গোশত পসন্দ করে তাহলে সে যেন উবাদার নিকট আসে।"

হযরত সায়াদ (রা) এই বদান্যতা নিজের পিতা ও দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তারপর তার পুত্র হযরত কায়েসও (রা) নিজের এই বংশীয় রীতি কায়েম রাখেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর (রা) হযরত সায়াদের (রা) হাভেলীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে সময় হযরত সায়াদের (রা) আম দাওয়াতের দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে উঠলো এবং তিনি বললেন, এটা হলো সায়াদের (রা) সেই হাভেলী যেখানে তিনি লোকদেরকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে আনতেন।

www.bjilibrary.com

আসহাবে সুফফার না ছিল বাড়ী এবং কোন জীবিকা। এ জন্য তারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে পরিগণিত হতেন। বিত্তশালী সাহাবায়ে কিরাম (রা) আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে একজন অথবা দু'জন করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৮০ ব্যক্তির খাবার প্রেরণ করতেন।

মুসনাদে আহমদে (র) বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়াদের (রা) মা হযরত উমরাহ (রা) বিনতে মাসউদ পঞ্চম হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এ সময় তিনি মায়ের ইসালে সওয়াবের জন্য পানির একটি খাল কাটেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে আজও এই খাল "সিকায়াহ আলে সায়াদ" নামে মওজুদ রয়েছে।

অষ্টম হিজরীতে সাইফুল বাহর অথবা জাইশুল খাবত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই অভিযানের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ এবং তিনশ' সদস্যের বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা) ছাড়া হযরত সায়াদের (রা) পুত্র হযরত কায়েসও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অভিযানকালে রসদপত্তর শেষ হয়ে গেল এবং মুজাহিদরা কঠিন মুসিবতে নিপতিত হলেন। এ সময় হযরত কায়েস (রা) উট ধার নিয়ে নিয়ে জবেহ করা শুরু করলো। যখন ৯টি উট জবেহ হলো তখন হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) হযরত আবু ওবায়দাহকে (রা) বললেন, কায়েসকে (রা) থামান। নচেৎ সে নিজের বাপের সম্পদ এখানেই খরচ করে ফেলবে। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) তাঁকে আরো উট জবাই করা থেকে বিরত রাখলেন। হযরত কায়েস (রা) মদীনা ফিরে এসে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মুসলমানদের মুসিবতের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, উট জবেহ করতে। হযরত কায়েস (রা) বললেন, আমি তিনবার এ রকম করেছি। কিন্তু তারপর আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে। যখন হযরত সায়াদ (রা) এই ঘটনা জানলেন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) অমুক কথা বলেছেন, তখন তিনি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মহানবীর (সা) পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"ইবনে আবু কুহাফাহ এবং ইবনে খাত্তাব-এর পক্ষ থেকে কেউ জবাব দিক যে, তারা আমার পুত্রকে বখিল কেন বানাতে চায়?"

বিশ্বনবীর (সা) প্রতি হযরত সায়াদের (রা) ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। হুজুর (সা) তাঁর বাড়ীতে শুভপদার্পণ করলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। প্রিয় নবী (সা) তার বাড়ী থেকে চলে আসতে চাইলে হযরত সায়াদ (রা) নিজের গাধার ওপর চাদর বিছাতেন এবং তা মহানবীর (সা) সওয়ারী হিসেবে পেশ করতেন। অতপর নিজের পুত্র হযরত কায়েসকে (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিতেন। মহানবীও (সা) হযরত

সায়াদকে সম্মান করতেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে, যুদ্ধের পূর্বে একবার হযরত সায়াদ (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) এই খবর পেলেন এবং তার শুশ্রূষার জন্য সওয়ারীর ওপর রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে মুসলমান ও মুনাফিকরা এক বৈঠকে বসেছিলেন। তাদের মধ্যে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইও ছিল। এ ছিল সেই ব্যক্তি যাকে মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসী (আওস ও খাজরাজ) নিজেদের বাদশাহ বানানোর প্রশ্নে ঐকমত্যের কথা ঘোষণা করেছিলো এবং তার জন্য তাজও তৈরী করিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনার পর এসব তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটি আবদুল্লাহ্ বিন উবাই খুব কঠিনভাবে গ্রহণ করেছিল এবং সে হুজুরকে (সা) তার পথের কাঁটা হিসেবে বিবেচনা করছিলো। হুজুরের (সা) সওয়ারীর চারপাশে ধূলা উড়ছিল। তাতে সে অভদ্রজনোচিত ভাষায় বললো ঃ "মুহাম্মাদ ! তোমার গাধা আস্তে চালাও। তার দুর্গন্ধ আমার দিমাগ পেরেশান করে দিয়েছে। একথার জবাবে হুজুর (সা) মসলিশে উপস্থিত সকলকে সালাম করলো এবং সওয়ারী থেকে নেমে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ইবনে উবাই খিটখিটে মেজাজে বললো ঃ "তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে বলো যারা স্বয়ং তোমার কাছে গিয়ে থাকে।" এ সময় কথা এতদূর গড়ালো যে, মুসলমানও মুনাফিকদের মধ্যে তরবারী চলার আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু হুজুর (সা) উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। এরপর তিনি (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং আলোচনাকালে তাঁকে বললেন ঃ "সায়াদ (রা) ! তুমি শুনেছ যে, আজ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই (আবু হুবাব) আমাকে এই এই কথা বলেছে।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি তার কথায় কোন আমলই দিবেন না। তাকে আমরা আমাদের বাদশাহ্ বানাতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ্ পাক আপনাকে (সা) হক-এর সাথে প্রেরণ করলেন। তখন আমরা সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। ইবনে উবাই-এর কথা বাদশাহী থেকে মাহরুম হওয়ার ফলশ্রুতি। আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।" হযরত সায়াদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (সা) ইবনে উবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

একবার হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) সাদকা আদায়ের অফিসার হিসেবে মনোনীত করলেন। কিন্তু তিনি যখন এই জিম্মাদারী গ্রহণে ওজর পেশ করলেন তখন হুজুর (সা) তাঁর ওজর কবুল করলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর মর্যাদা ও স্থান নির্ণয়ের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সাইয়েদুল আনাম ফখরে মওজুদাত (সা) তার জন্য বারবার দোয়া করেছিলেন এবং অনেকবার তাঁর বাড়ী গমন করেছিলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত হারিছ (রা) বিন সিমমা আনসারী

সাইয়েদেনা হযরত আবু সাইদ হারিছ বিন সিমমা খাজরাজের সম্ভ্রান্ততম খান্দান নাজ্জারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

হারিছ (রা) বিন সিমমা বিন আমর বিন আতিক বিন আমর বিন আমের (মাবযুল) বিন মালিক বিন নাজ্জার।

মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই তাঁর পূত-পবিত্র স্বভাব তাঁকে তাওহীদের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি নবুওয়াতের একাদশ থেকে ত্রয়োদশ বছরের মধ্যে কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিশ্বনবীর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনার কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত হারিছ (রা)-কে হযরত সোহায়েব রুমীর (রা) ইসলামী ভাই বানান।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হলেন। তখন হযরত হারিছও (রা) মহানবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন। পথিমধ্যে রুহা নামক স্থানে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাতটি গুরুতর ধরনের ছিল। তিনি আর যুদ্ধ করার যোগ্য রইলেন না। সুতরাং হুজুর (সা) তাঁকে মদীনা ফেরত পাঠালেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে বদরের গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেছিলেন। এ জন্য তিনি বদরী সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধে বীরবিক্রমে অংশ নেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। চরিতকাররা এই যুদ্ধে আনসারদের মধ্যে যারা অটল ছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধে তিনি কুরাইশের এক বাহাদুর ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুগিরাহকে হত্যা করেন। হুজুর (সা) নিহতের সকল সাজ-সরঞ্জাম তাঁকে প্রদান করেন। তাঁকে ছাড়া হুজুর (সা) অন্য কোন মুসলমানকে কোন কাফেরের সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করেননি।

এক বর্ণনায় আছে যে, যুদ্ধের তখন চরম পর্যায়। হযরত হারিছ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হলেন। মহানবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে দেখেছ ?" তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি পাহাড়ের দিকে কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁর সাহায্যের জন্য যেতে চাইলাম। কিন্তু আপনার ওপর নজর পড়তেই

www.bjilibrary.com

এদিকে চলে এসেছি।" হুজুর (সা) বললেন, "আবদুর রহমানকে (রা) ফেরেশতারা বাঁচাচ্ছেন।" অতপর হযরত হারিছ (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের নিকট গেলেন। এ সময় দেখলেন যে, মুশরিকদের ৭টি লাশ তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে। তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "এদের সকলকেই কি আপনি হত্যা করেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আরতাত এবং অমুক অমুককে তো আমি খতম করেছি। অবশিষ্ট মুশরিকদের হত্যাকারী আমার নজরে পড়েনি।" একথা শুনে হযরত হারিছ (রা) বলে উঠলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ সঠিক বলেছিলেন।"

চতুর্থ হিজরীতে বিরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হলো। তার প্রেক্ষাপট হলো ঃ হুজুর (সা) আবু বারা' আমের বিন মালেকের আবেদন অনুযায়ী ৭০জন মুবাল্লিগের একটি দলকে নজদের দিকে রওয়ানা করালেন। হযরত হারিছ (রা) বিন সিমমাও এই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিরে মাউন্না নামক স্থানে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার সাথে গবাদি পশু চরানোর জন্য গেলেন। এমন সময় বনু আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল নজদী কতিপয় মুশরিক গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো এবং সবাইকে এক এক করে শহীদ করে ফেললো। যখন হযরত হারিছ (রা) এবং আমর (রা) বিন উমাইয়া নিজেদের সাথীদের লাশ মাটি ও রক্তে একাকার অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন হযরত হারিছ (রা) হযরত আমরকে (রা) বললেন, "এখন কি করা যাবে?"

আমর (রা) বিন উমাইয়া বললেন, "রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করা প্রয়োজন।"

হারিছ (রা) বললেন, "যে স্থানে মানযার (রা) নিহত হয়েছেন, সেই স্থান থেকে আমি কি করে চলে যেতে পারি?" একথা বলে তরবারী হাতে তুলে নিলেন এবং আমর (রা) বিন উমাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুশরিকরা তীরের বর্ষা বইয়ে দিলো। হযরত হারিছের (রা) দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াকে মুশরিকরা গ্রেফতার করলো।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হারিছ (রা) মুশরিকদের ওপর হামলা এবং দু'জনকে হত্যা করলেন। এ সময় মুশরিকরা চারদিকে জড়ো হয়ে হারিছ (রা) এবং ওমর (রা) দু'জনকেই গ্রেফতার করে নিল। অতপর তারা হযরত হারিছকে (রা) বললো, "আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে চাই না; তোমরা

www.bjilibrary.com

যা চাও তাই করবো।" হযরত হারিছ (রা) বললেন, "তোমরা আমাকে মানযার (রা) এবং হারাম (রা) বিন মিলহানের হত্যা স্থলে পৌছে দাও।" মুশরিকরা তাঁকে সেখানে পৌছে দিল। হযরত হারিছ (রা) শাহাদাত কামনায় অস্থির ছিলেন। তিনি কাফেরদের ওপর হামলা করে বসলেন। ইত্যবসরে তাদের দু' একজন নিহত হলো। এ সময় তারা হযরত হারিছকে (রা) চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো এবং এমনিভাবে তিনি শাহাদাতের পিয়ালা পান করে নিজের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার নিকট গিয়ে পৌছলেন।

হযরত হারিছ (রা) শাহাদাতের সময় দু'পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন ঃ আবু জাহাম (রা) এবং সায়াদ (রা) তাঁরা দু'জনই সাহাবী ছিলেন।

বিরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় যেসব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র, ইবাদাত গুজার এবং জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিলেন। কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কারণে তাঁরা 'ক্বারী' হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। এ থেকেই হযরত হারিছের (রা) মর্যাদা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, কাব্য চর্চাতেও তার দখল ছিল।

www.bjilibrary.com

হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারী

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারার একজন রাসূলের (সা) সাহাবী হুজুরের (সা) কথা নিজের অন্তরে এমনভাবে অন্তস্থ করে নিয়েছিলেন যে, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলতেন না। তিনি নিজের কথা ও কাজে সবসময় মহানবীর (সা) উত্তম আদর্শ সামনে রাখতেন। এমনকি মহানবীর (সা) ছোট ছোট কথাকেও অনুসরণ করাকে নিজের জন্য গৌরবের মনে করতেন। অথচ এসব কথা হুজুর (সা) অনুসরণের নির্দেশ দেননি। একবার তাঁর একজন শিষ্য মুলাকাতের জন্য উপস্থিত হলেন। এ সময় তিনি স্বয়ং অগ্রসর হয়ে শিষ্যকে সালাম করলেন এবং তাঁর হাত নিজের হাত দিয়ে ধরে খুব হাসলেন। অতপর তাঁকে বললেন ঃ "জানো আমি এমন কেন করলাম ?"

তিনি আরজ করলেন, "আপনিই বলুন।" বললেন ঃ আমি একবার রাসূলকে (সা) এমনিই করতে দেখেছি। সে সময় তিনি (সা) ইরশাদ করেছিলেন, যখন দু'জন মুসলমান এমনিভাবে মিলিত হয় এবং তাদের কোন ব্যক্তিস্বার্থ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে আল্লাহ উভয়কেই ক্ষমা করে দেন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী, যার রাসূল অনুসরণের জযবা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিলেন যে, যদি কোন কাজ রাসূলকে (সা) একবারও করতে দেখতেন, তাহলে তার অনুসরণ নিজের ওপর ওয়াযিব করে নিতেন। তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারী।

হযরত আবু আম্মারাহ বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারি জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল আওস শাখার বনু হারিছার সঙ্গে। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

বারা' (রা) বিন আযেব (রা) বিন হারিছ বিন আদি বিন জাশাম বিন মাজদায়াহ বিন হারিছাহ বিন হারিছ বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

হযরত বারা'র (রা) বংশে ইসলামের চর্চা হযরত আবু বুরদাহ (রা) বিন নিয়ারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এই ব্যক্তি ছিলেন তাঁর মামা এবং বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাতে (নবুয়াতের ১৩ বছর পর) তিনি মুসলমান হওয়ার

www.bjilibrary.com

সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বাল্লী গোত্রভূক্ত এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে বনু হারিছার মিত্র ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদ, আহযাব এবং নবীর (সা) অন্যান্য যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মহান মর্যাদাপূর্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁরই প্রভাব ও তাবলীগের বদৌলতে হযরত বারা'র (রা) পিতা আযেব (রা) বিন হারিছও ইসলাম গ্রহণের ও সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াতে থেকে জানা যায় যে, মহানবীর (সা) সঙ্গে হযরত আযেবের (রা) গভীর সম্পর্ক ছিল। এই রেওয়ায়াতেই আছে, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আযেবের (রা) নিকট থেকে উটের পালান ক্রয় করলেন এবং তাঁকে সেই পালান পুত্র মারফত উঠিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌছে দেয়ার কথা বললেন। হযরত আযেব (রা) আরজ করলেন, "হে রাসূলের (সা) হিরা গুহার বন্ধু ! মেহেরবানী করে প্রথমে হিজরতের কিসসা শুনান। তারপরই আমি আপনাকে যেতে দিব।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তার ইচ্ছা দেখে হেসে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আনন্দের সঙ্গে হিজরতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। হযরত আযেব (রা) এই কাহিনী শুনে খুশী হলেন এবং পুত্র হযরত বারা'কে (রা) পালান উঠিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ী রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। যুবক বারা' (রা) তৎক্ষণাৎ পালান উঠালেন এবং আনন্দের সঙ্গে হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ী পৌছে দিয়ে এলেন।

হযরত আবু বুরদাহ (রা) বিন নিয়ার এবং হযরত আযেব (রা) মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হযরত বারা'ও (রা) মামা ও পিতার অনুসরণ করলেন। মহানবীর (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণের পূর্বে হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়ের এবং হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের (রা) নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে দিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, যখন রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন, তখন হযরত বারা' (রা) সূরায়ে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লার' দারস নিচ্ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের এমনি আকাংখা ছিল। আর এই জ্ঞানই হযরত বারা'কে (রা) খনি বানিয়ে দিয়েছিল এবং একদিন তিনি জ্ঞানের আকাশে সূর্যের মত দেদিপ্যমান হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের ময়দানে। এ সময় হযরত বারা' (রা) বিন আযেব অত্যন্ত উৎসাহ-

www.bjilibrary.com

উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

বিশ্বনবী (সা) তাঁর আবেগ ও উৎসাহের প্রশংসা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন না। কেননা তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছরের কম। সহীহ বুখারীতে আছে, হুজুর (সা) সাধারণত সেইসব যুবককে যুদ্ধে অংশ-গ্রহণের অনুমতি দিতেন যাদের বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর পর্যন্ত পৌঁছতো। সুতরাং হযরত বারা' (রা) কম বয়সের ভিত্তিতে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সে সময় তাঁর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছিল। অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হলেন এবং খুব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন।

পঞ্চম হিজরীতে সমগ্র আরবের হকের শত্রুরা ঐকবদ্ধ্যভাবে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসলো। তা সত্ত্বেও হকপন্থীরা খন্দক বা পরিখা খনন করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজেদেরকে রক্ষা করেছিল। সেই কঠিন সময়ে বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরে বনি কুরায়জার ইহুদীরা মুসলমানদের পেছন দিক থেকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থাৎ পেছন থেকে হামলার পরিকল্পনা করে। হকপন্থীদের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার। কিন্তু তাদের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল। কোন হকপন্থীরই সেই কঠিন মুহূর্তে সামান্যতম পদস্খলনও ঘটেনি। আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ও সহযোগিতায় তারা সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) সেই জানবাজ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত তৎপরতার সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং অন্যান্য মুসলমানদের মত অবরোধের সকল মুসিবত হাসিমুখে বরদাশত করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) ওমরার জন্য মক্কা রওয়ানা হলেন। এই সফরে ১৪শ' সাহাবী হুজুরের (সা) সঙ্গী ছিলেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও। পথিমধ্যে হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের প্রবেশের ব্যাপারে সম্মত নয়। এ জন্য কুরাইশদের প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করা ছাড়া ওমরাহ করা সম্ভব নয়। বিশ্বনবীর (সা) এই প্রসঙ্গে রক্তারক্তির অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং তিনি (সা) মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে কয়েক মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন এবং মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। এই আলোচনা প্রক্কালে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) হুজুরের (সা) পয়গাম বা বার্তা নিয়ে

www.bjilibrary.com

মক্কা গেলেন। তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁকে সেখানে আটকে রাখলো। তাঁর ফিরতে দেরী হচ্ছিল। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে তাঁর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লো। এই খবরে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি হলো। হুজুর (সা) বললেন, ওসমানের (রা) খুনের বদলা নেয়া ফরয। অতপর তিনি (সা) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবীর (রা) নিকট থেকে জীবন উৎসর্গের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আল্লাহ পাক এসব সাহাবীর (রা) এই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত পসন্দ করলেন। তিনি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাষায় তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিলেন। এজন্য ইতিহাসে এই মহান ঘটনা "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে খ্যাতিলাভ করে। যেসব সাহাবী (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) শামিল ছিলেন। এই বাইয়াতের পর জানা গেল যে, হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের খবর সঠিক নয়। কিন্তু মুসলমানদের আবেগ-উদ্দীপনা ও সত্যবাদিতার প্রভাবে মক্কার কুরাইশদের হিম্মতে ভাটা পড়লো এবং তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি প্রশ্নে এগিয়ে এলো। সুতরাং মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত বারা' (রা) বিন আযেব এই যুদ্ধেও জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। অষ্টম হিজরীতে তিনি মক্কা বিজয়ের সময় বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে ছিলেন। একই বছরে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের শুরুতে বনু হাওয়াযিন লুকায়িত স্থান থেকে মুসলমানদের ওপর এমন প্রচণ্ডভাবে তীর বর্ষণ করলো যে, তাদের ব্যূহ চুরমার হয়ে গেল। ইসলামী বাহিনীতে মক্কার দু' হাজার নওমুসলিমও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পেছন দিকে এমনভাবে হটে এলেন যে, বেশীর ভাগ অন্যান্য মুসলমানও পিছ পা হতে বাধ্য হয়ে পড়লেন।

এই নাযুক সময়ে বিশ্বনবী (সা) পাহাড়ের মত দৃঢ়তা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি ছোট্ট দল তাঁর (সা) চারপাশে জীবন বাজী রাখার নৈপুণ্য প্রদর্শন করছিলেন; সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই দৃঢ়চিত্ত জাননিছারদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও শামিল ছিলেন। সেই রেওয়ায়াতে আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত বারা'কে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আপনিও কি পিছটানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পিছটান দেননি। অবশ্য দ্রুতগামী মানুষেরা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

হাদীস বেত্তারা তাঁর এই বর্ণনা থেকে এই অর্থই গ্রহণ করেছেন যে, তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। যদি ময়দান থেকে হটে যেতেন তাহলে যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলী বর্ণনা করতে পারতেন না।

মুসলমানদের বিশৃংখলভাব খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল। যখন মহানবীর (সা) নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা) মুহাজির ও আনসারদেরকে উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন ঃ "হে আনসারের দল—হে আসহাবিশ শাজারাহ (অর্থাৎ হে বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পন্নকারী লোকেরা) এই আহবানের সঙ্গে সঙ্গে সকল মুসলমান একবারে ফিরে দাঁড়ালেন এবং কাফেরদেরকে তরবারী দিয়ে উচিত শিক্ষা দিলেন।"

হুনাইনের যুদ্ধের পর হযরত বারা' (রা) বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে তায়েফ অবরোধে শরীক হন।

তায়েফের যুদ্ধের কিছুদিন পর হুজুর (সা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে একটি সেনাদলসহ ইয়েমেন রওয়ানা করালেন। এই দলে হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) ছিলেন। তাদের পিছু পিছু মহানবী (সা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে ইয়েমেন প্রেরণ করলেন। তাঁকে প্রেরণের সময় এই নির্দেশ দিলেন যে, খালিদের সঙ্গীদের মধ্যে যিনি মদীনা ফিরে আসতে চান তিনি ফিরে আসতে পারেন এবং যিনি তোমাদের সঙ্গে ইয়েমেনে অবস্থান করতে চান তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারেন। হযরত বারা' (রা) হযরত আলীর (রা) সঙ্গে ইয়েমেনে অবস্থান করাটাকেই পসন্দ করলেন। সহীহ বুখারীতে আছে, ইয়েমেন অবস্থানকালে তাঁর অংশে অনেক গনীমাতের মাল এসেছিল।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) মহানবীর (সা) যুগে সংঘটিত ১৫টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এসব যুদ্ধ ছাড়া তিনি আরো তিনবার হুজুরের (সা) সঙ্গে সফর করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় হযরত বারা' (রা) কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সিদ্দীকে আকবারের বাইয়াত করলেন এবং খিলাফতে সিদ্দীকীর প্রথম ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ সময়ে উত্থিত ফিতনার মূলোৎপাটনে নিজের পূর্ণশক্তিসহ রাসূলের (সা) খলিফাকে (রা) সাহায্য করেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা খতমের পর সিরিয়া ও ইরানে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ শুরু হলো। তখন হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন।

সে সময় তাঁর বয়স ২৫ বছরের কাছাকাছি ছিল এবং অন্তরে শাহাদাতের আকংখার আগুন জ্বলছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কয়েকটি যুদ্ধে তিনি জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা "রে" এবং "তাসতার" (শোস্তার)-এর যুদ্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এসব যুদ্ধে তিনি হযরত নাঈম (রা) বিন মাকরান এবং হযরত আবু মূসা আশআরীর (রা) সঙ্গে ইরানীদের বিরুদ্ধে নিজের তরবারীর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে আমিরে মুয়াবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; তাতে হযরত বারা' বিন আযেব (রা) হযরত আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করে পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করেন। এই যুগেই তিনি কুফায় বাড়ী তৈরী করেন এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। বিভিন্ন কার্যকারণে মনে হয়, হযরত আলীর শাহাদাতের পর তিনি নিজেকে রাজনৈতিক হাঙ্গামা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন শিক্ষা প্রদানের ব্যস্ততায় অতিবাহিত করেন। ৭৩ হিজরীতে বয়স যখন ৮৫ বছরে উত্তীর্ণ হয় তখনই শেষ ডাক এসে উপস্থিত হয় এবং সমসাময়িক সেই মহান ব্যক্তি কুফাতেই পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে গিয়ে হাজির হন। ওফাতকালে তিনি পাঁচ পুত্র যথাক্রমে ওবায়েদ, সওতা, রবি, সুয়ায়েদ এবং ইয়াযিদকে রেখে যান। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, সুয়ায়েদ আম্মানের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজের দায়িত্ব এত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছিলেন যে, জনগণের অন্তর জয় করে ফেলেছিলেন। মুসনাদে আহমদ হাম্বল অনুযায়ী আম্মানের ইমারতের দায়িত্ব ইয়াযিদ বিন বারা'র (রা) ওপর অর্পিত হয়। ঐতিহাসিকরা এই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন যে, সম্ভবত দুই ভাই একের পর অন্যজন আম্মানের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি ৩০৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ২২টি হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। হযরত বারা' (রা) রাসূলে আকরাম (সা) থেকে সরাসরিও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হযরত বিলাল হাবশীর (রা) মত মহান সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীসের মজলিশে কোন কোন সময় সমকালীন

www.bjilibrary.com

সাহাবায়ে কিরামও (রা) শরীক হতেন। হযরত বারা' (রা) হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) "তাবকাত" গ্রন্থে লিখেছেন যে হযরত বারা' (রা) বলতেন ঃ

"আমি যে হাদীস বর্ণনা করি, তার সবই আমি রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনে করি তা নয়। আমাকে উটও চরাতে হতো। এ জন্য রাসূলের (সা) খিদমতে সবসময় উপস্থিত থাকতে পারতাম না। সুতরাং আমি অনেক হাদীস সাহাবাদের (রা) নিকট থেকে বর্ণনা করে থাকি।"

হযরত বারা'র (রা) শাগরিদদের মধ্যে ইবনে আবি লায়লা (র), আবু ইসহাক (র), মাবিয়া বিন সুয়ায়েদ (র) এবং আবু বুরদাহর (র) মত মহান তাবেয়ীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত বারা' (রা) পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং ফিকাহর মাসয়ালাতেও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সামনে কোন সমস্যা পেশ করা হলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার সমাধান করে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

لاتلقوا بايديكم الى التهلكة

"নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"

আয়াতটির প্রয়োগ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও করা যায়। হযরত বারা' (রা) বললেন, অবশ্যই নয়। এর অর্থ হলো, জিহাদে ক্ষতি এবং ধ্বংস নেই। বরং জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকার মধ্যেই ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা যদি একথা ভেবে জিহাদে অংশ না নাও যে, তাতে কায়-কারবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হবে অথবা সম্পদ খরচ করতে হবে, তাহলে তোমরা তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফেলেছ। এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, বস্তুগত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে জিহাদ থেকে পিছটান দিও না।

হযরত বারা' (রা) রাসূলে আকরাম (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) নিজের মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) হযরত বারা' (রা) বিন আযেবকে (রা) একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই দোয়ার এক স্থানে 'বি নাবিয়্যিকা' শব্দটি ছিল। হুজুর (সা) হযরত বারা'র (রা) নিকট এই দোয়া পড়ে শুনাতে বললেন। দোয়াটি পড়তে পড়তে যখন তিনি 'বি নাবিয়্যিকা'-র স্থানে এলেন তখন 'বিরাসুলিকা' পাঠ করলেন। হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন এবং বললেন, যে শব্দ আমি তোমাকে বলেছি ঠিক সেই শব্দ পড়।

www.bjilibrary.com

এই হিদায়াতের ফলশ্রুতিতে হাদীস বর্ণনার সময় তিনি হুজুরের (সা) বর্ণিত শব্দাবলীতে কোন ধরনের কম-বেশী অথবা পরিবর্তন করতেন না। তাতে যদি অর্থ অথবা মর্মার্থের কোন পার্থক্য সূচীত না হতো তবুও তিনি তা করতেন না। তিনি ছিলেন পূর্ণ বিনয়ী মানুষ এবং সমসাময়িক সাহাবাদের নিকট থেকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা অনুভব করতেন না। একবার আবদু. রহমান (র) বিন মাতয়াম জিজ্ঞেস করলেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কি দিরহাম বিক্রয় করা যায় ? হযরত বারা' (রা) বললেন, রাসূলে করীম (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন তখন আমরা মদীনাবাসীরা এমনি ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতাম। কিন্তু হুজুর (সা) ইরশাদ করলেন যে, হাতে হাতে দিরহাম ও দিনার বিক্রয় জায়েয। কিন্তু ঋণ নাজায়েয। আমি যা কিছু বলেছি তার সত্যতা যায়েদ (রা) বিন আরকামের নিকটও যাচাই করে নাও। কেননা তাঁর ছিল বিশাল বাণিজ্যিক কারবার।

আবদুর রহমান (র) হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকামের নিকট গেলেন। তিনি হযরত বারা'র (রা) কথার সত্যতা স্বীকার করলেন।

হযরত বারা' বিন আযেবের (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা জিহাদের আকাংখা এবং শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ ছাড়াও রাসূল প্রেম ও সুন্নাতের আনুগত্য সবচেয়ে আলোকোজ্জল অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে। হুজুরের (সা) কথা এমন মর্যাদা ও ভালোবাসার সাথে উল্লেখ করতেন যে, মুখ দিয়ে যেন মতি নিঃসৃত হতো। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি লাল পোশাকে কোন দীর্ঘ কেশধারী ব্যক্তিকে রাসূলের (সা) থেকে বেশী সুন্দর দেখিনি। তাঁর (সা) পবিত্র লম্বা কেশ কখনো কাঁধেও এসে পড়তো। তাঁর (সা) দুই কাঁধের মধ্যে কিছু দূরত্ব ছিল। তিনি যেমন খুব লম্বা ছিলেন না। আবার তেমনি বেঁটেও ছিলেন না।

এই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল সহীহ বুখারীতেও একটি হাদীস রয়েছে ঃ "একবার জনৈক ব্যক্তি বললেন যে, প্রিয় নবী (সা) চেহারা মুবারক তরবারীর মত (ঔজ্জল্য) ছিল। তিনি বললেন, না ; হুজুরের (সা) চেহারা মুবারক চাঁদের মত ছিল। (বুখারী)

হযরত বারা' (রা) বলতেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর তাকেই মনে করা হতো ; যে যুদ্ধের সময় রাসূলের (সা) নিকট দাঁড়িয়ে থাকতেন। (মুসলিম)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আমি প্রিয় নবীকে (সা) এশার নামাযে সূরায়ে "ওয়াততীন ওয়ায যাইতুন" পড়তে শুনলাম। আমি তাঁর (সা) থেকে সুকণ্ঠের কাউকে পাইনি।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বারা'র (রা) আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি থাকতো। মানুষেরা এতে আপত্তি জানালো। আপত্তির জবাবে তিনি

www.bjilibrary.com

বলতেন যে, এই আংটি প্রিয়নবী (সা) তাঁর পবিত্র হাত থেকে খুলে আমাকে পরিয়ে ছিলেন। সে জন্য আমি তা পরি। এ প্রসঙ্গে ঘটনা হলো ঃ একবার তিনি (সা) গনীমাতের মাল বন্টন করলেন। শুধুমাত্র এই আংটি বন্টন করা বাকী রয়ে গেল। তিনি (সা) এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতপর আমাকে ডেকে বললেন, নাও, এটা পরিধান করো। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল এটা তোমাকে পরিয়েছেন। এখন তোমরা চিন্তা করো যে, যে বস্তু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে পরিধান করিয়েছেন তা আমি কি করে খুলতে পারি।

সহীহ মুসলিমে হযরত বারা' (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আমরা রাসূলের (সা) পেছনে নামায পড়তাম তখন আমরা হুজুরের (সা) ডানদিকে দাঁড়ানো পসন্দ করতাম।

হুজুরের (সা) ওফাতের পরও তিনি এই কর্মপদ্ধতি সারা জীবন মেনে চলেছেন।

হযরত বারা' (রা) বলতেন, নবীয়ে আকরামের (সা) রুকূ' এবং সিজদা ও দুই সিজদার মধ্যে বৈঠক এবং রুকূ' থেকে ওঠা এই চার বিষয়ে সময়ের পরিমাণ সমান সমান হতো। তবে কিয়াম ও কুয়ুদ এর বাইরে থাকতো। একবার তিনি বাড়ীর সকল লোককে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, জীবনের কোন ভরসা নেই। কত সময় বেঁচে আছি জানি না। আমি আজ তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন করে ওজু করতেন এবং নামায পড়তেন তা দেখিয়ে দিতে চাই। অতপর তিনি বাড়ীর সবার সামনে ওজু করলেন এবং জোহর থেকে এশা পর্যন্ত সব নামায সকলের সঙ্গে পড়লেন।

একবার পরিবারের সকলকে সিজদার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবে সিজদা করতেন এবং নিজে সিজদা করে দেখালেন। যাতে সকলে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারেন।

প্রকৃতিগত দিক দিয়ে হযরত বারা' (রা) অত্যন্ত অনুভূতি ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর তিনি মুসলমানদেরকে কতিপয় ফিতনায় জড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন এবং তাতে খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। একবার জনৈক ব্যক্তি বললেন, আপনি কতবড় সৌভাগ্যবান যে, রাসূলের (সা) পবিত্র দেহ দর্শনে নিজের চোখ আলোকিত করেছেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। তিনি বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র তোমরা জানো না যে, মহানবীর (সা) তিরোধানের পর আমরা কি করেছি।

কতিপয় ফিকহী ও দ্বীনী মাসয়ালা প্রশ্নে হযরত বারা' (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। তিনি নামায, হজ্জ, কুরবানী, কবরের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে হুজুরের (সা) যেসব ইরশাদ উম্মাহর নিকট পৌছিয়েছেন তা চিরকাল মুসলমানদেরকে পথ প্রদর্শন করবে।

www.bjilibrary.com

হযরত আনাস (রা) বিন নযর আনসারী

ওহোদের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। একদিন রাসূলের (সা) দরবারে একটি মোকদ্দমা পেশ হলো। জনৈক আনসারী মহিলা। নাম তাঁর রুবায়্যি (রা)। তিনি আনসারেরই আরেক বালিকার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই বালিকার উত্তরাধিকাররা কিসাস দাবী করে নবীর (সা) আদালতে মামলা করলেন। বিশ্বনবী (সা) সব শুনলেন। শুনে ফায়সালা শুনালেন। ফায়সালায় বললেন, "দাঁতের পরিবর্তে দাঁত। রুবায়্যির দাঁত ভাঙ্গা হবে।"

সেই মহিলার ভাইও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বোনকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। যদিও তিনি একজন সাচ্চা মুসলমান এবং বিশ্বনবীর (সা) সত্যিকার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু বোনের ভালোবাসার আবেগে পরাভূত হয়ে অযাচিতভাবে বলে ফেললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম, রুবায়্যির দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ভাই, আল্লাহর হুকুম এটাই। হাঁ, বালিকার উত্তরাধিকাররা দিয়ত বা শোনিপাতের মূল্য নিয়ে নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করে নিলে অন্য কথা।"

সে সময় আল্লাহর রহমত জোশ মেরে উঠলো এবং বালিকার উত্তরাধিকাররা দিয়ত গ্রহণে সম্মত হয়ে গেল। এভাবে রাসূলের (সা) সেই সাহাবীর স্নেহাস্পদ বোনের দাঁত রক্ষা পেল। রহমতে আলম মহানবী (সা) বললেন ঃ "আল্লাহর কতিপয় বান্দাহ এমন আছেন যে, যখন কসম খেয়ে বসেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কসম পূরণ করে দেন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁর কসমের মূল্য মহান আল্লাহ পাক রেখেছিলেন এবং রাব্বুল আলামীনের প্রিয় নবী (সা) যাঁকে আল্লাহর খাছ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা) বিন নযর আনসারী।

হযরত আনাস (রা) বিন নযর খাজরাজের নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আনাস (রা) বিন নযর বিন জমজম বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুন্দুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার।

বিশ্বনবীর (সা) পরদাদী সালমা বিনতে আমর (হযরত আবদুল মুত্তালিব-এর মাতা)ও এই বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত

www.bjilibrary.com

আনাস (রা) বিন নযর এর ফুফু হতেন। এই সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আনাসের (রা) রাসূলের (সা) খান্দানের সাথেও সম্পর্ক ছিল। জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী হযতর উম্মে সুলাইম (রা) হযরত আনাস (রা) বিন নযরের বড় ভাবী এবং খাদিমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিক তাঁর সহোদর ছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন নযর বনু নাজ্জারের অন্যতম সরদার হিসেবে পরিগণিত হতেন। দুনিয়ার বিত্ত বৈভব ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। মহানবীর (সা) মদীনা শুভাগমনের পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। কোন কারণবশত বদরের (দ্বিতীয় হিজরী) যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। হক ও বাতিলের এই প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার মনোবেদনা ছিল তাঁর প্রচণ্ড। বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার বড় দুঃখ ও আফসোস হলো যে, আমি আপনার প্রথম যুদ্ধে আপনার সফর সঙ্গী হতে পারিনি। কিন্তু যদি জীবিত থাকি তাহলে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করবে যে, ভবিষ্যতে কি করি।"

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আনাস (রা) বিন নযর তাতে অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। যখন ঘটনাক্রমে কোন এক ভুলের কারণে যুদ্ধের গতি বদলে গেল এবং শুধু কতিপয় ব্যক্তি বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে ময়দানে রয়ে গেলেন ; তখন হযরত আনাস (রা) বিন নযর অত্যন্ত অস্থির হয়ে কাফেরদের দিকে এগুলেন। রাস্তায় দেখা হলো হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের সাথে। তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, সায়াদ কোথায় যাচ্ছো। ঐতো জান্নাত। আল্লাহর কসম ! ওহোদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ বা খোশবু পাচ্ছি।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলে আকরামের (সা) শাহাদাতের খবর শুনে কতিপয় সাহাবী ভগ্ন হৃদয়ে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে গিয়ে বসেছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন নযর তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে এখানে কেন বসে আছ ? তাঁরা বললেন, আফসোস ! রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। হযরত আনাস (রা) বললেন, তাহলে তোমরা জীবিত থেকে কি করবে ? ওঠো এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরে যাও। যেমনিভাবে হকের খাতিরে রাসূলুল্লাহ (সা) জীবন দিয়ে দিয়েছেন। একথা বলে তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে তরবারী চালাতে চালাতে কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করলেন। অবশেষে মুশরিকরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে তাঁর উপর তীর, তরবারী এবং বর্শার তুফান ছুটিয়ে দিল। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। যদিও তাঁর দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত-

www.bjilibrary.com

বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তবুও কাফেরদের ক্রোধের আগুন নেভেনি। তারা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেললো। লড়াই শেষ হওয়ার পর শহীদ ও আহতদের সন্ধান শুরু হলো। এ সময় হযরত আনাসের (রা) লাশ সনাক্ত করার উপায় ছিল না। অত্যন্ত কষ্ট করে তাঁর বোন রুবায়্যি বিনতে নযর একটি আঙ্গুল দেখে তাঁর লাশ সনাক্ত করেন। কথিত আছে যে, হযরত আনাসের (রা) আঙ্গুলে একটি তিল ছিল। এই তিল দেখে হযরত রুবায়্যি চিনতে পেরেছিলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে, তিনি হযরত আনাসের (রা) সুন্দর দাঁত অথবা আঙ্গুলের গিরা দেখে লাশ সনাক্ত করেছিলেন। যা হোক, সবাই এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেন যে, হযরত আনাস (রা) বিন নযর হক পথে জীবনদানের সময় সমগ্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ছিল। হযরত আনাস (রা) বিন মালিক খাদিমে রাসূল (সা) বলেছেন যে ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ۔

এই আয়াত তাঁর শানে নাযিল হয়েছিল। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে অনেক এমন মানুষ আছেন যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের মানত পুরো করেছেন। আবার কেউ কেউ সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর আনসারী

রহমতে আলম (সা) একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) হুজরা মুবারকে আরাম করছিলেন। রাতের দ্বিতীয়াংশে তিনি (সা) তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর কালাম পাঠ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর এই রাত জাগরণ এবং ইবাদাত প্রিয়তায় খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ক্ষমা করুন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যার রাত্রি জাগরণ সাইয়েদুল মুরসালিনকে খুশী করেছিলো এবং রাসূলের (সা) যবানীতে যার মাগফিরাত কামনা করা হয়েছিল—তিনি ছিলেন হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর কুনিয়ত বা ডাক নাম ছিল আবু রাফে এবং আবু বিশরও। তিনি আওস গোত্রের আবদুল আশহাল খান্দানের নয়ন মনি ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবাদ বিন বিশর বিন দাকশ বিন যা'নাবা বিন যাউরা' বিন আবদুল আশহাল।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে মদীনা এলেন। এ সময় তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলে আওস এবং খাজরাজের অনেক পরিবারে ইসলামের ব্যাপক চর্চা হতে লাগলো। তাদের মধ্যে বনু আবদুল আশহালের পরিবারও ছিল। যেদিন এই কবিলার সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ ইসলাম গ্রহণ করলেন সেইদিনই গোত্রের সকল পরিবার তাঁর অনুসরণে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর যেন দোজাহানের সকল নেয়ামতই পেয়ে গেলেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি রাসূলের (সা) দরবারে অতিবাহিত করতেন এবং আশানুযায়ী নবীর (সা) ফয়েজ লাভের প্রচেষ্টায় লেগে থাকতেন। হুজুর (সা)-এর প্রতি নিজের আস্থা, ভালোবাসা ও জ্ঞান অর্জনের সীমাহীন আকাংখার কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নবীর (সা) নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হন। হিজরতের কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। এ সময় হযরত আবাদ (রা)-কে হযরত আবু

www.bjilibrary.com

হুজায়ফা (রা) বিন উতবার দ্বীনী ভাই বানালেন। যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত আবাদ (রা) বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ এবং প্রতিটি যুদ্ধেই নিজের বাহাদুরী ও জীবন বাজী রাখার নিপুণতা প্রদর্শন করেন।

ইমাম বুখারী (র) ইবনে সায়াদ (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের পর মদীনার একজন প্রভাবশালী ইহুদী কা'ব বিন আশরাফ মুসলমানদের বিরোধিতা করাকে জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। সে একজন মৃদু বাক কবি ছিল। নিজের কবিতায় সে শুধুমাত্র রাসূলকেই (সা) নিন্দা করতো না বরং কাফেরদেরকে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উসকিয়েও দিত। সেই আবেগেই মক্কা পৌছলো এবং নিজের অগ্নিঝরা কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন আরো প্রজ্জলিত করলো। অতপর মদীনা ফিরে এসে নিজের তৎপরতা আরো জোরদার করলো। হুজুর (সা) তার এই ফিতনা সৃষ্টির ব্যাপারে অবহিত হলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দলকে এই ফিতনা নির্মূলের নির্দেশ দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মুসলিমাহ আনসারী হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর ও আরো কতিপয় জানবাজকে নিজের সঙ্গে নিলেন এবং কা'ব বিন আশরাফের বাড়ী গিয়ে তার জীবনের যবনিকাপাত ঘটালেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় হযরত আবাদ (রা) কতিপয় কবিতা পাঠ করেছিলেন। এই কবিতায় তিনি খুশী প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ইসলামের একজন বড় দুশমনকে খতম করার তৌফিক দান করেছেন। এই বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর কাব্য চর্চাতেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন।

পরিখার যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) আরবের সকল ইসলাম দুশমন ঐক্যবদ্ধভাবে মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করেছিল এবং মদীনার অভ্যন্তরে বনী কুরাইজার ইহুদীরা গাদ্দারী করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। সময়টা অত্যন্ত নাযুক সময় ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। তাদের ভয় ছিল কোন সময় যেন কোন ইসলাম দুশমন বিশ্বনবীকে (সা) আহত করে না ফেলে। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন, সেই যুগে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর অন্য কয়েকজন আনসারী সাহাবী সমভিব্যাহারে প্রতিরাতে হুজুরের (সা) আবাসস্থল পাহারা দিতেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) চৌদ্দশ' জাননিছারকে সঙ্গে নিয়ে বাইতুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হলেন। কুরাইশরা এই খবর পেয়ে হকপন্থীদের বাধাদানের সংকল্প

www.bjilibrary.com

ব্যক্ত করলো এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে দু'শ' সওয়ার সমেত মুসলমানদের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সামনে প্রেরণ করলো। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর ২০জন জানবাজ সমেত এই বাহিনীর মুকাবিলা এবং তাদের অগ্রযাত্রায় বাধাপ্রদান করলেন। ইত্যবসরে সারওয়ারে আলম (সা) রাস্তা পরিবর্তন করে হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কুরাইশদেরকে এই মর্মে পয়গাম প্রেরণ করলেন যে, আমরা শুধুমাত্র ওমরাহ করার জন্য এসেছি। যুদ্ধের জন্য আসিনি। মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী সন্ধি করে নেয়াটাই উচিত হবে। কিন্তু কুরাইশরা বাধাদানের ব্যাপারেই অটল রইলো। অবশেষে হুজুর (সা) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনকে (রা) সন্ধির ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের জন্য কুরাইশের নিকট প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় আটকে রাখলেন। তাতে মুসলমানদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল এবং এ ব্যাপারে কেউ কেউ ঘৃতাহুতি ছিল। তারা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমানকে (রা) শহীদ করে ফেলেছে। এই গুজব শুনে মুসলমানরা ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন। এ সময় বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। তাতে ১৪শ' সাহাবী (রা) হুজুরের (সা) পবিত্র হাতে লড়াই করে মৃত্যুবরণ এবং হযরত ওসমানের (রা) হত্যার বদলা নেয়ার বাইয়াত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা হক পথের এসব জানবাজকে প্রকাশ্য বাক্যে নিজের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। এই ভাগ্যবান জওয়ান মরদদের মধ্যে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরও শামিল ছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর সেই দশ হাজার পবিত্র আত্মার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যারা মক্কা বিজয়ের সময় মহানবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন। অতপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে বীরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তায়েফের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরকে বনু সুলাইম ও বনু মুযনিয়ার কাছ থেকে সাদকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। এই দায়িত্ব পালন শেষে ফিরে এলে হুজুর (সা) একই কাজের জন্য তাঁকে বনু মুসতালিকের নিকট প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি ১০দিন অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি সাদকাও আদায় করলেন এবং লোকদেরকে কুরআনে হাকিম ও শরীয়াতের আহকামও তালিম দিলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরের সঙ্গে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলেন এবং হুজুরের (সা) ইকতিদাতে এশার নামায পড়লেন। বেশ দেরী করে বাড়ী ফিরলেন। গভীর অন্ধকার রাত ছিল। উভয়ের হাতেই ছিল লাঠি।

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর (সা) সান্নিধ্য থেকে যখন রুখসত হলেন তখন একজনের লাঠি আলোকোজ্জল হয়ে গেল। তার আলোতেই চলতে লাগলেন। যখন উভয়ের রাস্তা পৃথক হয়ে গেল তখন উভয়ের লাঠিই আলোকিত হয়ে উঠলো। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, এটা ছিল বিশ্বনবীর (সা) মু'জিযা এবং এই দুই বুজর্গের কারামত।

জাতুর রুকার যুদ্ধের (সপ্তম হিজরী) সময়কার ঘটনা। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর ও হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসির রাতে হুজুরের (সা) অবস্থানস্থলের পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। দু'জনে পরস্পরে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একজন রাতের প্রথমার্ধ এবং অপরজন দ্বিতীয়ার্ধ পাহারা দেবেন। সিদ্ধান্ত মুতাবেক প্রথমার্ধের পালা এলো হযরত আবাদের (রা) ওপর। তিনি নামাযের নিয়ত বেঁধে সূরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত শুরু করলেন এবং হযরত আম্মার (রা) ঘুমিয়ে গেলেন। ইত্যবসরে জনৈক কাফের হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরকে তীর মারলো। তীরের আঘাতে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। তারপর একের পর এক আরো দু'টো তীর লাগলো। তা সত্ত্বেও তিনি নামায ছাড়লেন না। তবে রক্ত যখন বেশী বইতে লাগলো তখন তিনি সালাম ফিরিয়ে আম্মাররকে (রা) ঘুম থেকে জাগালেন। হযরত আম্মার (রা) বললেন, আল্লাহর বান্দাহ ! তুমি আমাকে প্রথম তীরের পরই জাগিয়ে দিতে। হযরত আবাদ (রা) বললেন, আমি সূরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম। মন চায়নি তা বন্ধ করে দেই।

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বছরটা ছিল অনাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড গরমের। তা সত্ত্বেও ৩০ হাজার জানবাজ হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন এবং অত্যন্ত প্রফুল্লমুখে উপবাস, পিপাসা, গরম এবং দীর্ঘ কঠিন সফরের কষ্ট স্বীকার করলেন। আল্লাহর এই পবিত্র বান্দাহদের মধ্যে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরও শামিল ছিলেন। তাঁর প্রতি মহানবীর (সা) এত আস্থা ছিল যে, তাঁকে সকল পাহারাদারের অফিসার নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত তিনি রাতের বেলায় সকল সৈন্যের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাদের হিফাজত করতেন।

একাদশ হিজরীতে রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা এবং মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের কারণে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তুলনাহীন সাহস ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করলেন এবং মুরতাদদের সামনে নত হওয়া অথবা তাদের কোন রকম প্রশ্রয়দানে স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি মুরতাদদের নির্মূল করার জন্য ১১টি বাহিনী সাজালেন এবং

www.bjilibrary.com

যথোপযুক্ত হেদায়াতসহ তাদেরকে বিভিন্ন দিকে রওয়ানা করে দিলেন। ইসলামের মুজাহিদরা কিছুদিনের মধ্যেই মুরতাদদের মুরোদ খতম করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে। ইসলামী বাহিনীতে হযরত আবাদও (রা) শামিল ছিলেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে তিনি জীবন হাতের উপর রেখে লড়াই করেছিলেন এবং মুরতাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। অবশেষে বহু-সংখ্যক মুরতাদ তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং তাঁর উপর তীর, তরবারী ও বর্শার তুফান বইয়ে দেয়। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত হযরত আবাদ (রা) হাত থেকে তরবারী ছাড়েননি এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। শাহাদাতকালে কোন সন্তান রেখে যাননি। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁকে আনসারের তিন উত্তম ব্যক্তির মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য করতেন। অপর দু'জন হলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ ও হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের।

হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলামে অগ্রগমন, দ্বীনের প্রতি খুলুসিয়ত, ত্যাগের আবেগ, রাসূল প্রেম, দিয়ানত ও আমানত, জিহাদের আকাংখা এবং ইবাদাত প্রিয়তা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। ফরযসমূহ আদায়ের সাথে সাথে লোকদেরকে কুরআন ও শরীয়াতের শিক্ষা প্রদান, সারা রাত জেগে জেগে বিশ্বনবী (সা) ও অন্যান্য মুসলমানকে হিফাজত করা অথবা আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকা অতপর দিনের বেলায় জিহাদে শরীক হওয়ার মত গুণাবলী তার ছিল। এ ধরনের গুণ খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখার আনসারী

হযরত আবু আবদুল্লাহ্ জাব্বার (রা) বিন সাখার খাজরাজের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

জাব্বার (রা) বিন সাখার বিন উমাইয়াতা বিন খানিস বিন সানান বিন উবায়েদ বিন আদি বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ্।

মাতার নাম সায়াদ বিনতে সালমা। তিনি ছিলেন খাজরাজের শাখা জাশাম বিন খাজরাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত জাব্বারের (রা) পিতা সাখার বিন উমাইয়াও সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীর একজন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বদরের সাহাবীদের যে তালিকা প্রদান করেছেন তাতে সাখার বিন উমাইয়ার নাম নেই। কেউ কেউ তো তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে কথাও বলেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত জাব্বারকে (রা) সুন্দর স্বভাব এবং চরিত্র প্রদান করেছিলেন। মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই দাওয়াতে হক-এর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গমন পূর্বক বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হিজরতের পর বিশ্বনবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত জাব্বারকে (রা) হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদের ভাই বানিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে হযরত জাব্বার (রা) বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সংঘটিত সকল যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

খায়বার বিজয়ের পর বিশ্বনবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে সেখানে ফলের পরিমাপ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মাওতার যুদ্ধে শহীদ হন। এ সময় হুজুর (সা) এই দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখারের উপর এবং তিনি তা বছরের পর বছর ধরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, বিশ্বনবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জমা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে সাহাবীদেরকে (রা) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ইছাবা গিয়ে পানির বন্দোবস্ত করুক। হযরত জাব্বার (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যাই। সুতরাং তিনি সেখানে পৌঁছে

www.bjilibrary.com

এদিক-ওদিক থেকে পাথর একত্রিত করে হাউজ বানালেন এবং তাতে নিকটবর্তী চশমা অথবা কূপ থেকে পানি ভরলেন। কাজ শেষ হলে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) সেখানে পৌছে বললেন, হে হাউজের মালিক ! তোমার হাউজ থেকে উটকে পানি পান করানোর অনুমতি আছে কি ? হযরত জাব্বার (রা) হুজুরের (সা) আওয়াজ চিনতে পেরে আরজ করলেন ঃ অবশ্যই আছে, হুজুর (সা) উটকে পানি পান করালেন এবং তাকে বসিয়ে ওজু করতে চাইলেন। হযরত জাব্বার (রা) হুজুরকে (সা) ওজু করালেন এবং হুজুরের (সা) বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মহানবী (সা) তাঁর হাত ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং নামায আদায় করলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেও খায়বারের ফল পরিমাপের দায়িত্ব নিয়ম মত তাঁর উপরই অর্পিত ছিল। উপরন্তু হিসাব-কিতাবের পদটিও তাঁর নিকটই ছিল।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে খায়বারের ইহুদীরা পুনরায় ফিতনা শুরু করলো এবং নিত্য-নতুন অপকর্ম চালাতে লাগলো। খায়বারে অবস্থানকারী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমরকে (রা) তারা ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল। তাতে তিনি আহত হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁদের অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত হলেন। এ সময় তিনি সাধারণ্যে দাঁড়িয়ে এসব কর্মের কথা বর্ণনা করলেন এবং ইহুদীদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। অতপর কিছু মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপদানের জন্য খায়বার তাশরীফ নিলেন। হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখারও এই সফরে হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গী ছিলেন।

হযরত জাব্বার (রা) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ৩০ হিজরীতে ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬০ বছর। মুসনাদে আহমদে তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও রয়েছে।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখার হিসাব-কিতাবে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্পর্কে কোন পুস্তকে কিছু পাওয়া যায়নি।

---

www.bjilibrary.com

হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ আনসারী

বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেকার কথা। একদিন খুব ভোরে মদীনা মুনাওয়ারার এক যুবক আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে হঠাৎ করে রহমতে আলম (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে গেলো। ভাগ্যবান যুবক বিশ্বনবীকে (সা) অত্যন্ত আদবের সাথে সালাম করলো এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলো। হুজুর (সা) অত্যন্ত প্রফুল্ল মুখে তার সালামের জবাব দিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"বলতো ভাই, তোমার দিন-রাত কেমন কাটছে।" যুবকটি আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। রাতে আল্লাহকে স্মরণ করে করে কাটাই এবং দিনে রোযা রাখি। ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থা হলো নিজকে আরশের দিকে উড়ন্ত বলে অনুভব করছি। জান্নাত ও দোযখ আমার সামনে পরিদৃশ্য হচ্ছে এবং লোকদেরকে তাতে দলে দলে যোগদান করতে দেখতে পাচ্ছি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ তা'য়ালা যে বান্দাহর অন্তর আলোকিত করে দেন ; সে পুনরায় আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

যুবকটির চেহারা প্রথম থেকেই সৌভাগ্যের আলোয় চমকিত ছিল। দয়ার নবীর (সা) ইরশাদ শুনে চেহারা আরো ঝলমল করে উঠলো। তিনি অযাচিতভাবে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে শাহাদাত নসিব করেন।"

হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ পবিত্র হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে যুবকটির আশা পূরণের জন্য দোয়া করলেন।

এই রাত জাগরণকারী এবং স্থায়ী রোযা পালনকারী সালেহ যুবক, যে নিজের জীবন হক পথে কুরবানী করার জন্য এত আকাংখিত ও অস্থির ছিলেন যে, স্বয়ং মহানবীকে (সা) দিয়ে নিজের শাহাদাতের দোয়া করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধে আনসারের সর্বপ্রথম শহীদ হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ আনসারী।

হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু নাজ্জারের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

www.bjilibrary.com

হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ বিন হারিছ বিন আদি বিন মালিক বিন আদি বিন আমের বিন গানাম বিন নাজ্জার। মাতার নাম ছিল রুবায়্যি (রা) বিনতে নযর। তিনি খাদিমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের আপন ফুফু, ওহোদের শহীদ হযরত আনাস (রা) বিন নযরের সহোদরা এবং নিজেও জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। ভাই-বোনের মধ্যে সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। সহীহ বুখারীতে আছে, একবার হযরত রুবায়্যি (রা)-এর হাতে এক আনসারী বালিকার দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার পরিবারের লোকেরা কিসাস দাবী করে বসলো। বিশ্বনবী (সা) তাদের দাবীর পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কেননা দাঁতের বদলে দাঁত কানের বদলে কান এবং জানের বদলে জানই হলো আল্লাহর বিধান। হাঁ, আঘাতপ্রাপ্ত অথবা নিহতদের উত্তরাধিকাররা যদি রক্তের (দিয়্যত) বদলা নিতে সম্মত হয় তাহলে কিসাস পরিবর্তিত হয়ে যায়।

হযরত আনাস (রা) বিন নযরও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানলেন যে, তার প্রিয় বোনের দাঁতও ভেঙ্গে ফেলা হবে। ভালোবাসার আবেগে তখন তাঁকে অস্থির করে ফেললো এবং অযাচিতভাবে নবীর (সা) দরবারে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম, রুবায়্যির দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।" হুজুর (সা) বললেন, "ভাই, এটাই আল্লাহর নির্দেশ।"

আল্লাহর কুদরত ! আঘাতপ্রাপ্ত বালিকার পরিবারের লোকেরা হযরত আনাসের (রা) ভালোবাসার আবেগ দেখে খুব প্রভাবিত হলেন এবং দিয়্যত গ্রহণে সম্মত হয়ে গেলেন। এমনিভাবে হযরত রুবায়্যি (রা) কিসাস থেকে বেঁচে গেলেন। এ সময় হুজুর (সা) বললেন, আল্লাহর এমনো কিছু বান্দাহ আছেন, যারা কোন ব্যাপারে কসম খেয়ে বসলে আল্লাহ তাদের কসম পূরণ করে দেন।

হযরত রুবায়্যির (রা) বিয়ে হয়েছিল সুরাকাহ বিন হারিছের সঙ্গে। তাঁরই ঔরষে হযরত হারিছাহ (রা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুরাকাহ মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে মারা গিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। অবশ্য হযরত রুবায়্যি (রা) এবং হারিছাহ (রা) উভয়েই স্ববংশের (বনু নাজ্জার) অন্য অনেক লোকের সঙ্গে নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে অথবা হিজরতের অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে হযরত হারিছার (রা) লালন-পালন করেন এবং তাকে পিতার কমতি অনুভব হতে দেননি। হযরত হারিছাহ (রা) বিষয়টি খুব ভালোভাবেই অনুভব করতেন। সুতরাং তিনি মায়ের অত্যন্ত অনুগত ও খিদমত গুজার ছিলেন এবং তাঁর খুশীকে নিজের খুশীর উপর সবসময় অগ্রাধিকার

www.bjilibrary.com

দিতেন। আর এ কারণেই মা'ও তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এবং সবসময় ভাগ্যবান পুত্রের কল্যাণে দোয়া করতেন। তাঁর দোয়ার ফলশ্রুতিতেই পূর্ণ যৌবনকালেই হারিছাহ (রা) দুনিয়ার সকল সাধ-আহলাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করেন যে, আল্লাহ পাক তাকে কবুল করেন। আল্লাহ তাঁর চোখের সামনে থেকে অনেক পর্দা তুলে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখতে পেতেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলমের (সা) তিনশ' তেরজন জাননিছারসহ বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। আল্লাহর এসব পবিত্র দেহ সম্পন্ন বান্দাদের মধ্যে হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহও শামিল ছিলেন। এই অল্প সংখ্যক মানুষের একটি দল শুধুমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা করে কাফেরদের ভীতিপ্রদ তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছিলেন। তাদের সাজ-সরঞ্জামের অবস্থা ছিল আরো করুন। সমগ্র বাহিনীর নিকট ছিল মাত্র দু'টো ঘোড়া এবং ৭০টি উট। এই দুই ঘোড়ার মধ্যে একটিতে সওয়ার ছিলেন হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ। হুজুর (সা) তাঁকে সেনাবাহিনী পাহারাদারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে হাউজের পানি পান করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক এমনি মুহূর্তে হাব্বান ইবনুল আরকা নামক এক মুশরিক তাক করে একটি তীর তাঁর দিকে মারলো। এই তীর তাঁর গলায় বিঁধে গেলো এবং এই ব্যথাতেই তাঁর পবিত্র রুহ জান্নাতুল ফেরদাউসে গিয়ে উপস্থিত হলো। এমনিভাবে হযরত হারিছার (রা) অন্তরের আকাংখা পূরণ হয়ে গেল। আর হবেই বা না কেন। এ জন্য তো মহানবীই (সা) দোয়া করেছিলেন।

হযরত হারিছার (রা) শাহাদাতের খবর মদীনায় পৌছলে হযরত রুবায়্যি (রা) নিজের সৌভাগবান সন্তানের স্থায়ী বিচ্ছিন্নতার জন্য খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ পর্যায়ের ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সা) তাশরীফ না আনবেন এবং আমি তাঁর নিকট থেকে ঘটনার বিবরণ জেনে না নেবো ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই কান্নাকাটি বা আহ-উহ করবো না।

বিশ্বনবী (সা) বদরের ময়দান থেকে ফিরে এলেন। হযরত রুবায়্যি (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল। হারিছাহ (রা) আমার অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয় সন্তান ছিল। তার বিচ্ছিন্নতার যে দুঃখ আমার অন্তরে রয়েছে তা আপনি ভালোভাবেই জানেন। আমি তাঁর দুঃখে কান্নাকাটি করতে চেয়েছিলাম। তবুও আমি মনে মনে বলেছি যে, হারিছাহ (রা) এখন কেমন আছে তা রাসূলের (সা) নিকট

www.bjilibrary.com

থেকে না জেনে তা করবো না। যদি সে জান্নাতে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি কান্নাকাটি করবো না এবং ধৈর্যধারণ করবো। আর যদি জাহান্নামে থাকে তাহলে বুক ফাটিয়ে মাথার চুল ছিড়ে কান্নাকাটি করে জীবন ধ্বংস কিভাবে করতে হয় তা দেখতে পাবেন।"

রহমতে আলম (সা) বললেন, "তুমি কি বলছো। জান্নাততো একটা নয়, অসংখ্য। তার মধ্যে একটি হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এবং অবশ্যই হারিছাহ (রা) সেই জান্নাতেই রয়েছে।"

হুজুরের (সা) মুবারক ইরশাদ শুনে হযরত রুবিয়্যা (রা) খুব খুশী হয়ে গেলেন। তারপর তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এখন আমি আর হারিছার (সা) জন্য কাঁদবো না।"

অধিকাংশ চরিতকার লিখেছেন, হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ বদরের যুদ্ধে আনসারের সর্বপ্রথম শহীদ। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত হারিছার (রা) বয়স ১৩-১৪ বছর ছিল। সে সময় তার উপর জিহাদ ফরয ছিল না। তিনি শুধু যুদ্ধের তামাশা দেখার জন্য বদরের ময়দানে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে শহীদ হয়ে যান। এসব কথার সত্যতার ব্যাপারে আমাদের কথা আছে। কেননা বেশীর ভাগ চরিতকার তাঁকে বদরের শহীদদের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্থান দিয়েছেন।

বাস্তবত ১৩-১৪ বছরের একজন বালকের কাছ থেকে অবশ্যই এটা আশা করা যায় না যে, সে শুধুমাত্র যুদ্ধের তামাশা দেখার জন্য বাড়ী থেকে ৮০ মাইল দূরে যাবে। সহীহ কথা এটাই যে, বদরের যুদ্ধের আগেই হযরত হারিছাহ (রা) শুধুমাত্র বয়প্রাপ্তই হননি বরং নবীর (সা) প্রচুর ফয়েজও লাভ করেছিলেন এবং ইবাদাতের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণে আল্লাহর নৈকট্যও লাভ করেছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) সন্তুষ্টি এবং অনুমতিক্রমেই বদরের ময়দানে তাশরীফ নেন ও সেখানেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান লাভ করেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর আনসারী

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে (অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে) রহমতে আলম (সা) খায়বারের যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন। এ সময় খায়বারের ইহুদীরা অবরুদ্ধ হয়ে নিজেদের দুর্গে বসে পড়লো। অবরোধকালে একদিন মহানবী (সা) দেখলেন যে, ইহুদীদের অনেক ছাগল একটি দুর্গে প্রবেশ করছে। তিনি (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আজ কে আমাকে এই বকরীর গোশত খাওয়াবে।" রাসূলের (সা) বেঁটে আকৃতির একজন সাহাবী (রা) উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক ; আমি এ কাজ করবো।"

একথা বলেই তিনি তীরের গতিবেগে বকরীদের দিকে ধাবিত হলো। তিনি এ ব্যাপারে কোন পরওয়া করলেন না যে, অবরুদ্ধ দুশমনের কোন তীর অথবা পাথর তার জীবনহানি করতে পারে। তিনি দু'টো বকরী ধরলেন এবং তা মহানবীর (সা) কাছে নিয়ে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা) তৎক্ষণাৎ বকরী দু'টো জবেহ করলেন এবং তার গোশত রান্না করে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। বিশ্বনবী (সা) এই সাহাবীর (রা) তৎপরতায় খুব খুশী হলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যিনি মহানবীর (সা) সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে এই কাজ করেছিলেন —তিনি ছিলেন হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর আনসারী।

সাইয়েদেনা আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি খাজরাজের বনু সালমাহ বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের মধ্যে ছিলেন। নসবনামা ঃ

কা'ব (রা) বিন আমর বিন উবাদ বিন আমর বিন সওয়াদ বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ বিন সায়াদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাহ বিন ইয়াযিদ বিন জাশম বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল নসিবাহ বিনতে আযহার এবং তিনিও বনু সালমাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত কা'বকে (রা) সুন্দর স্বভাবদান করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের পর হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগের মর্যাদায় মদীনা মুনাওয়ারাতে তাশরীফ আনলেন এবং মদীনাবাসীদেরকে হকের দিকে আহ্বান জানাতে শুরু করলেন। এ সময় হযরত কা'ব (রা) বিন আমর বনু সালমাহর অন্য কতিপয় সৎচরিত্রের যুবকের সঙ্গে নিশ্চিন্তে ইসলামের ডাকে সাড়া দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছরের মত। পরবর্তী বছর তিনি মদীনার অন্য ৭৪জন হকপন্থীর সঙ্গে মক্কা গমন করেন এবং লাইলাতুল উকবাতে রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁরাই সেই সাহাবী (রা) ছিলেন যারা হুজুরকে (সা) মদীনা তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং নিজের জান-মাল ও সন্তানসহ হুজুরকে (সা) সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পর যখন তারা মদীনা ফিরে গেলন তখন ঈমানের জোশ তাদেরকে চুপ-চাপ বসে থাকতে দিল না এবং তারা অত্যন্ত তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাতিলের মূলোৎপাটন ও হকের প্রচার এবং প্রসারে ব্যাপৃত হয়ে পড়লে। তাদের এই তৎপরতায় আওস ও খাজরাজের ঘরে ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছে গেল।

বাইয়াতে লাইলাতুল উকবার প্রায় চার মাস পর রহমতে আলমও (সা) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন এবং ইসলামের মাদানী যুগের শুরু হলো।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে হযরত কা'ব (রা) বিন আমর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি জীবন হাতে রেখে লড়াই করেছিলেন এবং মক্কার কুরাইশ ঝাণ্ডাবাহী আজীজ বিন উমায়েরের হাত থেকে ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি মুশরিকের এক নেতা মামবাহ বিন হাজ্জাজকেও মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং রাসূলের চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবকে গ্রেফতার করেন। (তিনিও মক্কার কুরাইশের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসেছিলেন।) তিনি যখন হযরত আব্বাসকে (রা) সঙ্গে নিয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন তখন মহানবী (সা) বিস্মিত হলেন যে, এই খর্বাকৃতির মানুষ আব্বাসের মত দীর্ঘদেহী লোককে কি করে গ্রেফতার করলো। সুতরাং তিনি বললেন ঃ

"আব্বাসকে গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ফেরেশতা নিশ্চয়ই আবুল ইয়াসারকে সাহায্য করে থাকবে।"

বদরের যুদ্ধের পর হযরত কা'ব (রা) অন্যান্য সকল যুদ্ধেও মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই জীবন বাজি রেখে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খায়বারের যুদ্ধে তিনি যেভাবে হুজুরের (সা)

www.bjilibrary.com

সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। মহানবীর (সা) ওফাতের পর তাঁর সামরিক তৎপরতার প্রমাণ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে পাওয়া যায়। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, তিনি সিফ্‌ফিন এবং অন্যান্য যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে শামিল হয়ে নিজের তরবারীর নিপুণতা খুব ভালোভাবেই প্রদর্শন করেছিলেন। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর তিনি নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, বৃদ্ধকালে খায়বারের ঘটনা বর্ণনা করে কাঁদতেন এবং লোকদেরকে বলতেন যে, মদীনায় একমাত্র তিনিই জীবিত রয়েছেন ; যিনি রাসূলের (সা) সাহচর্যের ফয়েজ লাভ করেছিলেন। অতএব, আমার জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্বে যারা আমার নিকট থেকে উপকৃত হতে চাও তারা এসো।

হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমরের বয়স যখন ৭০ বছরের কিছু বেশী হয়েছিল তখনই পরপারের ডাক পেলেন এবং তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত হলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে, তিনি বদরের সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষে মারা যান। মৃত্যুকালে আম্মার নামক একটি ছেলে রেখে যান। হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস হাদীসগ্রন্থে পাওয়া যায়। সহীহ্ মুসলিমে মশহুর তাবেয়ী হযরত উবাদাহ (র) বিন ওলিদ থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত কা'ব বিন আমর আমার থেকে দু'টি হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, চোখের ওপর হাত রেখে বলতেন যে এই চোখ এই ঘটনা দেখেছে অতপর কানে হাত রেখে বলতেন যে এই কান রাসূলের (সা) পবিত্র যবান থেকে শুনেছেন।

রাসূলে করীমের (সা) পবিত্র জীবনের প্রতিটি কাজ ছিল হযরত কা'বের (রা) জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা এবং তিনি সেই আলোতেই প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিতেন।

সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, একবার উবাদাহ্ বিন ওলিদ (র) তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে দেখলেন যে তাঁর গোলামের নিকট পুস্তকাদির বোঝা এবং সেও হুবহু হযরত কা'বের (রা) পোশাক পরিধান করে রয়েছে। এই পোশাক দুই ভিন্ন ধরনের কাপড়ের ছিল। উবাদাহ্ আরজ করলেন, আপনারা উভয়েই যদি এক একটি কাপড় একে অপরের সঙ্গে পরিবর্তন করিয়ে নেন তাহলে এক রংয়ের হয়ে তা পূর্ণ জোড়া হয়ে যায়। হযরত কা'ব (রা) একথা শুনে তার মাথায় হাত ঘুরালেন, দোয়া করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গোলামদেরকে তাই খাওয়াও যা নিজে খাও এবং তাই পরাও যা নিজে পরো।" অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে উভয়ের কাপড় সম রং-এর তো হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য সূচীত হয় এবং সাম্যতা দূর হয়। এই পার্থক্য হযরত কা'বের (রা) নিকট অসহনীয় ছিল।

একবার হযরত কা'বের (রা) আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়ে পড়লো এবং অন্য এক সাহাবী হযরত সুমরাহ (রা) বিন রবিয়ার নিকট থেকে কিছু কর্জ বা ঋণ নিলেন। তিনি ঋণ আদায়ের জন্য এলেন। এ সময় হযরত কা'বের (রা) নিকট ঋণ আদায়ের পরিমাণ অর্থ ছিল না। লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য এদিক-ওদিক চলে গেলেন। হযরত সুমরাহ (রা) ফিরে যেতে লাগলেন। তখন হযরত কাবের (রা) সামনাসামনি হয়ে গেলেন। ঋণের অর্থ চাওয়ার পূর্বেই হযরত কা'ব (রা) বললেন, "সুমরাহ (রা) তুমি কি রাসূল (সা) থেকে শোনোনি যে, যে ব্যক্তি গরীবকে মুহলত বা সময় দেবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিজের ছায়ায় নিয়ে নিবেন?" তিনি বললেন ঃ "অবশ্যই আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি একথা রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনেছি।" অতপর ঋণ আদায় ছাড়াই তিনি ফিরে গেলেন।—(আল ইসাবাহ ইবনে হাজর)

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" লিখেছেন, হযরত আবুল ইয়াসার এক ব্যক্তির কাছে ঋণের অর্থ পেতো। অর্থের তাগাদার জন্য তিনি তার বাড়ী গেলেন। তখন সেই ব্যক্তি দাসীকে বললো যে, বলে দাও, বাড়ী নেই। হযরত আবুল ইয়াসার (রা) তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ডেকে চেঁচিয়ে বললেন, বেরিয়ে এসো। আমি তোমার আওয়াজ শুনে ফেলেছি। সে বাইরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমনটি কেন করলে? সে বললো, দারিদ্রতায় বাধ্য হয়ে। তিনি বললেন, যাও আমি তোমার ঋণ মাফ করে দিলাম। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি গরীবকে সময় দেয় অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর ছায়ায় থাকবে।

সহীহ মুসলিমে এ ধরনের ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ বনু হারামের এক ব্যক্তি হযরত আবুল ইয়াসারের নিকট থেকে ঋণ নিয়েছিল। ঋণ আদায়ের জন্য তিনি তার বাড়ী গেলেন। বাড়ী গিয়ে জানতে পেলেন যে, সে বাড়ী নেই। ইত্যবসরে তার ছোট ছেলে বাইরে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাপ কোথায়? সে বালকসুলভ স্পষ্ট ভাষায় বললো, মা'র চৌকির নীচে লুকিয়ে বসে আছে। হযরত আবুল ইয়াসার (রা) ডেকে বললেন, বাইরে বের হয়ে এসো। তুমি কোথায় আছ তা আমি জেনে ফেলেছি। সে বাইরে এলো এবং নিজের দারিদ্রতার অবস্থা শুনালো। হযরত আবুল ইয়াসার (রা) তৎক্ষণাৎ ঋণপত্র চেয়ে নিয়ে তার সকল লিখা মুছে দিলেন এবং বললেন ঃ

"যদি সামর্থ হয় তাহলে আদায় করো। অন্যথা আমি মাফ করে দিলাম।"

www.bjilibrary.com

হযরত মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ্ আনসারী

হযরত মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ আনসারী আওস গোত্রের শাখা বনু হারিছের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামা তাঁর সহোদর ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ বিন সালমাহ্ বিন খালিদ বিন আদি বিন মাজদায়াহ বিন হারিছাহ্ বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়ের কথা লিখেননি কিন্তু কিয়াস হলো যে, নবীর (সা) হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে তিনি ঈমান এনেছিলেন। কেননা তাঁর সহোদর হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাহ্ সে সময়েই হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগের ফলশ্রুতিতে মুসলমান হয়েছিলেন।

হযরত মাহমুদ (রা) সর্বপ্রথম ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন। তারপর খন্দকের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ৬ষ্ট হিজরীতে তিনি হুদাইবিয়াতে বাইয়াতে রিদওয়ানের সম্মান লাভ করেছিলেন। তারপর মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হয়ে খায়বারের যুদ্ধে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং সেই যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং অটলতার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধকালে একদিন লড়াইয়ের ভয়াবহতায় এবং অস্ত্রের বোঝায় ক্লান্ত হয়ে নাযেম প্রাচীরের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য বসে পড়লেন। জনৈক ইহুদী (কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী কিনানা বিন আবিল হুকাইক অথবা মারহাব) একটি ভারি পাথর তার মাথায় নিক্ষেপ করলো। তাতে তিনি গুরুতর আহত হলেন এবং কপালের চামড়া মুখের উপর এসে পড়লো। লোকজন ধরাধরি করে হুজুরের (সা) খিদমতে নিয়ে গেলো। মহানবীর (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে চামড়া যথাস্থানে নিয়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাহ্ তাঁর অবস্থা দেখে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। হুজুর (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ তোমার ভাইয়ের উপর পাথর নিক্ষেপকারী আগামীকাল মৃত্যুর দরজায় পৌছে যাবে। মহানবীর (সা) পবিত্র যবান দিয়ে নিঃসৃত কথা পরবর্তী দিন পূর্ণ হলো। হযরত মাহমুদের (রা) উপর পাথর নিক্ষেপকারী ইহুদী পরের দিন মারা গেলো। হযরত মাহমুদও (রা) আহত হওয়ার তিনদিন পর জান্নাতুল ফেরদাউসের পথে রওয়ানা দিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী

বদরের যুদ্ধের দিন যখন হকের ঝাণ্ডাবাহী এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তির পূজারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধাস্ত্রের ঝনঝনানি শুরুর পূর্বে বিশ্বনবী (সা) নিজের আনসারী জাননিছারের প্রতি সম্বোধন করে বললেন ঃ "তুমি দুশমনের সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করবে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! যখন দুশমন ২শ' গজ দূরত্বে থাকবে তখন আমরা তাদের ওপর তীর বর্ষণ করবো। যখন তারা সামনে অগ্রসর হয়ে বর্শার আওতায় আসবে তখন আমরা বর্শা দিয়ে লড়াই করবো এবং যখন আরো সামনে আসবে তখন আমরা তরবারী দিয়ে তাদের মুকাবিলা করবো।"

তাঁর জবাব শুনে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারায় প্রফুল্লতা ছেয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ "হাঁ, যুদ্ধের এটাই সঠিক পদ্ধতি। তোমরা এভাবেই যুদ্ধ করবে।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যার বর্ণিত যুদ্ধ পদ্ধতি স্বয়ং মহানবী (সা) অনুমোদন করেছিলেন—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত আবু সালমান আসেম (রা) বিন ছাবিত মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। আনসারের আওস কবিলার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আসেম (রা) বিন ছাবিত বিন আবি আফলাহ্ কায়েস বিন আসমাতা বিন নুমান বিন মালিক বিন আমাতাহ বিন দাবয়িআহ্ বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমার বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আসেমকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলে যখন ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো তখন হযরত আসেমও (রা) নির্দ্বিধায় দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিলেন। এভাবে নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই তিনি মহান নিয়ামত ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যেদিন রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন সেদিন ছিল হযরত আসেমের (রা) জীবনের সবচেয়ে বড় খুশীর দিন। তিনি

www.bjilibrary.com

নিজের কুরবানীর আবেগ, ঈমানের জোশ এবং পবিত্র চরিত্রের বদৌলতে অনতিবিলম্বে রাসূলের (সা) দরবারের নৈকট্যলাভ করে ফেললেন। তিনি তীরান্দাজী, নেযাবাজী এবং তরবারী পরিচালনায় পূর্ণ মাত্রায় নিপুণতা রাখতেন এবং অন্যতম বীর আনসার হিসেবে পরিগণিত হতেন। সুতরাং বদরের যুদ্ধের দিন তিনি যখন রাসূলের (সা) প্রশ্নের জবাবে যুদ্ধের পদ্ধতি বর্ণনা করলেন তখন এক বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (সা) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "যারা লড়াই করতে চায়, তারা যেন আসেমের মত যুদ্ধ করে।"

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আসেম (রা) এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করলেন যে, জানবাজীর হক আদায় করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলেন। মক্কার কুরাইশদের ৭০জন নিহত এবং অপর ৭০জন মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। এই বন্দীদের মধ্যে দ্বীনের মশহুর দুশমন উকবাহ বিন আবি মুয়িতও ছিলেন। এই ব্যক্তি মক্কায় রহমতে আলমকে (সা) উত্যক্ত করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি। এই সেই কুলাঙ্গার যে একদিন প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র পিঠের উপর মসজিদে হারামে নামাযে সিজদারত অবস্থায় উটের অপবিত্র নাড়িভুড়ি রেখে দিয়েছিল। যুদ্ধের পর হুজুর (সা) বদর থেকে রওয়ানা হয়ে সাফরা নামক স্থানে পৌছে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিতকে উকবাহ বিন আবি মুয়িতকে কবর ভূমিতে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইবনে জারির তাবারি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসেম (রা) যখন তাকে হত্যার জন্য অগ্রসর হলেন, তখন সে চেঁচিয়ে বললো ঃ "মুহাম্মাদ ! আমার সন্তানদের জামিন কে হবে ?"

মহানবী (সা) বললেন ঃ "জাহান্নাম।" জাহান্নাম শব্দ থেকে মহানবী (সা) এই অর্থই প্রকাশ করেছিলেন যে, স্বয়ং তুমি তো জাহান্নামে যাবে। পরে তোমার সন্তানদের তকদিরে যে হাশর রয়েছে তা অবশ্যই হবে।

হযরত আসেম (রা) তরবারীর এক আঘাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধেও হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত জীবন হাতে রেখে লড়াই করলেন। এই যুদ্ধে তিনি সেইসব বিশেষ মহান সন্তানদের মধ্যে ছিলেন যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অটল থেকে লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধের সময় কুরাইশের একজন নামকরা যোদ্ধা মাসাফি বিন তালহা বিন আবি তালহা ঝাণ্ডা উঁচু করে হুংকার দিয়ে ময়দানে এলো। হযরত আছিমের (রা) নযর তার উপর পড়লো। তিনি তার উপর তীর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "এই নাও, আমি হলাম ইবনে

www.bjilibrary.com

আবিল আফলাহ।" তীর তার উপর কার্যকর হলো না। তিনি অগ্রসর হয়ে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে মাটি ও রক্তে মিশিয়ে দিলেন। মাসাফির পর তার ভাই হারিছ বিন তালহা বিন আবি তালহা গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলো। হযরত আসেম (রা) তাকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। এক বর্ণনায় আছে উভয়ের মা সালাফাহও মক্কা থেকে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিল। মাসাফির ধড়ে তখনো জীবন বায়ু অবশিষ্ট ছিল। তাকে উঠিয়ে সালাফাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। সে পুত্রকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "পুত্র, তোমাকে কে মেরেছে ?" সে বললো, "আমার হত্যাকারী তীর চালনার সময় বলেছিল আমি হলাম ইবনে আবিল আফলাহ।" একথা শুনে সালাফাহ মানত মানলো যে, আমি ইবনে আবিল ফালাহর মাথার খুলিতে শরাব পান করবো এবং যে ব্যক্তি তার মাথা কেটে আনবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেব। ওহোদের যুদ্ধের পর যেন হযরত আসেম (রা) মক্কার মুশরিকদের চোখে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো। এই যুদ্ধে যদিও মুসলমানদের মারাত্মক জীবনহানি ঘটেছিল ; কিন্তু তাদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। এজন্য মুশরিকরা মদীনার উপর হামলা করার সাহস পেলো না এবং তারা মুসলমানদের ব্যাপক জীবনহানি ঘটানোকেই গনীমত মনে করে ওহোদের ময়দান থেকে মক্কা রওয়ান হয়ে গেল। পরবর্তী দিন বিশ্বনবী (সা) নিজের জাননিছারদের সঙ্গে নিয়ে "হামরাউল আসাদ" নামক স্থান পর্যন্ত কুরাইশ বাহিনীর পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু তারা কোন মতে বেঁচে গেল। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মক্কার কাফেরদের নামকরা কবি আবু আযযাহ আমর বিন আবদুল্লাহ ঘটনাক্রমে পিছে পড়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করলো। এই ব্যক্তি বনু জামুহ-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং নিজের কবিতায় ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় দুর্নাম করতো। বদরের যুদ্ধেও সে মুশকিরদের সঙ্গে এসেছিলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। যখন তাকে ফিদিয়াদানের কথা বলা হলো, তখন সে নিজের দারিদ্রতার ওজর পেশ করলো এবং তার পাঁচটি মেয়ে থাকার কথা বললো। ভবিষ্যতে কখনো সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ নেবে না এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহানবী (সা) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ওহোদের যুদ্ধের সময় সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এখানে গ্রেফতার হয়ে প্রিয় নবীর (সা) সামনে এলো। সে খুব কাঁদলো এবং জীবন ভিক্ষার দরখাস্ত করলো। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) বললেন ঃ "মু'মিনকে এক ছিদ্র পথ দিয়ে দু'বার দংশন করা যায় না। তুমি মক্কা ফিরে গিয়ে হিজর নামক স্থানে বসে এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে এবং মোচে তা দিয়ে বলবে যে আমি মুহাম্মাদকে (সা) দ্বিতীয়বার ধোঁকা দিয়েছি। এটা হতে পারে না।" তারপর তিনি হযরত আসেমকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, তার গর্দান উড়িয়ে দাও। তিনি দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ তার মাথা উড়িয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'রাজি' নামক স্থানে এক মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হলো। এই মর্মান্তিক ঘটনার পটভূমি কি ছিল ? এই ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় জানা যায়, ওহোদের যুদ্ধের পর বনু হাযিলের সরদার সুফিয়ান বিন খালিদ একটি হীন ষড়যন্ত্র আঁটে। সে কতিপয় ব্যক্তিকে মদীনা মুনাওয়ারায় হুজুরের (সা) খিদমতে প্রেরণ করে। তারা সুফিয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী মহানবীর (সা) নিকট একটি নিবেদন পেশ করে। এই নিবেদনে তারা কতিপয় মুসলমানকে ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে তাদের কবিলায় প্রেরণের অনুরোধ জানায়। হুজুর (সা) তাদের নিবেদন বা দরখাস্ত কবুল করলেন এবং কতিপয় ইসলামের মুবাল্লিগকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়, ওহোদের যুদ্ধে নিহত তালহা বিন আবি তালহার স্ত্রী এবং নিহত মাসাফি ও হারিছের মা সালাফাহ বিনতে সায়াদ সুফিয়ান বিন খালিদ হাযলীকে কোন বাহানায় মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে কতিপয় মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আশার জন্য প্ররোচনা দিল। তাদের মধ্যে যাতে আসেম বিন ছাবিত বিন আবিল আফলাহও থাকে সে ব্যবস্থাও করতে বললো। কারণ, আসেম বিন ছাবিত এলে তাকে হত্যা করে নিজের স্বামী ও পুত্রদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে। এর বিনিময়ে সে সুফিয়ানকে একশ' উট এনাম দিবে। সঙ্গে সঙ্গে এই কসমও খেলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিশোধ আগুন ঠাণ্ডা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাথায় তেল দেবে না এবং বিছানায় শয়ন করবে না। সুফিয়ান বিন খালিদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো যে, সে যা চায় তা অবশ্যই করা হবে। সুতরাং সে কতিপয় ব্যক্তিকে মদীনা পাঠালো। তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করলো এবং কিছুদিন মুসলমানদের মেহমান হয়ে ইসলামের তালিম গ্রহণ করলো। তারপর তারা রহমতে আলমের (সা) নিকট তাদের সঙ্গে কতিপয় সাহাবী (রা) প্রেরণের দরখাস্ত পেশ করলো। এসব সাহাবী (রা) তাদের ও তাদের কবিলার অন্যান্য সদস্যকে ইসলামের আহকাম এবং আকায়েদ শিক্ষা দেবে—এই মর্মে তারা দরখাস্তে উল্লেখ করেছিল। হুজুর (সা) তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং দশজন সাহাবী (রা) সমন্বয়ে গঠিত একটি দল তাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। (এই বর্ণনা সহীহ বুখারীর বর্ণনা। অন্যান্য চরিতকার এই দলে অন্তর্ভুক্ত সাহাবীর সংখ্যা ৬ বলে উল্লেখ করেছেন।) এই দলের নেতা কাকে বানিয়েছিলেন ? এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। এক মতে নেতা হয়েছিলেন হযরত মুরছাদ (রা) বিন আবি মুরছাদ গুনুবী। অপর মতে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিতকে নেতা নিয়োগ করা হয়েছিল। এই দল যখন (মক্কা ও আসফানের মধ্যবর্তী হাদ্দাহ থেকে সাত ক্রোশ দূরে) 'রাজি' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন গাদ্দাররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো এবং নিজেদের কবিলাসমূহের (বনু লাহইয়ান, আদল এবং কারাহ) মধ্য থেকে একশ' (অন্য

বর্ণনা অনুযায়ী দু'শ') সশস্ত্র ব্যক্তিকে ডেকে আনলো। হযরত আসেম (রা) নিজের তীক্ষ্ণ অন্তর্বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তাদের নিয়ত ভালো নয়। তারা তাদেরকে হত্যা অথবা গ্রেফতার করতে চায়। তা সত্ত্বেও তাঁরা সাহস ও ধৈর্য হারা হলেন না এবং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে একটি পাহাড়ে উঠে পড়লেন। মুশরিকরা পাহাড়ের চারপাশে ঘিরে নিল এবং মুসলমানদের আশ্রয়দানের কথা বলে নীচে নেমে আসতে বললো।

হযরত আসেম (রা) সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা! আমি কোন মুশরিকের আশ্রয় নেব না।" একথা তিনি মুশরিকদেরকেও উচ্চৈ স্বরে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের অবস্থার খবর রাসূলকে (সা) দিয়ে দিন।" তারপর দুশমনরা তাদের উপর বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করলো। মুজাহিদরাও দৃঢ়তা এবং অটলতার সঙ্গে মুকাবিলা করলেন এবং অনেক কাফেরকে জাহান্নামে পৌছে দিলেন। কিন্তু শত্রু সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তাদের তীরের আঘাতে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত এবং তাঁর সাতজন সঙ্গী শাহাদাতের পেয়ালা পান করলো এবং দু'জন [হযরত খুবাইব (রা) বিন আদি এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনা] কাফেরদের হাতে আটক হয়ে গেলেন। [লাহইয়ান বিশ্বাসঘাতকরা হযরত খুবাইব এবং হযরত যায়েদকে (রা) মক্কার মুশরিকদের নিকট বিক্রয় করে দিল। তারা উভয়কেই কয়েদ করলো এবং হারাম মাস অতিবাহিত হওয়ার পর অত্যন্ত নির্মমভাবে দু' মজলুমকে শুলে চড়িয়ে শহীদ করে ফেললো।]

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, শাহাদাতের পূর্বে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত অত্যন্ত খুশু ও খুজুর সঙ্গে রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দোয়া করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ ! আমাকে এমনভাবে হেফাজত করো যাতে আমি যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করি এবং কোন মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আকাংখা পূরণ করেছিলেন। তিনি যখন শহীদ হন তখন মৌমাছির (অথবা নেকড়ে) একটি বিরাট দলকে আল্লাহ পাক তাঁর লাশের উপর প্রেরণ করেন। এই মৌমাছি কোন মুশরিককে তাঁর লাশের নিকট পৌছতে দেয়নি। অবশেষে তারা ক্লান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, রাতে যখন মৌমাছি (অথবা নেকড়ে) চলে যাবে তখন তারা আসেমের (রা) মাথা কেটে নেবে। আল্লাহর কুদরাত। রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির পানি বন্যার রূপ পরিগ্রহ করলো হযরত আসেমের (রা) পবিত্র লাশ বন্যায় ভেসে গেল। মুশরিকরা তন্ন তন্ন করে তাঁর লাশ তালাশ করলো। কিন্তু সফল হতে পারলো না। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তার এক পবিত্র বান্দাহর কথা রক্ষা করলেন।

www.bjilibrary.com

এক বর্ণনায় হযরত আসেমের (রা) এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে ঃ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেইদিন থেকেই ওয়াদা করেছিলাম যে, আজ থেকে কোন কাফের ও মুশরিকের সঙ্গে হাত মিলাবো না, তাকে স্পর্শ করবো না, আমার দেহ তাকে স্পর্শ করতে দিব না, কোন মুশরিকের নিরাপত্তা গ্রহণ করবো না এবং তার জিম্মীও হবো না। বস্তুত নিজের এই ওয়াদা তিনি সারা জীবন পালন করেছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর আল্লাহ তায়ালা তার দেহকে রক্ষা করেছিলেন। কয়েকটি বর্ণনায় আছে, যেদিন হযরত আসেম (রা) শাহাদাত প্রাপ্ত হন ; সেদিন মেঘের সামান্যতম টুকরাও আকাশে ছিল না। কিন্তু রাতের বেলা সমগ্র আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো। অবস্থাটা এমন হলো যে, চারদিকে শুধু পানি আর পানি। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) বলতেন, আসেমের (রা) মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কাফেরদের হাত থেকে এমনভাবে হিফাজত করেছিলেন যেভাবে তিনি জীবিত অবস্থায় কাফেদেরকে স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকতেন।

হযরত আসেম (রা) শাহাদাতের সময় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে যান। তাঁর কন্যার নাম ছিল জামিলা এবং তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) বাগদত্তা ছিলেন। তাঁর গর্ভে আল্লাহ হযরত ওমর ফারুককে (রা) সন্তান দান করেছিলেন। তিনি এই সন্তানের নাম নিজের জালিলুল কদর শশুর (এবং পুত্রের নানা)-এর নামানুসারে আসেম রেখেছিলেন। হযরত আসেম (রা)-এর পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মাদ (র)। আরবের প্রখ্যাত কবি আহওয়াস মুহাম্মাদ (র) বিন আসেমের (রা)ই সন্তান ছিলেন।

সাইয়েদেনা হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত নিজের ঈমানের আবেগ, নিষ্ঠাপূর্ণ আমল, রাসূল প্রেম, জানবাজী এবং পবিত্রতার যে নকশা ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন, তা মুসলমানদের জন্য চিরকাল আলোকবর্তিকা হিসেবে পথ দেখাবে।

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের আনসারী

আওস কবিলার আমর বিন আওফ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের বিন নু'মান বিন উমাইয়াতা বিন ইমরুল কায়েস বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

আমর বিন আওফের বংশের এই যুবককে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। হিজরতে নববীর প্রায় এক বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। অতপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর লাইলাতুল উকবায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ইবনে সায়াদ ওয়াকেদীর উদ্বৃতি দিয়ে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়িদার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, আমরা যখন (মদীনার ঈমানদাররা) মক্কা পৌঁছলাম তখন আবদুল্লাহ (রা) জুবায়ের, মায়ান (রা) বিন আদি এবং সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা আমাকে বললেন, চলো রাসূলের (সা) খিদমতে গিয়ে তাঁকে সালাম করি। কেননা আমরা তাঁর উপর ঈমান এনে ফেলেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর দর্শন হয়নি। সুতরাং আমরা আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের বাড়ী গেলাম। সেখানে হুজুর (সা) উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁকে সালাম দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে আমাদের (মদীনাবাসী) মুলাকাত কবে ও কোথায় হবে ? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কওমের সেইসব মানুষও রয়েছে যারা তোমাদের বিরোধিতা করে থাকে। এজন্য নিজেদের ব্যাপারটি গোপন রাখো। হজ্জে আগত লোকজন এদিক-সেদিক চলে যাক। অতপর মহানবী (সা) মুলাকাতের জন্য সেই রাতের প্রস্তাব করলেন যে রাতের সলককে ইওয়ামুন নাফায়িল আখির বলা হয়। এবং মুলাকাতের স্থান উকবার নিম্ন ভূমির অংশে নির্দষ্ট করে দিলেন।

এই বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বাইয়াতের পূর্বেই হুজুরের (সা) দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

বিশ্বনবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলে অন্যান্য ঈমানদারদের সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ (রা) জুবায়েরও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে হুজুরকে (সা) ইসতিকবাল বা স্বাগত জানালেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) বদরের যুদ্ধে গমন করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরও তাঁর সফরসঙ্গী

www.bjilibrary.com

ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জীবনবাজী রেখে লড়েছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবীর (সা) জামাতা হযরত আবুল আছ (রা) বিন রবিকে (যিনি অনন্যোপায় হয়ে কাফিরদের সঙ্গে এসেছিলেন) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরই আটক করেছিলেন। [কতিপয় বর্ণনায় তাঁকে আটককারী হিসেবে হযরত খারাশ (রা) বিন সামাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।]

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধেও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বিশ্বনবী (সা) তাঁকে ৫০জন তীরান্দাজ দিয়ে ওহোদ পাহাড়ের নিকটবর্তী জাবালে আইনাইনে (জাবালির রুমাত) মোতায়েন করেন এবং মুসলমানদের জয় হোক অথবা পরাজয় হোক কোন অবস্থাতেই তারা যেন সেই স্থান পরিত্যাগ না করে—এই নির্দেশ দিলেন। দুশমন যদি কানাত উপত্যকার পথ (অর্থাৎ ওহোদ পাহাড় এবং জাবালে আইনাইনের মধ্যবর্তী পথ) দিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য কোন দল প্রেরণ করে তাহলে তাকে বাধা দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। মুজাহিদীন ইসলামের জানবাজির কারণে হামলাকারীদের পা শীঘ্রই উৎপাটিত হয়ে গেল এবং মুসলমানরা গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আইনাইন পাহাড়ে মোতায়েনরত তীরন্দাজরা কাফিরদের পিছু পা হতে দেখে তাদের অধিকাংশ নিজেদের মোর্চা ত্যাগ করে ময়দানে এসে পড়লো এবং গনীমাতের মাল একত্রিত করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের নিজেদের স্থান পরিত্যাগ না করার জন্য তাদেরকে অনেক নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁরা জবাব দিলেন যে, মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেছে। এখন এখানে থেকে কি লাভ? শুধুমাত্র আট অথবা দশজন তীরান্দাজ হযরত আবদুল্লাহর (রা) সঙ্গে রইলেন এবং সারফরোশ বা মাথা বিক্রয়কারী এই ছোট দল বরাবর মোর্চায় অটল রইলেন। যখন মুশরিকদের একটি ঘোর সওয়ার দল চক্কর মেরে আইনাইন গিরিপথ দিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের এবং তাঁর জানবাজ সঙ্গীরা প্রচণ্ডভাবে তার মুকাবিলা করলো। এমনকি এক এক করে সকলে শহীদ অথবা গুরুত্বরভাবে আহত হলেন।

জনৈক মুশরিক হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরকে এমনভাবে তীর মারলো যে, তা তাঁর পেট পার হয়ে গেল এবং নাড়িভুড়ি বের হয়ে পড়লো। মুশরিকরা তার লাশ বিকৃত করলো (নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে ফেললো) এমনিভাবে হক পথের এই জানবাজ সিপাহী নিজের আকা ও মাওলার (সা) নির্দেশ পালন করতে করতে জান্নাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত খাওয়াত (রা) বিন জুবায়ের আনসারী

ডাক নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং আবু সালেহ। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরের শহীদের সহোদর (তাঁর বর্ণনা এর আগে দেয়া হয়েছে) ভাইয়ের মত তিনিও অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান ছিলেন। বিশ্বনবীর (সা) মদীনা তাশরীফ আনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বিশ্বনবী (সা) বদরের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত খাওয়াতও (রা) হুজুরের (সা) প্রতি জীবন ফিদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাফরা নামক স্থানে পৌঁছার পর পায়ে পাথর লাগলো। এ কারণে চলা-ফেরা করতে অযোগ্য হয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) চিকিৎসার জন্যে তাঁকে মদীনা ফেরত পাঠালেন। তা সত্ত্বেও বদরের গনীমাতের মালে তাঁর পুরো অংশই দেয়া হয়েছিল। তারপর তিনি ওহোদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর ছিলেন।

কবিতা এবং কাব্যেও বুৎপত্তি ছিল। কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুন্দর। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ"-তে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ-এর সঙ্গে হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন। রাস্তায় লোকেরা জিরারের কবিতা শুনানোর ফরমায়েশ করলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, না ; নিজের কবিতা শোনাও। সুতরাং তিনি সারারাত সুমধুর স্বরে নিজের কবিতা শুনালেন। ভোর হয়ে এলে হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, "খাওয়াত এখন বন্ধ কর, ভোর হয়ে গেছে।"

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) পারস্পরিক ঝগড়ায় হযরত খাওয়াত হযরত আলীর (রা) অন্যতম প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চল্লিশ হিজরীতে ৭৪ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাতে ওফাত পান। ইন্তেকালের সময় ছালেহ নামক এক পুত্র রেখে যান। হযরত খাওয়াত (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর একটি কওল উল্লেখ করেছেন। কওল বা বাণীটি হলো ঃ "দিনের প্রথম অংশে ঘুমানো হলো বেতমিযী, মধ্যাংশে ঘুমানো মুনাসিব এবং শেষাংশে আহমকী।"

www.bjilibrary.com

হযরত কুতবাহ (রা) বিন আমের আনসারী

সাইয়েদেনা হযরত আবু যায়েদ কুতবা (রা) বিন আমের ইসলাম গ্রহণকারী আনসারদের অগ্রগমনকারীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজ কবিলার বনু সালমাহ শাখার সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

কুতবাহ (রা) বিন আমের বিন হাদিদাহ বিন আমর বিন সাওয়াদ বিন গনম বিন কা'ব বিন সালমাহ।

হযরত কুতবাহ (রা) মদীনার সেইসব জালিলুল কদর বুজর্গের কাতারে শামিল ছিলেন যারা নবুওয়াতের ১১, ১২ এবং ১৩ বছরে পর পর তিনবার মক্কা গমন পূর্বক আকাবাহ নামক স্থানে রাসূলের (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁরা হুজুরকে (সা) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি মদীনা গমন করলে তাঁরা তাদের জান, মাল এবং সন্তান দিয়ে তাকে হেফাজত করবেন।

প্রিয় নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত কুতবাহ (রা) যেন দোজাহানের নিয়ামত লাভ করলেন। মহানবীর (সা) সঙ্গে এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, প্রত্যেক দিন যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দর্শণলাভ না হতো ততক্ষণ স্বস্তি পেতেন না।

যুদ্ধসমূহের সূচনা হতে তিনি বদর থেকে তাবুকে পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই হুজুরের (সা) সঙ্গী হয়ে জীবন বাজী রাখার হক আদায় করেন। ঈমানী আবেগ এতবেশী ছিল যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিক এবং মুসলমানদের কাতারের মাঝে একটি পাথর নিক্ষেপ করে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পাথর না পালায় ; ততক্ষণ আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে দাঁড়াবো না।"

সুতরাং মুশরিকদের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে অকুতোভয় সৈনিকের বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এই যুদ্ধে তিনি মালিক বিন আবদুল্লাহ তামিমীকে গ্রেফতারও করেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি ৯টি আঘাত পেয়েছিলেন।

তিনি সেই ১০ হাজার পবিত্র আত্মার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মক্কা বিজয়ের সময় রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মক্কায় এমন মর্যাদার সঙ্গে প্রবেশ করলেন যে, বনু সালমাহর ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিল।

www.bjilibrary.com

ঝাণ্ডা বহনের এই সম্মান স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

সুন্নাতে নববীর (সা) উপর চলার বিশেষ অধ্যবসায় ছিল। জাহেলী যুগে আনসারদের মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের প্রথা ছিল। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তারা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। বরং পেছন দিয়ে অথবা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন।

মক্কার কুরাইশদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল। কিন্তু কতিপয় খান্দান এর ব্যতিক্রম ছিলেন। একদিন বিশ্বনবী (সা) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোন এক বাগানে তাশরীফ নিলেন। হযরত কুতবাহও (রা) ইহরাম বেঁধে হুজুরের (সা) সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যক্তি গুনাহর কাজ করে বসেছে। ইহরাম অবস্থায় সে দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।"

হুজুর (সা) হযরত কুতবাহকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "কুতবাহ ! তুমি ইহরাম বেঁধে ভেতরে কেন এলে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনাকে দেখে ভেতরে এসে পড়েছি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমি তো আহমাসি (অর্থাৎ আমার গোত্র এই প্রথার পাবন্দ নন।)

আরজ করলেন ঃ দ্বিনী দ্বিনুকা অর্থাৎ আপনার যে দ্বীন, তাই আমার দ্বীন।"

এই সময় এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَيسَ البِرُّ بِاَن تَاتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ البِرَّ مَنِ التَّقٰى ـ

وَاتُوا البُيُوتَ مِن اَبوَابِهَا ص

"এটা কোন নেকী নয় যে, তুমি ঘরের পেছন দিক থেকে এসেছ। কিন্তু নেকী পরহেজগারীতে রয়েছে এবং ঘরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।"

সম্ভবত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত কুতবাহর (রা) কর্মপদ্ধতি সমর্থন করলেন। তারপর এই প্রথা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, এই প্রথা পরিত্যাগ প্রশ্নে প্রথম মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত কুতবাহ (রা)। হযরত কুতবাহ (রা) বিন আমের হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ওফাত পান।

---

www.bjilibrary.com

হযরত খাল্লাদ (রা) বিন সুয়ায়েদ আনসারী

তিনি ছিলেন খাজরাজের বনু হারিছ বিন খাজরাজ বংশোদ্ভূত। নসবনামা হলো ঃ

খাল্লাদ (রা) বিন সুয়ায়েদ বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন হারিছাহ বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আয়াজ বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ ইবনুল খাজরাজুল আকবার।

মদীনায় ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগী প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর মক্কা গমন পূর্বক রহমতে আলম (সা)-এর বাইয়াতে অভিষিক্ত হন। (বাইয়াতে আকাবায়ে ছানিয়া অথবা কবিরাহ।)

বিশ্বনবীর (সা) মদীনায় শুভাগমন ঘটলো এবং যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। হযরত খাল্লাদ (রা) বদর, ওহোদ এবং খন্দক তিন যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) বনু কোরায়জার ইহুদীদেরকে অবরোধ করলে তিনিও এ সময় মহানবীর (সা) সঙ্গে ছিলেন। অবরোধকালে ইহুদীদের দুর্গের প্রাচীরের ছায়ায় বসে ছিলেন। এমন সময় নাবানা নাম্নী এক ইহুদী মহিলা যাঁতার পাথর তাঁর মাথার উপর দুর্গের উপর থেকে ফেলে দিল। এই আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল এবং শহীদ হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) তাঁর প্রসঙ্গে বললেন ঃ "তিনি দু' শহীদের সওয়াব পাবেন।"

লড়াই শেষ হওয়ার পর বুন কোরায়জার লোকজন গ্রেফতার হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ হলে তিনি নাবানাকে খুঁজে বের করে হত্যা করালেন। এই ঘটনায় ইহুদীদের অন্যান্য মহিলা হত্যা হওয়া থেকে বেঁচে গেল।

হযরত খাল্লাদ (রা) শহীদ হওয়ার সময় দু'জন পুত্র রেখে যান। তারা হলেন ঃ ইবরাহীম (রা) ও সায়িব (রা)। তাঁরা উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে, তাঁর মা হযরত খাল্লাদের (রা) শাহাদাতের খবর পেয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তাঁর চেহারার উপর নেকাব ছিল। কেউ একজন বললো ঃ

"বিবি, তোমার পুত্র নিহত হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই মুসিবতের সময়ও তুমি মুখের উপর নিকাব দিয়ে রেখেছ।" তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের

www.bjilibrary.com

সঙ্গে জবাব দিলেন ঃ "আমি আমার পুত্রকে খুইয়েছি, হায়া ও শরম তো খুইনি।"

এ সময় বিশ্বনবী (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "তোমার পুত্র দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। কেননা আহলি কিতাব তাঁকে হত্যা করেছে।"

এই প্রসঙ্গে কতিপয় চরিতকার উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) থেকে একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, বনু কোরায়জার যুদ্ধের পর বুন কোরায়জার এক মহিলা আমার পাশে বসে হাসছিল। ইত্যবসরে বাইরে থেকে কে একজন ডাক দিলো, অমুক মহিলা কোথায় ?

সেই মহিলা বললো, আমি এখানে।

যিনি ডাক দিলেন তিনি বললেন, এদিকে এসো, বাইরে এসো।

সেই মহিলা তেমনি হাসতে হাসতে এবং খিল খিল করতে করতে উঠলো এবং বললো, আমাকে হত্যার জন্য ডাকা হচ্ছে। আমি বললাম, মহিলাদেরকে হত্যা করার তো নিয়ম নেই। তোমাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে।

সে বললো, আমার স্বামী আমাকে খুব ভালোবাসতো। অবরোধকালে একদিন সে আমাকে বললো মুসলমানরা আমাদের উপর বিজয়ী হলে আমাদের পুরুষদের হত্যা এবং মহিলাদেরকে দাসী বানাবে।

আমি তাকে বললাম, তোমার বিচ্ছিন্নতা আমি বরদাশত করতে পারবো না।

আমার স্বামী বললো, তুমি সত্যি বলছো। তাহলে যাঁতার অংশ সেই মুসলমানদের মাথার উপর ফেলে দাও, যারা দুর্গের প্রাচীরের নীচে বসে আছে। যদি তাতে কেউ মারা যায় তাহলে মুসলমানরা এই কিসাসে তোমাকে হত্যা করবে এবং তুমি আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে। আমি এমনি করেছি এবং একজন মুসলমান মারা গেছে। তারই কিসাসে আমাকে হত্যার জন্য ডাকছে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, অনেকদিন চলে গেছে, কিন্তু হত্যার জন্য সেই মহিলার হাসার কথা আমি ভুলতে পারিনি।

---

www.bjilibrary.com

হযরত খারিজাহ (রা)
বিন যায়েদ আনসারী

হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ খাজরাজের হারিছ বিন খাজরাজ (অথবা আগার)-এর বংশভুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ বিন আবি যুহায়ের বিন মালিক ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আগার বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজ আকবার।

নিজের খান্দান আগার-এর সরদার এবং অত্যন্ত নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকবায় রহমতে দো আলমের (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় তিনি হযরত খারিজার (রা) বাড়ীতেই অবস্থান করেছিলেন। [অন্য এক বর্ণনায় তাঁর মেযবানের নাম খুবাইব (রা) বিন আসাফ বলা হয়] কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কায়েম করলেন। এ সময় হযরত খারিজাকে (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ইসলামী ভাই বানালেন। তিনি নিজের কন্যা হাবিবাহকে (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত হাবিবাহর (রা) গর্ভে সিদ্দীকে আকবারের (রা) কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত খারিজাহ (রা) "বদরের সাহাবীদের" অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি মশহুর মুশরিক উমাইয়া বিন খালফকে অন্য কতিপয় সাহাবীর (সা) সঙ্গে মিলে হত্যা করেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। আঘাতের পর আঘাত খেয়েও পিছ পা হননি। সারা শরীর যখন বল্লমের আঘাতে ছিদ্র হয়েগিয়েছিল তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে নিহত উমাইয়া বিন খালফের পুত্র সাফওয়ান তাঁকে চিনে ফেলে এবং পিতার হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ঠোঁট, কান, নাক ও অন্যান্য অঙ্গ কেটে নেয়। হযরত খারিজার (রা) ভাতিজা হযরত সায়াদ (রা) বিন রাবি-ও এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। হুজুর (সা) চাচা-ভাতিজা উভয়কেই একই কবরে দাফন করান।

www.bjilibrary.com

হযরত খারিজাহ (রা) এক কন্যা হাবিবাহ (রা) এবং এক পুত্র যায়েদ (রা)-কে রেখে গিয়েছিলেন। যায়েদ (রা) হযরত ওসমানের খিলাফতকালে ওফাত পান।

অন্য কতিপয় বর্ণনায় তাঁর আরেক পুত্র সায়াদের (রা) নামও পাওয়া যায়। তিনি ওহোদের যুদ্ধে পিতার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ জালিলুল কদর সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক আনসারী

বদরের যুদ্ধের (দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাস) কিছুদিন পরের কথা। একদিন একজন অন্ধ মানুষ বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন। এই ব্যক্তি যদিও চোখের আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কপাল সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল করছিল। তিনি রাসূলের (সা) দরবারে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি প্রত্যক্ষ করছেন যে, আমি অন্ধ এবং মাজুর। এই অবস্থায় আমি কি নিজের বাড়ীতে নামায পড়তে পারি ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমার কানে কি আযানের আওয়াজ পৌছে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হাঁ, আল্লাহর রাসূল, পৌছে।"

ইরশাদ হলো ঃ "তাহলে তুমি মসজিদে এসে নামায পড়ো।"

এই ব্যক্তি নবীর (সা) ফরমানকে জীবনের মন্ত্র বানিয়ে নিলেন এবং সারা জীবন মসজিদে এসে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করতেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী অন্ধ এবং মাজুর হওয়া সত্ত্বেও যার নবীর (সা) ফরমানের প্রতি এত সমীহ ছিল—তিনি ছিলেন হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত ইতবান (রা) বিন মালিকের সম্পর্ক খাজরাজের বনু সালিম বংশের সঙ্গে ছিল। নসবনামা হলো ঃ

ইতবান (রা) বিন মালিক বিন আমর বিন আজলান বিন যায়েদ বিন গানাম বিন সালিম বিন আমর বিন আওফ বিন খাজরাজ।

হযরত ইতবান (রা) নিজের কবিলার সরদার এবং অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বিশ্বনবী (সা) তখনও মদীনায় শুভ পদার্পণ করেননি। এই অবস্থায় তিনি তাওহীদের আহ্বান শুনতে পেলেন। তিনি নিশ্চিন্তে তাতে সাড়া দিলেন এবং আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনা তাশরীফ নিলেন তখন তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদানকারীদের মধ্যে হযরত ইতবান (রা) বিন মালিকও শামিল ছিলেন। হুজুর (সা) কয়েকদিন কুবাতে অবস্থানের পর সোজা মদীনার দিকে রওয়ান দিলেন। এ সময় পথিমধ্যে বনু সালিমের মহল্লা পড়লো। হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক এবং হযরত আব্বাস (রা) বিন উবাদাহ বনু সালিমের নেতাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মহানবীকে (সা) আহলান-সাহলান অর্থাৎ সুস্বাগতম জানান এবং অবস্থানের জন্য স্বস্ব

www.bjilibrary.com

বাড়ী পেশ করলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) ভাগ্যে লিখা ছিল। এ জন্য হুজুর (সা) তাদেরকে দোয়া দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

হিজরতের কয়েক মাস পরে রহমতে আলম (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। এ সময় হযরত ইতবান (রা) বিন মালিককে সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) দ্বীনি ভাই বানালেন। এই উভয় ভাইয়ের মধ্যে আজীবন নিষ্ঠা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক এবং বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক তাতে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত ইতবান (রা)-এর চোখ খারাপ হওয়া শুরু হলো। কিছুদিন পর তিনি অন্ধই হয়ে গেলেন। এজন্য বদরের পর সংঘটিত যুদ্ধসমূহে অংশ নিতে পারেননি।

হযরত ইতবান (রা) নবীর (সা) দরবারে নৈকট্যলাভ করেছিলেন এবং বিশ্বনবী (সা) তাঁকে বনু সালিমের মসজিদের ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে আছে, হুজুর (সা) ইমাম নির্বাচনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা ঠিক করেছিলেন ঃ

(ক) যিনি সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কালাম পড়েছেন—যদি তাতে সকলেই সমান সমান হন তাহলে—

(খ) যিনি সবচেয়ে বেশী সুন্নাত সম্পর্কে ওয়াকিফ—যদি তাতেও সমান সমান হন তাহলে—

(গ) যিনি প্রথম হিজরত করেছেন—যদি তাতেও সকলে সমান সমান হন তাহলে—

(ঘ) যার বয়স সবচেয়ে বেশী হবে।

হুজুর (সা) হযরত ইতবানকে (রা) ইমামতের জন্য নির্বাচন করাটা নিসন্দেহে তাঁর মহান মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে।

মহানবীর (সা) ফয়েজ থেকে মহিমান্বিত হওয়ার আকাংখা ছিল হযরত ইতবানের (রা) তীব্র, বস্তুত তাঁর বাড়ী মহানবীর (সা) আবাসস্থল ও মসজিদে নববী থেকে দু'তিন মাইল দূরে ছিল এবং প্রতিদিন যাতায়াতে খুব কষ্ট হতো। এ জন্য তিনি নিজের দ্বীনি ভাই হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে পালাক্রমে

www.bjilibrary.com

হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং একদিন হযরত ওমর ফারুক (রা) সারাদিন রাসূলের (সা) দরবারে হাজির থাকতেন এবং ওহীর আহকাম ও নবীর (সা) ইরশাদসমূহ শুনতেন। সন্ধ্যাকালে এ সকল আয়াতে কুরআন এবং হাদীসসমূহ হযরত ইতবানের (রা) নিকট পৌছে দিতেন। পরের দিন হযরত ইতবান (রা) নবীর (সা) দরবারে হাজির হতেন এবং নিজের আঁচল কুরআন-হাদীসের মনিমুক্তায় পূর্ণ করে নিয়ে যেতেন এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট পৌছে দিতেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত ইতবান (রা)-এর বাড়ী এবং মসজিদের মধ্যে একটি নিম্নভূমি ছিল। বৃষ্টি হলে সকল পানি সেখানে জমা হয়ে যেত। চোখ খারাপ হওয়ার কারণে হযরত ইতবানের (রা) পক্ষে সেই পানি অতিক্রম করে মসজিদে পৌছা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এ জন্য তিনি এই পরিস্থিতিতে বাড়ীতেই নামায পড়ে নিতেন। একদিন তিনি প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! বৃষ্টি হলে মসজিদ ও আমার বাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে গভীর পানি দাঁড়িয়ে যায়। আমার দৃষ্টিশক্তি সেই পানি অতিক্রম করে আমাকে মসজিদে পর্যন্ত পৌছার অনুমতি দেয় না। এ জন্য বাধ্য হয়ে এই অবস্থায় ঘরে নামায পড়ে নেই। যদি কোনদিন হুজুর (সা) আমার বাড়ী পৌছে নামায পড়িয়ে দেন, তাহলে সেই স্থানে সিজদার স্থল বানিয়ে নিতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন, "খুব ভালো কথা, আমি আসবো।"

পরবর্তী দিন বিশ্বনবী (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে নিয়ে হযরত ইতবানের (রা) বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং তিনি কোথায় নামায পড়তে চান তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বৃষ্টির দিনে যেখানে সবসময় নামায পড়েন সেই স্থানের কথা বললেন। হুজুর (সা) সেখানেই দু' রাকায়াত নামায আদায় করলেন। তারপর কিছুক্ষণ সেখানে কাটালেন। হযরত ইতবান (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে ভুনা গোশত পেশ করলেন। তিনি (সা) হযরত আবু বকরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তা খেলেন এবং ফিরে এলেন।

এই ঘটনার পর হযরত ইতবান (রা) অন্ধত্বের ওজরে হুজুরের (সা) নিকট বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হুজুর (সা) তাঁর দরখাস্ত অনুমোদন করলেন না। কারণ, তাঁর কানে আযানের আওয়াজ পৌছতো।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিক হযরত ইতবানের (রা) এই ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসকে

www.bjilibrary.com

হাদীসের খনির অন্যতম হাদীস হিসেবে গণ্য করতেন এবং নিজের পুত্র আবু বকরকে (রা) এই হাদীস স্মরণ রাখার জন্য তাকিদ দিতেন।

হযরত ইতবান (রা) শেষ বয়স পর্যন্ত মসজিদে বনু সালিমের ইমামতি করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে মাহমুদ বিন রাবি (রা) থেকে বর্ণিত আছে (আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে ৫২ হিজরীতে) যে, আমি কামতানতুনিয়া যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে মদীনা এসে হযরত ইতবানের (রা) খিদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অন্ধ ছিলেন এবং নিজের মসজিদে ইমামতি করতেন।

হযরত ইতবান (রা) ৫২ হিজরীর পরই কোন এক সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস সহীহহাইন, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং মুসনাদে আবু দাউদে রয়েছে। তাঁর হাদীস বর্ণনা-কারীদের মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, আবু বকর (রা) বিন আনাস (রা) এবং মাহমুদ বিন রাবি (র)-এর মত সম্মানিত ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য।

তাঁর পরিবার-পরিজন সম্পর্কে চরিত গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযার আনসারী

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) বদরের যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন এবং বদরের সন্নিকটে এক স্থানে তাঁবু ফেললেন। এ সময় এক আনসারী জাননিছার আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! এই স্থানে তাঁবু ফেলার নির্দেশ কি আল্লাহ পাক দিয়েছেন ; না, এটা আপনার ব্যক্তিগত মত।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা আমার ব্যক্তিগত মত।"

তিনি আরজ করলেন ঃ আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, এটাই কি উত্তম হবে না যে, আমরা পানির পাশে তাঁবু ফেলবো এবং সকল কূপ দখল করে একটি হাউজ বানিয়ে নিব। এভাবে আমাদের বাহিনী আসানির সঙ্গে পানি পাবে এবং দুশমনরা পানির কমতিতে পেরেশান হয়ে পড়বে।

হুজুর (সা) অন্যান্য সাহাবাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই ব্যক্তি ঠিক বলেছেন (এই কর্মপদ্ধতিই উত্তম)।"

সুতরাং তিনি (সা) নিজের জাননিছারদের সঙ্গে বদরের কূপের পাশে তাঁবু ফেললেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যার সঠিক মতের স্বীকৃতি মহানবী (সা) প্রদান করেছেন—তিনি ছিলেন হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযার আনসারী। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

হযরত আবু ওমর হাব্বাব (রা) বিন মানযার বিন জামুহ বিন যায়েদ বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ। তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে।

হযরত হাব্বাবের (রা) চাচা আমর বিন জামুহ বনু সালমার সরদার এবং বংশীয় মূর্তির মুতাওয়াল্লী ছিলেন। কিন্তু ভাতিজা ছিলেন ভাগ্যবান। তিনি নবীর হিজরতের পূর্বেই মূর্তিপূজা সম্পর্কে তিন বাক্য লিখে পাঠিয়ে ঈমানের সম্পদে প্রাচুর্যবান হয়ে গিয়েছিলেন।

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণ করলে হযরত হাব্বাব (রা) নিজের জীবন হকের সহযোগিতা ও দোজাহানের নবীর (সা) সাহায্যের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন এবং সঠিক রায়ের অধিকারী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর পরামর্শেই রাসূলে করীম (সা) বদরের কূপের পাশে তাঁবু

www.bjilibrary.com

ফেলেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে মক্কায় কুরাইশদের আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে হুজুর (সা) নিজের দু'জন জাননিছার সাহাবী (রা)-কে গোয়েন্দাগিরীর জন্য প্রেরণ করলেন। তারপর হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযারকে রওয়ানা করালেন। ইবনে আছির (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত হাব্বাব (রা) নিজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে আনজাম দেন এবং দুশমনের সংখ্যা অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কার্যকর তথ্য রাসূলের (সা) নিকট পৌছান। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, এই যুদ্ধে (সকল) খাজরাজ (অথবা তার একাংশ)-এর ঝাণ্ডা হযরত হাব্বাবের (রা) নিকট ছিল। এমনিভাবে খায়বারের ও হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি খাজরাজের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন এবং সাকিফায়ে বনু সায়েদাতে খিলাফত প্রশ্ন আলোচনায় এলো। এ সময় তিনি সাইয়েদুল খাজরাজ হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফাহ বানানোর প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দু'টি জোরালো ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আনসারদের ফযিলত বর্ণনা এবং খেলাফতে তাদের হক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এক ভাষণে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি কওমের বিশ্বস্ত মানুষ এবং লোকজন আমার রায়ে উপকৃত হয়ে থাকেন।"

তাঁর কথায় মনে হয়, তিনি আনসারদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর জোরালো ভাষণসমূহের পরও মুহাজিররা যখন তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না তখন তিনি দুই খলিফা হওয়ায় প্রস্তাব পেশ করেন। দুই খলিফার একজন হবেন মুহাজির এবং অপরজন আনসার। হযরত ওমর ফারুক (রা) এই প্রস্তাবও অসম্ভব বলে নাকচ করে দিলেন। হযরত হাব্বাব (রা) এই সময় যা কিছুই বলেছিলেন তা নেক নিয়তের ভিত্তিতেই বলেছিলেন এবং তাতে কারো ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত ছিল না। সুতরাং সাধারণ মুসলমানরা যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করলেন তখন তিনিও সকলের অনুসরণ করলেন।

হযরত হাব্বাব (রা) ১৯ হিজরীতে ওফাত পান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত হাব্বাব (রা) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং শুধুমাত্র একজন সুবক্তাই ছিলেন না, বরং কাব্য ও কবিতাতেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি একজন সত্যিকার আশেকে রাসূল (সা) ছিলেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত জালবিব (রা) আনসারী

কতিপয় বর্ণনায় তাঁর নাম "জালইয়াবিব" হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। নসবনামা ও বংশের পরিচয় জানা যায়নি। কিন্তু নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের নিকট এটা স্বীকৃত যে, তিনি মদীনার বাসিন্দা এবং আনসারের কোন কবিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন বেঁটে আকৃতির মানুষ ; তবুও অন্তরের পবিত্রতা, নেক নিয়ত, বীরত্ব, দ্বীনের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং রাসূল (সা) প্রেমের দিক থেকে উদাহরণ তুল্য ছিলেন। এ জন্য রাসূলে করীমের (সা) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মুসনাদে আহমদ (র) বিন হাম্বলে হযরত আবু বুরযাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জালবিবের (রা) প্রকৃতিতে কৌতুক প্রিয়তা ছিল। এমনকি তিনি মহিলাদের সঙ্গেও কৌতুক করতেন। যা অনেকেই পসন্দ করতেন না। তা সত্ত্বেও হুজুর (সা) তার সচ্চরিত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন এবং তিনি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। আনসারদের রীতি ছিল, তাদের কোন মহিলা বিধবা হয়ে গেলে প্রিয় নবীর (সা) নিকট জিজ্ঞেস না করে তার দ্বিতীয় বিয়ে দিতেন না। একবার হুজুর (সা) এক আনসারীকে বললেন ঃ "তোমার বিধবা কন্যার বিয়ে আমাকে করতে দাও।" তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এটাতো বিরাট মর্যাদার ব্যাপার।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমি স্বয়ং তাকে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করি না।" আনসারী আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! তাহলে আপনি কার সঙ্গে আমার কন্যার সম্পর্ক করতে চান ?"

হুজুর (সা) বললেন, "জালবিবের সাথে।"

আনসারী আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে চাই।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাতে দোষের কিছু নেই।"

আনসারী নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। স্ত্রী একদিকে হযরত জালবিবের (রা) সুন্দর চেহারা না থাকা এবং অন্যদিকে তার কৌতুক প্রিয়তার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। কন্যাটি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মুখলিস মু'মিনা। সে যখন একথা জানতে পারলো তখন পিতা-মাতাকে এই নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন, "যখন আল্লাহ এবং রাসূল (সা) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন কোন মুসলমানের তাতে চুঁ-চারা করার সুযোগ নেই।" তারপর বললেন, "আপনারা রাসূলের (সা) ইরশাদ বা নির্দেশ বাতিল করতে চান, এটা কখনো হতে পারে না। আপনারা আমাকে হুজুরের (সা) হাওয়ালা করে দিন। তিনি আমাকে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে

www.bjilibrary.com

দেবেন না। আমার ইচ্ছা হুজুরের (সা) ইচ্ছার অনুগত এবং আমি মহানবীর (সা) ইরশাদ বা নির্দেশ সর্বাবস্থায় মেনে থাকি।"

কন্যার পিতা রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সা) তা শুনে কন্যার আচরণে খুব খুশী হয়ে এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! এই মেয়ের উপর কল্যাণ বর্ষণ কর এবং তার জীবনকে পংকিল করো না।"

অতপর তিনি হযরত জালবিবকে (রা) বললেন, অমুক মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলাম।

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি আমার মধ্যে খুঁত পাবেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "না। আল্লাহর নিকট তোমার মধ্যে খুঁত নেই।"

তারপর তিনি সেই মেয়ের সঙ্গে হযরত জালবিবের (রা) নিকাহ দিয়ে দিলেন। হুজুরের (সা) দোয়ার আছরে আল্লাহ তায়ালা তাদের পারিবারিক জীবনকে জান্নাত বানিয়ে দিলেন এবং তারা সচ্ছল হয়ে গেলেন। চরিতকাররা লিখেছেন, আনসারদের মধ্যে কোন মহিলা সেই মহিলার তুলনায় উদার হাতে ব্যয়কারী ছিলেন না।

হযরত আবু বুরদাহ (রা) বলেন, বিশ্বনবী (সা) এক যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন (চরিত গ্রন্থসমূহে সেই যুদ্ধের বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি)। হযরত জালবিবও (রা) হুজুরের (সা) সাথে ছিলেন। আল্লাহ্ পাক যখন মহানবীকে (সা) বিজয় দিলেন এবং গনীমাতের মাল তাঁর (সা) সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি (সা) সাহাবাদেরকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমাদের কোন্ কোন্ ব্যক্তি লাপাত্তা রয়েছে ?"

সাহাবারা (রা) কতিপয় ব্যক্তির নাম বললেন। হুজুর (সা) দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবারা (রা) কতিপয় ব্যক্তির নাম বলতেন। জালবিবের (রা) প্রতি কারোর খেয়ালই গেল না। তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমিতো জালবিবকে (রা) দেখছি না।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীর (সা) ইরশাদ শুনে চমকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত জালবিবের (রা) খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন নিহত সাতজন মুশরিকের লাশ পড়ে আছে এবং তার নিকটেই জালবিবের (রা) দেহও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। হুজুর (সা) এই খবর

www.bjilibrary.com

পেয়ে স্বয়ং সেখানে তাশরীফ নিলেন। এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন। হযরত জালবিবের (রা) পবিত্র দেহের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

قَتَلَ سَبعَةً ثُمَّ قَتَلُوه هذَا مِنِّي وَاَنَا مِنهُ ! هذَا مِنِّي وَاَنَا مِنهُ

"সাতজনকে হত্যা করে নিহত হয়েছে। সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে।"

সহীহ মুসলিমে আছে, তারপর সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) হযরত জালবিবের (রা) পবিত্র দেহ নিজের হাতে উঠালেন এবং কবর খুড়ে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তা দাফন করলেন। এই মাইয়্যেতকে তিনি গোসল দেননি।

হক পথের যে শহীদের জন্য রহমতে দোআলম (সা) বার বার বলেছেন, "সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে" এবং যার দেহ ছাকিয়ে কাওসার (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে উঠিয়ে শাহাদাত স্থল থেকে কবর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর উচ্চ মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে?

www.bjilibrary.com

হযরত সালমাহ (রা) বিন সালামাহ আনসারী

আওসের সম্ভ্রান্ত বংশ "বনু আবদুল আশহালের" সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ সালমাহ (রা) বিন সালামাহ বিন ওয়াকশ বিন যাগবাতাহ বিন যাওরা বিন আবদুল আশহাল। ডাক নাম ছিল আবু আওফ। মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে সালমাহ বিন খালিদ বিন আদি। তিনি ছিলেন আওসের বনু হারিছা বংশোদ্ভূত এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত সালমাহকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে পূর্ণ যৌবনকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর মক্কা গিয়ে উকবায়ে কবিরাতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত সালমাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সাবালগ হতে যাচ্ছিলাম। এ সময় একবার স্বগোত্র আবদুল আশহালের কতিপয় লোকের মধ্যে বসেছিলাম। সেখানে একজন ইহুদী আলেমের আগমন ঘটলো। সে আমাদের সামনে কিয়ামত, হিসাব, মিযান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুরু করলো এবং বলতে লাগলো যে, মুশরিক ও মূর্তিপূজকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিদান পাবে। ইহুদী আলেম বললো, হাঁ, এই হলো আমার আকীদা এবং এই আকীদা সঠিক। তারা জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামতের আলামত কি কি ? সে মক্কা এবং ইয়েমেনের দিকে ইশারা করে বললো, ঐ শহরের দিকে শেষ নবীর জন্ম হবে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার আগমন কবে ঘটবে ?

ইহুদী আলেম আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, যদি এই বালক জীবিত থাকে তাহলে সে এই নবীকে দেখতে পাবে।

হযরত সালমাহ (রা) বলেন, একথা শুনে আমি মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম এবং সেই ঘটনার কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মহানবীর (সা) প্রকাশ ঘটলো। যেই আমরা তাঁর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর শুনলাম, তখনি ঈমান আনলাম। সেই ইহুদী আলেম তখনো জীবিত ছিল। কিন্তু শত্রুতার কারণে ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলো। আমরা তাকে বললাম, তুমিইতো আমাদেরকে শেষ নবীর (সা) আবির্ভাবের খবর শুনাতে। আর এখন তুমিই তাঁকে অস্বীকার করছো। সে বললো যে, এ সেই নবী নন, যার কথা আমি বলতাম। শেষে সেই হতভাগা কুফুরী অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।—(সিরাতে ইবনে হিশাম)

www.bjilibrary.com

হিজরতের পাঁচ মাস পর বিশ্বনবী (সা) হযরত আনাসের (রা) বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের এক সমাবেশ ডাকলেন এবং তাতে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। এ সময় তিনি (সা) হযরত সালমাহ (রা)-কে নিজের ফুফাতো ভাই এবং জালিলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের দ্বীনী ভাই বানালেন।

হযরত সালমাহ (রা) অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন এবং বিশ্বনবীকে (সা) খুব ভালোবাসতেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুদ্ধে হুজুরের (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বীরত্বের নিপুণতা প্রদর্শন করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "ইসাবাতে" বর্ণনা করেছেন, বনু মুসতালিকের যুদ্ধে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বনবীর (সা) ও মুহাজিরদের শানে বেআদবীমূলক বাক্য উচ্চারণ করেছিল। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে সালমাহকে আবদুল্লাহর মাথা কেটে আনার জন্য প্রেরণের অনুরোধ করলেন। কিন্তু হুজুর (সা) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তা দেখলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সালমাহকে (রা) খুব মান্য করতেন। তিনি নিজের খিলাফতকালে হযরত সালমাহকে (রা) ইয়ামামার গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত সালমাহ (রা) নির্জনত্ব বেছে নিলেন এবং সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি ৭৪ বছর বয়সে ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

হযরত সালমাহর (রা) কতিপয় বর্ণনা হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সালমাহর (রা) নিকট রান্না করা (অথবা এমন বস্তু আগুন যার রঙ পরিবর্তন করে দিয়েছে) খাবার খেলে ওজু প্রয়োজন হবে। একবার কারো ওয়ালিমার দাওয়াতে তাশরীফ নিলেন এবং খাবার খেয়ে ওজু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো খাওয়ার পূর্বে ওজু করেছিলেন, এখন আবার কেন ? তিনি বললেন, রাসূলের (সা) জীবনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনিও করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত হানজালা (রা) বিন আবি আমের আনসারী

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইর ভগ্নিপতি আবু আমের যদিও একজন ভালো মানুষ ছিলো এবং হকের সন্ধানে নির্জনত্ব বেছে নিয়েছিল ; কিন্তু ইসলামের সূর্য যখন ফারান পাহাড়ে উদিত হলো এবং মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলি সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) শুভাগমনে প্রোজ্জল হয়ে উঠলো তখন আবু আমেরের মস্তিষ্কের ওপর পাথর চাপা দিল। সে ইসলাম ও দায়িয়ে ইসলামের (সা) শত্রুতাকে জীবনের একমাত্র মন্ত্র বানিয়ে নিল। আল্লাহর শান, সেই আবু আমেরের পুত্রকে আল্লাহ তায়ালা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি নিশ্চিন্তে হকের দাওয়াতে সাড়া দিলেন এবং রহমতে আলমের (সা) জাননিছারদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন। তার পিতার ইসলাম দুশমনি যখন চরম সীমায় পৌছলো তখন তার ঈমানী মর্যাদাবোধ আর ধরে রাখতে পারলেন না। একদিন রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! অনুমতি দিলে নিজের পিতার মাথা কেটে আনতে পারি।"

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "না, আমরা তার সঙ্গে অসদাচরণ করবো না।"

আবি আমেরের এই ভাগ্যবান পুত্র যিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য নিজের দুশমন পিতাকে খতম করে দেয়ার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত হানজালা (রা)। ইতিহাসে তিনি তাকি এবং "গাসিলুল মালায়িকা" লকবে মশহুর হয়েছিলেন।

হযরত হানজালার (রা) সম্পর্ক ছিল আওসের আমর বিন আওফ বংশের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

হানজালা (রা) বিন আবি আমের আমর বিন সাইফি বিন মালিক বিন উমাইয়া বিন দাবিয়াহ বিন যায়েদ বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

হানজালার (রা) পিতা আবি আমের গোত্রের অত্যন্ত সম্মানিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলো। সে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের আলেম এবং শেষ যমানার পয়গাম্বরের (সা) আগমনের প্রবক্তা ছিলেন এবং প্রায় সময়ই দ্বীনে হানিফের উল্লেখ করতো। এ ধরনের ধারণাই তাকে বস্তুবাদী দুনিয়া ত্যাগের দিকে ধাবিত করেছিলো। সে ক্যানভাস বা চটের পোশাক পরিধান করে

www.bjilibrary.com

নির্জনত্ব গ্রহণ করেছিলো এবং দিন-রাত আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল থাকতে লাগলো। জাহেলী যুগে মদীনাবাসীর নিকট সে একজন ধর্মীয় নেতার মর্যাদা রাখতো এবং তারা তাকে 'রাহিব' বা সন্যাসী উপাধিতে ডাকতো। এই রাহিব বা সন্যাসির দুর্ভাগ্য দেখুন, যখন (নবুওয়াতের একাদশ বছরে) মদীনায় ইসলামের দাওয়াতের চর্চা হলো তখন সে হকের আলোর প্রতি চোখ বন্ধ করে নিলো এবং ইসলাম সম্পর্কে আবোল-তাবোল বলতে লাগলো। বিশ্বনবী (সা) হিজরতের পর মদীনায় পদার্পণ করলেন। তখন আবু আমের হুজুরের (সা) উপর ঈমান আনার পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে কঠোর শত্রুতা করতে লাগলো। সে লোকদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদানে সব ধরনের চেষ্টাই করেছে। আল্লাহর শান ! এই হতভাগার পুত্রকে তিনি ঈমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন এবং এমন ঈমানী আবেগ প্রদান করেন যে, তিনি নিজের পিতাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) তাঁকে সেই কাজের অনুমতি দেননি। আবু আমের হিংসার জ্বালায় মদীনা অবস্থান ত্যাগ করে মক্কা চলে গেল এবং ওহোদের যুদ্ধে কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এলো। হকের প্রতি এমনি দুশমনির জন্য হুজুর (সা) তাকে "ফাসিক" উপাধিদানের প্রস্তাব করেছিলেন। তারপর সে মক্কা ফিরে যায়। অষ্টম হিজরীতে মক্কার উপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে সে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট কাসতান তুনিয়া চলে গেল এবং নবম হিজরীতে সেখানেই মারা যায়। কথিত আছে যে, হিরাক্লিয়াস তার পরিত্যক্ত জিনিস-পত্র কিনানা বিন আবদি ইয়ালিল ছাকাফিকে দিয়ে দেয়।

হযরত হানজালা (রা) অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান ছিলেন এবং নবীর (সা) দরবার থেকে 'তকি' খেতাব পেয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে কোন কারণে অংশ নিতে পারেননি। ওহোদের যুদ্ধের দিন স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে ছিলেন। এমন সময় আহ্ববানকারীর আওয়াজ কানে এলো। তিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের ডাক দিচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। গোসলের খেয়ালই রইলো না এবং সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে পৌঁছলেন। সে সময় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যেতেই সামনে পড়লো কুরাইশের সিপাহসালার আবু সুফিয়ান (রা)। তিনি আবু সুফিয়ানের (রা) ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন এবং তাঁকে নিজের তরবারীর সীমায় নিয়ে এলেন। এমন সময় শাদ্দাদ বিন আসওয়াদ লাইছি সামনে অগ্রসর হয়ে হানজালার (রা) উপর তরবারী দিয়ে এমন আঘাত হানলো যে, তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

যুদ্ধের পর বিশ্বনবী (সা) যুদ্ধের ময়দানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "হানজালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছেন।"

www.bjilibrary.com

হযরত আবু উসায়েদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হানজালার (রা) লাশের নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তাঁর মাথা থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়ছে। আমি তৎক্ষণাৎ হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে এলাম এবং এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। ইরশাদ হলো, তার স্ত্রীর নিকট জানবে যে কি ব্যাপার ছিল ? আবু উসায়েদ (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা ফিরে এলাম তখন হুজুর (সা) হযরত হানজালার (রা) স্ত্রীর নিকট কাউকে পাঠিয়ে জানলেন যে, হানজালা (রা) কোন্ অবস্থায় জিহাদের জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন ? তিনি বলেন ঃ তাঁর গোসলের প্রয়োজন ছিল। হুজুর (সা) বলেন, এজন্য ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছিলেন। সেই দিন থেকে তিনি "গাসিলুল মালায়িকা" উপাধিতে মশহুর হয়ে গেলেন।

হযরত হানজালা শাহাদাতের সময় সাত বছর বয়সী একটি পুত্র রেখে যান। তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ। তিনি হিররার ঘটনার (৬৩ হিজরী) সময় নিজের পুত্রদের সঙ্গে শহীদ হন।

আওস গোত্রের জন্য হযরত হানজালার (রা) ব্যক্তিত্ব চিরকালীন গৌরবের বস্তু হয়ে গেল। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, একবার আওস ও খাজরাজীরা স্ব স্ব মর্যাদা বর্ণনা করছিলো। উভয় পক্ষই সে সময় স্ব স্ব জালিলুল কদর সাহাবীর নাম পেশ করলো। আওস বংশোদ্ভূতরা যেসব সাহাবীর নাম নিলেন তাদের এক নম্বরে ছিলো হযরত হানজালার (রা) নাম।

www.bjilibrary.com

হযরত মুনযির (রা) বিন আমর আনসারী

খাজরাজ গোত্রের সায়েদাহ বংশের চোখের মনি ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

মুনযির (রা) বিন আমর বিন খানিস বিন হারিছাহ বিন লওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন ছা'লাবা খাজরাজ বিন সায়েদাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজুল আকবার।

হযরত মুনযির (রা) বিন আমর অত্যন্ত মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি আনসারের সেই কতিপয় লোকের মধ্যে ছিলেন যারা জাহেলী যুগে আরবী ভাষা লিখতে-পড়তে পারতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তাওহীদের দাওয়াতের আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। বাইয়াতের পর বিশ্বনবী (সা) বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিজেদের মধ্য থেকে ১২জন নকীব নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন। তাঁরা খাজরাজ থেকে ৯জন এবং আওস থেকে ৩জন নকীব নির্বাচিত করলেন। খাজরাজী নকীবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মুনযির (রা) বিন আমর।

হিজরতের পর প্রিয় নবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় তাঁকে সম্বর্ধনা দানকারীদের মধ্যে হযরত মুনযির (রা) বিন আমরও শামিল ছিলেন। এটা পৃথক কথা যে, বিশ্বনবীর (সা) মেযবানীর মহান মর্যাদা পেয়েছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)।

কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করেন। এ সময় হযরত মুনযিরকে (রা) নিজের ফুফাতো ভাই ...লিব (রা) বিন উমায়েরের ইসলামী ভাই বানান [তিনি হুজুরের (সা) ফুফু আরদা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন।] অন্য এক বর্ণনা মতে হুজুর (সা) তাঁকে হযরত আবু যর গিফারীর (রা) ইসলামী ভাই বানিয়ে ছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে সর্বপ্রথম হযরত মুনযির (রা) বদরের যুদ্ধে নিজের তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। তারপর ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শরীক হন। এই যুদ্ধে মহানবী (সা) তাঁকে ইসলামী বাহিনীর বাম দিকের অফিসার নিয়োগ করেন।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আবু বারা' আমের বিন মালিক নজদীর আবেদন অনুযায়ী হুজুর (সা) ৭০জন মুবাল্লিগ সমন্বয়ে গঠিত তাবলীগে হকের একটি দলকে নজদ প্রেরণ করেন। এই ৭০জন সাহাবী অত্যন্ত ইবাদাত গুজার, মুত্তাকী এবং কুরআন-হাদীসের আলেম ছিলেন এবং ক্বারীর লকবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হুজুর (সা) এই দলের নেতা হিসেবে হযরত মুনযির (রা) বিন আমরকে নিয়োগ করেন। এসব ব্যক্তি যখন বি'রে মাউনা বা মাউনা কূপ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন নজদবাসীরা গাদ্দারী করলো ও রাল, জাকওয়ান, বনি সলিম প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো এবং হযরত মুনযির (রা) বিন আমর ও আমর (রা) বিন উমাইয়া ছাড়া সকলকে শহীদ করে ফেললো। বনি আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল হযরত মুনযিরকে (রা) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া যেতে পারে। তিনি বললেন, আমাকে সেই স্থানের কথা একটু বলে দাও, যেখানে তোমরা হারাম (রা) বিন মিলহানকে শহীদ করেছ। মুশরিকরা তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলে তিনি নিজের তরবারী বের করলেন এবং আমের বিন তোফায়েলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের নিরাপত্তা আমার অবশ্যই প্রয়োজন নেই। তোমরা আমার ভাইকে অন্যায়ভাবে শহীদ করেছ। আমি তার ছাড়া বেঁচে থেকেই কি করবো। অতপর তরবারী চালাতে চালাতে মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং দু'জনকে জাহান্নামে প্রেরণ করে স্বয়ং শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী (যাঁকে আমের বিন তোফায়েল নিজের মাতার একটি মানত পুরো করার জন্য মুক্তি দিয়েছিল) মদীনা গিয়ে যখন এই খবর হুজুরকে (সা) শুনালেন তখন তিনি খুব দুঃখ পেলেন। হযরত মুনযিরের (রা) শাহাদাতের ঘটনা শুনে তিনি বললেন, সে মৃত্যুর দিকে অগ্রগমন করেছে। সে সময় থেকে হযরত মুনযিরের (রা) লকব "আল মুয়ান্নিক লিল মওত" হিসেবে মশহুর হয়ে যায়।

এই উপাধি একথার নিদর্শন যে, হযরত মুনযির (রা) বিন আমর হক পথে আগুয়ান হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত আমর (আল উছাইরিম) (রা) বিন ছাবিত আশহালী

সাইয়েদেনা হযরত আবু হুরাইরার অন্তর ছিল নবীর (সা) হাদীসের ভাণ্ডার। তিনি নিজের মজলিশে জ্ঞানের মুক্তা বিতরণ করতেন। এই জ্ঞানের মুক্তা কি ছিল? নবী যুগের পবিত্র ঘটনাবলী অথবা মহানবীর (সা) ইরশাদসমূহ তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে নিজের শিষ্য ও মজলিশে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে শুনাতেন। কখনো মনে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হলে শিষ্যদেরকে পরীক্ষামূলকভাবে জিজ্ঞেস করতেন ঃ

"এমন কোন ব্যক্তির নাম করো, যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি ; অথচ সোজা বেহেশতে চলে গেছেন।"

সকল শাগরিদ বা শিষ্য এক বাক্যে জবাব দিতেন ঃ "আল উছাইরিম—আবদুল আশহাল।" যদি শিষ্যরা চুপ থাকতো তাহলে নিজেই বলতেন ঃ "এই ব্যক্তি ছিলেন আল উছাইরিম—আবদুল আশহাল।"

এই আল উছাইরিম আবদুল আশহাল আওস গোত্রের বনু আবদুল আশহাল শাখার চোখের মনি ছিলেন। আসল নাম ছিল আমর। ছাবিত (রা) বিন ওয়াকশ (বিন যাগবাহ বিন যাউরা' বিন আবদুল আশহাল)-এর কলিজার টুকরা ছিলেন। মাতার নাম ছিল লাইলা বিনতে হাছিলুল ইয়ামান (রা) এবং তিনি মুহরিমে আসরারে নবুওয়াত হযরত হুজাইফাহ (রা) বিন হাছিলুল ইয়ামান (রা)-এর সহোদরা ছিলেন। আল উছাইরিম আমর বিন ছাবিত যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন তারপর যেভাবে হক পথে নিজের জীবন কুরবান করেছিলেন তা ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের (রা) মস্তিষ্কে ছবির মত বিদ্যমান ছিল। তাদের মজলিশে কখনো ওহোদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আল উছাইরিম (রা)-এর ঈমানী আবেগ ও সারফরোশীর কথাও অবশ্যই এসে যেত।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগী প্রচেষ্টায় সাইয়েদুল আওস হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আশহালী ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেই সুস্থির থাকতে পারলেন না বরং তিনি যে ঈমানী নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তা তাঁর কবিলা আবদুল আশহালের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় তৎপর হলেন।

www.bjilibrary.com

ইসলাম গ্রহণের পর বাড়ী ফিরে গেলেন। কবিলার সকলকে একত্রিত করলেন এবং সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা ?"

সবাই বললো ঃ "আপনি আমাদের সরদার এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞ এবং সঠিক রায়ের অধিকারী।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ বললেন ঃ "তাহঁলে শুনে নাও, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলে বরহকের উপর ঈমান এনেছি। তোমরাও যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনবে ততক্ষণ তোমাদের পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা বলা হারাম।"

হযরত সায়াদ (রা) নিজের গোত্রে অসাধারণ প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তাঁর ঈমানী আবেগ দেখে একজন যুবক ছাড়া কবিলার সকলেই সন্ধ্যার পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন। ঈমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এই যুবক ছিলেন আল উছারিম আমর বিন ছাবিত। তাঁর পিতা ছাবিত (রা) বিন ওয়াকশ, চাচা রাফায়াহ (রা) বিন ওয়াকশ, নানা হাছিলুল ইয়ামান (রা), নানী বুবাব (রা) বিনতে কা'ব এবং মামা হুজাইফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু যুবক আমর (রা) বিন ছাবিতের অন্তর নরম হলো না এবং সে যথানিয়ম নিজের পুরাতন ধর্মের ওপর কায়েম রইলো। বনু আবদুল আশহালের সম্মানিত ব্যক্তি হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ, হযরত উসাইদ (রা) বিন হুজাইর এবং খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝালেন যে, সেও যেন হক দ্বীন কবুল করে। কিন্তু তিনি তা মানেননি এবং এমনিভাবে চার বছর কাটিয়ে ছিলেন। সেই সময় রহমতে আলম (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং বদরের যুদ্ধও অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে) বিশ্বনবী (সা) জাননিছার সাহাবীদের সমভিব্যাহারে ময়দানে তাশরীফ নিলেন। এ সময় আমর বিন ছাবিত মদীনা উপস্থিত ছিলেন না। ফিরে এসে দেখলেন যে, মহল্লা সুনসান পড়ে রয়েছে। বাড়ী গিয়ে মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের খান্দানের লোকজন কোথায় গেছে ? জবাব পেলেন ঃ "রাসূলের (সা) সঙ্গে ওহোদ গেছে।"

একথা শুনে অন্তরে হক এবং সত্য সম্পর্কে আবেগ সৃষ্টি হলো। তৎক্ষণাৎ যিরাহ পরিধান করলেন। নিজে তা মাথার ওপর রাখলেন। অস্ত্রে দেহ সজ্জিত করলেন এবং ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা দিলেন। তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। আমর (রা) নবীর (সা) নিকট পৌছে আরজ

করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! যুদ্ধের ময়দান গরম হওয়ার উপক্রম। বলুন, আগে ইসলাম গ্রহণ করবো অথবা আগের মতই আপনার সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করবো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "উভয় কাজই করো। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর এবং তারপর আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো।"

আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি এক রাকায়াত নামাজও পড়িনি। যুদ্ধে যদি শেষ হয়ে যাই তাহলে কি আমার পূর্বেকার গুনাহ্ মাফ হবে ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বড় গফুরুর রাহীম।"

একথা শুনে তৎক্ষণাৎ কালমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শুরু হলে তিনিও তরবারী হাতে ময়দানে পৌছলেন। বনু আবদুল আশহাল তাঁর কঠিন অন্তরের কথা জানতেন এবং তাঁরা একথা জানতেন না যে, কিছুক্ষণ পূর্বে সে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমর (রা)-কে নিজেদের ব্যূহে বা কাতারে দেখে ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। কোন কাফেরের সাহায্য তাদের প্রয়োজন নেই—একথাও তারা বললেন। উছাইরিম (রা) অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমিও মুসলমান।

তারপর তরবারী চালাতে চালাতে বীরবিক্রমে কাফেরদের কাতারে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করলেন যে, কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন। শেষে অনেক মুশরিক হামলা করে গুরুতর আহত করলেন এবং তিনি অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যুদ্ধের পর বনু আবদুল আশহালের লোকজন নিজেদের শহীদ ও আহতদেরকে উঠাতে লাগলেন। এ সময় তাঁর উপরও নজর পড়লো। তখনও কোনক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "জাতীয় চেতনা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কি ?"

তিনি বললেন ঃ "না, আমি মুসলমান হয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য লড়াই করেছি।"

এ অবস্থায় তাকে উঠিয়ে বাড়ী আনা হলো। সমগ্র বনু আবদুল আশহালে এই খবর ফের মশহুর হয়ে গেল। আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ সে সময় আল উছাইরিমের (রা) সুপ্রসন্ন ভাগ্যের ঈমানের উপর আনন্দপূর্ণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলেন

www.bjilibrary.com

এবং আল উছাইরিমের (রা) সহোদরার নিকট থেকে সকল ঘটনা শুনলেন। ইত্যবসরে আল উছাইরিম (রা) শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং জান্নাতের পথ ধরলেন। বিশ্বনবী (সা) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে বললেন ঃ

اِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

"অবশ্যই তিনি অন্যতম জান্নাতবাসী।"

عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا

"সে আমল কম করেছে, কিন্তু সওয়াব পেয়েছে অনেক।"

হযরত আল উছাইরিম আমর বিন ছাবিত (রা)-এর খান্দান বনু আবদুল আশহাল আগে থেকেই কম সম্ভ্রান্ত ছিলো না। এই ঘটনা তার মর্যাদা আরো উঁচুতে তুলে দিলো। বনু আবদুল আশহাল আল উছাইরিমের (রা) উপর গৌরব প্রকাশ করতো। তিনি একটি সিজদাও দেননি। কিন্তু বেহেশতে দাখিল হয়ে গেছেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত মায়ান (রা) বিন আদি বালবী

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। এ সময় সাহাবায়ে কিরামের (রা) উপর কিয়ামত ভেঙ্গে পড়লো এবং তাঁরা মহাশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাদের নিকট দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, হায় ! আমরা যদি রাসূলের (সা) সামনে মরে যেতাম, তাহলে আমাদেরকে এই সময় দেখতে হতো না। এখন আল্লাহই জানেন, মহানবীর (সা) পর আমরা কোন্ কোন্ মুসিবতের সম্মুখীন হই। রাসূলের (সা) একজন সাহাবী (রা) একথা শুনে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"ভাইয়েরা ! আমি তো মহানবীর (সা) সম্মুখে মরে যেতে অপসন্দ করি। আমার তো আকাংখা হলো আমি মহানবীর (সা) সম্মুখে যেভাবে তাঁকে (সা) সত্য বলেছি ; হুজুরের (সা) ওফাতের পরও তাঁকে সেভাবেই সত্য বলবো।"

এই মরদে মু'মিন যাঁর অন্তরে হাদিয়ে বরহক (সা)-এর ওফাতের পরও তাঁকে সত্য বলা প্রশ্নে উন্মাদনা ছিল—তিনি ছিলেন হযরত মায়ান (রা) বিন আদি।

সাইয়েদেনা হযরত মায়ান (রা) বিন আদির সম্পর্ক কাজায়াহ্ গোত্রের বাল্লী খান্দানের সঙ্গে ছিল। এই খান্দান আওস গোত্রের আমর বিন আওফের খান্দানের মিত্র ছিল। নসবনামা হলো ঃ

মায়ান (রা) বিন আদি বিন আল জাদ্ বিন আজলান বিন হারিছাহ্ বিন জায়াল বিন আমার বিন ছাওম বিন জুবিয়ান বিন হামিম বিন জাহাল বিন বাল্লী।

হযরত মায়ান (রা) বিন আদির বড় ভাই ছিলেন হযরত আছিম (রা) বিন আদি। তিনি বনু আজলানের সরদার ছিলেন। জাহেলী যুগে হযরত মায়ান (রা) বিন আদি শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিত্বই ছিলেন না বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাবও দান করেছিলেন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর পর মদীনা মুনাওয়ারাতে ইসলামের প্রথম দায়ী হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগি প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত মায়ান (রা) বিন আদিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর হজ্জের যামানায় তিনি মদীনা মুনাওয়ারার ৭৫জন ঈমানদারের সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জমা গমন করেন এবং "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা"তে রহমতে আলমের (সা) বাইয়াতের মর্যাদা

www.bjilibrary.com

লাভ করেন। সেই প্রতিশ্রুতিময় বাইয়াতে যেসব ব্যক্তি শরীক হয়েছিলেন তাঁদের বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং ইখলাস ফিদ্বীন-এর এমন নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন যার স্মৃতি আজও প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরকে আলোকজ্জ্বল করে তোলে। সময়টা ছিল এমন যে, যখন আরবের সকল স্থান থেকে দ্বীনে হকের বিরোধিতার আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিল। ইয়াসরাবের সেই বীর পুরুষের একটি ছোট্ট দল নিজেদেরকে মক্কার ইয়াতীম নবীর (সা) রহমতের আঁচলের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন এবং তাঁর সঙ্গে এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তিনি (সা) ইয়াসরাবে তাশরীফ নিলে তাঁরা তাদের নিজের জীবন ও সন্তানসহ তাঁকে সাহায্য এবং হিফাজত করবেন। অতপর যখন হুজুর (সা) শুভ পদার্পণের মাধ্যমে ইয়াসরাবকে ধন্য করেছিলেন তখন তাঁরা নিজেদের প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখালেন এবং এমন কুরবানী বা ত্যাগ ছিল না যা তারা হক পথে পেশ করেনি। হযরত মায়ান (রা) বিন আদি সেই হক পুরুষদের অন্যতম ছিলেন।

হিজরতের কয়েক মাস পর বিশ্বনবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত মায়ান (রা) বিন আদিকে হযরত ওমর ফারুকের (রা) বড় ভাই হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের দ্বীনি ভাই বানালেন। সেই যামানায় হযরত মায়ানের (রা) বড় ভাই হযরত আছিম (রা) বিন আদিও ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে দুই সহোদর ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত মায়ান (রা) বদর, ওহোদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি সকল যুদ্ধেই নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর আনসাররা সকিফায়ে বনু সায়েদাতে একত্রিত হয়ে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফা বানাতে চাইলে হযরত মায়ান (রা)-এর মত তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল এবং তিনি কুরাইশ মুহাজিরদের মধ্য থেকেই খলিফা নির্বাচন হওয়ার প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সমর্থক আনসারী হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহর সঙ্গে উঠে সেখান থেকে চলে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং অন্যান্য কতিপয় মুহাজিরের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। উভয় বুজর্গই তাঁদেরকে আনসারদের সমাবেশ এবং ইচ্ছার কথা অবহিত করলেন এবং তাদেরকেই (মুহাজিরদের) খিলাফতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তা সত্ত্বেও মুহাজিররা সকিফায়ে বনু সায়েদাতে যাওয়াটা উচিত মনে করলেন এবং সেখানেই হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) রাসূলের (সা) খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) থেকে এক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আমরা যখন সকিফায়ে বনু সায়েদার দিকে যাচ্ছিলাম তখন পথিমধ্যে আনসারের দুই নেক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা আমাদেরকে আনসারদের সমাবেশ ও ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করেন।"

"দুই নেক ব্যক্তি" বলতে হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত মায়ান (রা) বিন আদি এবং হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাকেই বুঝিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন ছড়িয়ে পড়লো। এই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এমন বুলন্দ হিম্মত এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন যে, তার উদাহরণ ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। তিনি মুরতাদদের কোন ধরনের প্রশ্রয় দানে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো যতক্ষণ তারা দ্বীনে হকের সকল হুকুম-আহকাম সম্পূর্ণরূপে না মানবে। সুতরাং তিনি মুরতাদদের নির্মূলের জন্য ১১টি বাহিনী তৈরী করলেন। অভিজ্ঞ জেনারেলদের নেতৃত্বে এসব বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত মুরতাদদের সঙ্গে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অবশেষে মুরতাদরা লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করলো। এই প্রসঙ্গের সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ামামার ময়দানে মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। সে সময় ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং হযরত মায়ান (রা) বিন আদিও এই বাহিনীতে শামিল ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁকে দু'শ সওয়ার দিয়ে প্রথমেই ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। যখন সাধারণ যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত মায়ান (রা) মাথা হাতে রেখে যুদ্ধ করলেন। মুরতাদদের একটি দল তার ওপর হামলা করে তীর, তরবারী এবং নেযার বর্ষা বইয়ে দিলো। আর এমনিভাবে সেই জানবাজ মরদ শাহাদাতের রক্তের কাফন পরে প্রকৃত স্রষ্টার নিকট গিয়ে হাজির হলেন। তিনি এ সময় কোন সন্তান রেখে যাননি।

www.bjilibrary.com

হযরত তালহা (রা) বিন
আল বারা' আনসারী

প্রথম বাইয়াতে উকবার পর হযরত মাসয়াব (রা) ইবনুল উমায়ের ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে ইয়াসরিব তাশরীফ নেন। তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা এবং অলি-গলিতে তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ হতে লাগলো।

আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আওসের এমন কোন পরিবার ছিল না যে, ইসলাম নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু বারা' বিন উমায়ের (বিন ওয়াবরাহ বিন ছা'লাবাহ বিন গানাম বিন সাররি বিন সালমাহ বিন আনিফ)-এর জ্ঞানের উপর জাহেলীর মোটা পরদা পড়েছিল। সে হক দাওয়াতের আওয়াজ শুনতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো। সে বাল্লি গোত্রের একজন মর্যাদাবান মানুষ ছিল এবং তার বংশ ছিল আমর বিন আওফের মিত্র। তার খান্দানের বেশীর ভাগ মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বারা' যথাযথভাবে নিজের পিতৃ ধর্ম আঁকড়ে পড়ে রইলো। এদিকে বারা'র যুবক পুত্র তালহার অবস্থা অন্য ধরনের ছিল। তালহা ছিল এক কমনীয় যুবক এবং স্বগোত্রের ভূষণ। আল্লাহ তায়ালা তাকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। সে আওস ও খাজরাজের যুবকদেরকে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে দেখলো। তাতে তার অন্তরেও দ্বীনে হকের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সৃষ্টি হলো। এমনকি তিনি নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই প্রকাশ্যে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা বলতে শুরু করলেন। বিশ্বনবী (সা) মক্কা থেকে ইয়াসরাব হিজরতের ইরাদাহ করলেন। এ সময় ইয়াসরাবের প্রতিটি ধূলিকণাও ইয়াতীম নবীর (সা) আগমন অপেক্ষায় ইনতিজার করতে লাগলো। বৃদ্ধ, যুবক, মহিলা ও শিশু সকলেই রহমতে আলমের (সা) এরূপ দর্শনাকাংখী ছিলেন যে, চারদিকে শুধু ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা। তালহাও (রা) নবী (সা) দর্শন প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন এবং অত্যন্ত অস্থিরতার সঙ্গে সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) শুভ পদার্পণের অপেক্ষায় ছিলেন।

সাইয়েদুল আনাম খাইরুল খালায়েক রহমতে আলমের (সা) ইয়াসরাব শুভাগমন হলে এই পুরাতন শহরের ভাগ্য জেগে উঠলো। এই শহর ইয়াসরাব থেকে "মদীনাতুন নাবীতে' পরিণত হলো। শহরটির অলি-গলি মহানবীর (সা)

www.bjilibrary.com

শুভাগমনে ঝলমল করে উঠলো এবং চারদিকে বসন্তের সমীরণ বইতে লাগলো। আনসারদের খুশীর সীমা-পরিসীমা ছিল না। আনন্দে মাটিতে পা ধরে না। বিশ্বনবীকে (সা) নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা নিজকে সারা দুনিয়ার মালিক মনে করতে লাগলো। নওজোয়ান তালহা (রা) রাসূলের (সা) নিকট হাজির হতেই হুজুরের (সা) পবিত্র আলোকজ্জ্বল চেহারা নজর পড়লো এবং তা দেখেই আত্মহারা অবস্থায় হুজুরের (সা) পবিত্র হাত চুম্বন করে আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে যে নির্দেশ দিবেন তা পালন করবো এবং আপনার নির্দেশ পালনে অবশ্যি অবশ্যি সামান্যতম কসুরও করবো না।"

রহমতে আলম (সা) তাঁর বিশ্বাসের আবেগ দেখে মুচকি হেসে দিলেন এবং বললেন, "যাও এবং নিজের পিতাকে হত্যা করো।"

তালহা (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এক্ষুণি আপনার ইরশাদের তামিল করছি। একথা বলেই তিনি বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন।

বিশ্বনবী (সা) তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিলেন ঃ "তালহা ফিরে এসো। আমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য প্রেরিত হইনি।"

প্রথম পরীক্ষাতেই তালহা (রা) উত্তীর্ণ হলেন। এই ঘটনার পর হযরত তালহা (রা) ইবনুল বারা' বিশ্বনবীর (সা) সাহচর্য এবং খিদমতের কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দিতেন না। মহানবীর (সা) প্রতি তাঁর গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রিয় নবীও (সা) তাঁর প্রতি ছিলেন সীমাহীন স্নেহপরায়ণ এবং সবসময় তাঁর প্রতি খেয়াল রাখতেন। আফসোস ! সময়টা ছিল খুবই কম !

কিছুদিন পর হযরত তালহা (রা) কঠিন অসুখে পড়লেন। এমনকি রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হতেও অক্ষম হয়ে পড়লেন। মহানবী (সা) এই খবর পেয়ে শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে নিশ্চিত হলেন যে, ইন্তেকালটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ফিরে আসার সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পৃথকভাবে মিলিত হয়ে বললেন, তালহার (রা) বাঁচার আর কোন আশা নেই। যখনই তার ইন্তেকাল হবে তখনই যেন আমাকে খবর দেয়া হয়। আমি নিজে নামাযে জানাযা পড়াবো এবং তার কাফন-দাফনে যেন বিলম্ব না ঘটে। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে একজন মু'মিনের লাশ পড়ে থাকুক তা আমি চাই না।

এদিকে হযরত তালহার (রা) ইখলাস ও রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে, রাত এলো এবং তার শেষ সময় সন্নিকট দেখে বাড়ীর সবাইকে বললো ঃ

www.bjilibrary.com

"তোমরা নিজেরাই আমাকে তাড়াতাড়ী দাফন করবে, যাতে আমি আমার রবের সঙ্গে শীঘ্র মিলিত হতে পারি এবং প্রিয়নবীকে (সা) আর খবর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পথিমধ্যে কোন ইহুদী অথবা কোন পশু তাকে (সা) কষ্ট দিতে পারে।"

এই ওসিয়াতের পর তিনি পূর্ণ যৌবনকালে মহাকালের দিকে পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলেন।

বাড়ীর লোকজন রাতেই তার লাশ দাফন করলো। সকালে মহানবী (সা) তাঁর ইন্তেকালের খবর পেলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) সমভিব্যাহারে হযরত তালহার (রা) কবরে তাশরীফ নিলেন। জানাযার নামায পড়লেন এবং হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! তালহার সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হও যে, তুমি তাকে এবং সে তোমাকে পেয়ে হাসতে হাসতে মিলিত হয়েছে।"

হযরত তালহা (রা) ইবনুল বারা' খুব কম বয়স পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ইখলাসের আবেগ এবং নিজেকে কুরবানী করার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তা ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

www.bjilibrary.com

হযরত কায়েস বিন সায়াদ সায়েদী (রা)

খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিশ্বনবীর (সা) প্রিয় জাননিছার সাহাবী ছিলেন। একবার হুজুর (সা) তাঁর সঙ্গে মুলাকাতের জন্য তাশ্‌রীফ নিলেন। প্রিয় নবীর (সা) নিয়ম ছিল যে অনুমতি ছাড়া কারোর বাড়ী প্রবেশ করতেন না। সুতরাং তিনি (সা) হযরত সায়াদের (রা) বাড়ীর দরযাতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) সালামের জবাব এত নীচু করে দিলেন যে, তা তাঁর (সা) পবিত্র কান পর্যন্ত পৌছলো না। সুতরাং বিশ্বনবী (সা) দ্বিতীয়বার বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" হযরত সায়াদ (রা) পুনরায় খুব আস্তে সালামের জবাব দিলেন। হুজুর (সা) তৃতীয়বার বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" এবারও প্রিয় নবীর (সা) সালামের জবাবে হযরত সায়াদ (রা) নিজের স্বর অত্যন্ত নীচু রাখলেন। হুজুর (সা) খেয়াল করলেন যে, সায়াদ (রা) তাঁকে অনুমতি দানে চিন্তা-ভাবনা করছেন। অতএব, তিনি (সা) ফিরে যেতে লাগলেন। হযরত সায়াদ (রা) তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি আপনার সালাম শুনছিলাম এবং আপনার সালামের জবাব এজন্য আস্তে আস্তে দিচ্ছিলাম যে, আপনি আমাকে বেশী করে সালাম দিবেন।"

হযরত সায়াদের (রা) কথা শুনে হুজুর (সা) মুচকি হেসে দিলেন এবং তাঁর ঘরের মধ্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) জন্য গোসলের ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি (সা) গোসল করলেন। তারপর হযরত সায়াদ (রা) তাঁর (সা) খিদমতে মোটা কাপড়ের একটি চাদর পেশ করলেন। চাদরটি জাফরান অথবা দরস (এক ধরনের খোশবুদার ঘাস)-এর রঙের ছিল। তিনি (সা) তা নিজের পবিত্র দেহে জড়িয়ে নিলেন এবং হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى سَعْدٍ ـ

"হে আল্লাহ ! তুমি তোমার রহমত ও মেহেরবানী সায়াদের উপর নাযিল কর।"

তারপর প্রিয় নবী (সা) খাবার খেলেন এবং ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত সায়াদ (রা) নিজের গাধা আনালেন এবং তার পিঠে চাদর

www.bjilibrary.com

বিছালেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্রকে বললেন, হুজুরের (সা) সঙ্গে যাও। হুজুর (সা) গাধার উপর সওয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাধা চলা শুরু করলো। রহমতে আলম (সা) সায়াদ (রা) পুত্রকে বললেন, আমার সঙ্গে সওয়ার হও। তিনি এটাকে আদব ও শিষ্ঠাচার বিরোধী মনে করলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গে বসার প্রশ্নে ওজর পেশ করলেন। হুজুর (সা) বললেন, সওয়ার হও অথবা ফিরে যাও। তিনি হুজুরের (সা) সঙ্গে বসার সাহস না করে ফিরে চলে গেলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর এই ভাগ্যবান পুত্র সাইয়েদুল আনামকে (সা) এত আদব ও সম্মান দিতেন—তিনি ছিলেন হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা)।

সাইয়েদেনা আবুল ফজল হযরত কায়েস বিন সায়াদ (রা) মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের বনু সায়েদা বংশের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিন ছুাইম বিন হারিছাহ বিন হাযাম বিন খুজাইমাহ বিন ছালাবাহ বিন তুরায়েফ বিন খাজরাজ বিন সায়েদাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজ আকবার।

মাতার নাম ফাকিহাহ (রা) বিনতে উবায়েদ বিন ছুলায়েম ছিল। তিনিও বনু সায়েদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং হযরত কায়েসের (রা) পিতার চাচার কন্যা ছিলেন।

হযরত কায়েসের (রা) সম্মানিত পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ খাজরাজের মহান নেতা এবং রাসূলের (সা) সভাসদের অন্যতম বিশেষ সদস্য ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন মহান মর্যাদাবান সাহাবীই ছিলেন না বরং তাঁর মাতা [হযরত উমরাহ (রা) বিনতে মাসউদ] এবং স্ত্রীও (হযরত ফাকিহাহ) সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত কায়েস (রা) এই পরিবারেই বয়োপ্রাপ্ত হন এবং মাতা-পিতার মত নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, বিশ্বনবী (সা) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ একদিন হযরত কায়েসকে (রা) সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট হাজির হলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! এ আমার পুত্র কায়েস। আমি তাকে আপনার হাওয়ালা করছি। আপনি তার থেকে কাজ নিন।"

হযরত কায়েসও (রা) জান-প্রাণ দিয়ে নিজেকে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন এবং এমনিভাবে তিনি মহানবীর (সা) স্নেহের পাত্রে

www.bjilibrary.com

পরিণত হয়ে গেলেন। চরিতকাররা লিখেছেন, নবুওয়াতের দরবারে তাঁর নৈকট্যের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তার প্রমাণ মেলে সহীহ বুখারীর হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের বর্ণনায়। তাতে বলা হয়েছে, কায়েস (রা) রাসূলের (সা) দরবারে সেই মর্যাদা রাখতেন যে মর্যাদা কোন বাদশাহর নিকট সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসারের হয়ে থাকে।

হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ লম্বা ও স্থুলদেহী ছিলেন। গাধার পিঠে চড়লে পা মাটিতে ঠেকে যেত। প্রকৃতিগতভাবে মুখে দাড়ি ছিল না। মদীনাবাসী ঠাট্টা করে বলতেন, হায় ! তার জন্য যদি একটি দাড়ি কেনা যেত। অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। বাহ্যিক চেহারা যেমন সুন্দর ছিল তেমনি অন্তরও ছিল সুন্দর। অত্যন্ত বাহাদুর, পবিত্র, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং সঠিক মতের অধিকারী ছিলেন। উদারতা ও দানশীলতার মত গুণাবলী বাপ-দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি আরবের দরিয়া দিল মানুষদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। প্রচণ্ড জিহাদের আবেগ ছিল। রাসূলের (সা) যুগের অধিকাংশ যুদ্ধে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা সারিয়্যাহ সাইফুল বাহর অথবা জাইশুল খাবত (অষ্টম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত) এবং বিজয় যুদ্ধে (অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে) তাঁর অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সাইফুল বাহর অভিযানের নেতৃত্ব বিশ্বনবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জারাহ-এর উপর অর্পণ করেছিলেন। তার সঙ্গে তিনশ'জন মুহাজির ও আনসার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদও ছিলেন। এই অভিযান বনু জাহিনাহর এলাকার দিকে কুরাইশের কাফেলার খোজ-খবর নেয়া অথবা তাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এলাকাটি মদীনা তাইয়্যেবা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে সমুদ্রপোকূলে অবস্থিত ছিল। এজন্য তাকে সারিয়্যাহ (সাইফুল বাহর বলা হয়ে থাকে। (সাইফুল বাহর অর্থ সমুদ্রের কূল।) জাহিশুল খাবাত অথবা সারিয়্যাহ খাবাত তাকে এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, এই অভিযানকালে রসদ খতম হয়ে যাওয়ার কারণে মুসলমানদেরকে গাছের পাতা পেড়ে খেতে হয়েছিল। খাবাত বলা হয় বৃক্ষের সেই পাতাকে যা লাঠি প্রভৃতি দিয়ে পাড়া হয়। সহীহ বুখারীতে আছে, মুজাহিদরা সমুদ্রোপোকূলে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের রসদ-পত্তর শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা গাছের পাতা পেড়ে খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত কায়েস (রা) এই অবস্থা দেখে তিনবার তিন তিনটি উট ধার নিয়ে জবেহ করান এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) বললেন, তাকে

www.bjilibrary.com

বাধা দিন। নচেৎ সে নিজের পিতার সম্পদ এভাবেই ব্যয় করে ফেলবে। সুতরাং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাঁকে আরো উট জবেহ করানো থেকে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে, এই অভিযানকালে যখন পাতা খেয়ে খেয়ে আমাদের কলজে জখম হয়ে গেল তখন একদিন সমুদ্রের ঢেউ এক বিরাট জলজ জন্তু আমাদের দিকে কিনারায় নিক্ষেপ করলো। তাকে আম্বর বলা হয় (এটা ওয়াহিল অথবা দ্বিতীয় কোন বড় মাছ ছিল)। আমরা (সংখ্যায় তিনশ') অর্ধ মাস পর্যন্ত সেই প্রাণীর গোশত খেয়ে কাটিয়েছিলাম এবং আমরা সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সেই মাছের দেহটার অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তার লেজ তুলে ধরতে নির্দেশ দিলেন এবং সবচে দীর্ঘ দেহী মানুষ (হযরত কায়েস বিন সায়াদ)-কে সবচে দীর্ঘ দেহী উটের ওপর সওয়ার করিয়ে তার নীচ দিয়ে যেতে বললেন। তিনি বিনা বাধায় অতিক্রম করে গেলেন এবং লেজ তাঁর মাথা থেকে উপরেই রয়ে গেল। একদিন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) লোকদেরকে মাছটির চোখের গর্তে বসার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং ১৩জন সাহাবী সহজভাবেই তাতে বসে গেলেন। মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে আমরা বেঁচে যাওয়া গোশত পাথেয় হিসেবে সঙ্গে নিলাম। মদীনা পৌঁছে আমরা রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উদর পূর্তির জন্য তা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। যদি তার কিছু গোশত সঙ্গে এনে থাকো তাহলে আমাকেও খাওয়াও। আমরা হুজুরের (সা) খিদমতে গোশত পেশ করলাম এবং তিনি তা খেলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, সারিয়্যাহ সাইফুল বাহর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সাহাবীরা (রা) হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা)-এর উট জবেহ করানোর ঘটনা হুজুরের (সা) নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ "উদারতা এবং দানশীলতা সেই পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"

সহীহ বুখারীতে আছে, সাইফুল বাহর অভিযান থেকে ফিরে এসে হযরত কায়েস (রা) নিজের পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মুসলমানদের উপবাসের অবস্থার কথা শুনালেন। শুনে তিনি বললেন, উট জবেহ করাতে। জবাব দিলেন, আমি তাই করিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন মুসলমানদের সেই একই অবস্থা দাঁড়ায়। হযরত সায়াদ (রা) বললেন, আরো উট জবেহ করাতে। আরজ করলেন, আমি তাই করিয়েছি। কিন্তু তারপর মুসলমানরা পুনরায়

উপবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লো। তিনি বললেন, আবার জবেহ করাতে। হযরত কায়েস (রা) বললেন, আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে।

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, জাহিগুল খাবাত প্রসঙ্গে কোন এক ব্যক্তি হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে বললেন যে, হযরত কায়েসকে (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ইঙ্গিতে আরো উট জবেহ করানো থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। কেননা, তাঁরা বলেছিল যে, সে নিজের পিতার সম্পদ এভাবে ব্যয় করে ফেলবে। একথা শুনে হযরত সায়াদ (রা) বিন উদাবাহ্ তৎক্ষণাৎ বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর (সা) পবিত্র পিঠের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"ইবনে আবি কোহাফাহ এবং ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে কেউ জবাব দিক যে, তারা আমার পুত্রকে কেন বখিল বানাতে চায় ?"

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ সেই দশ হাজার পবিত্র মানুষের মধ্যে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় রহমতে আলমের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। হযরত কায়েসের (রা) পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ নবীর (সা) দরবারে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হুজুর (সা) নিজের ঝাণ্ডা তাঁর নিকট রেখেছিলেন। তিনি সেই ঝাণ্ডা উঁচিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সঙ্গে আনসারদের আগে আগে চলছিলেন। রাস্তায় একস্থানে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে (রা) সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা)-এর নজর হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) উপর পড়লে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

اليوم يوم الملحمل - اليوم تسحل الحرمه

"আজকের দিন হলো রক্তাক্ত (কঠিন যুদ্ধ) দিন। আজ কা'বা (হারাম) হালাল করা হবে। (অথবা আজকের দিন সম্মান পদদলিত করা হবে)।"

বিশ্বনবীকে (সা) এই খবর দেয়া হলো। বলা হলো, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী (রা) প্রদত্ত খবর মুতাবিক সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এই এই বলছেন। তখন তিনি (সা) বললেন, সায়াদ ভুল বলেছে। আজ কা'বার মর্যাদা দ্বিগুণ হবে। আজ কা'বার গিলাফ পরানো হবে। অতপর মহানবী (সা) ঝাণ্ডা সায়াদ থেকে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েসকে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং রাসূলের (সা) ঝাণ্ডা হযরত কায়েসের (রা) হাতে এলো।

www.bjilibrary.com

তখন হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার ঝাণ্ডা কায়েস ছাড়া অন্য কারোর কাছে সোপর্দ করুন। আমার ভয় হলো, কুরাইশের বিরুদ্ধে কায়েসের প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে না উঠে।"

হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) কথা মেনে নিলেন এবং হযরত কায়েসের (রা) নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের হাওয়ালা করে দিলেন।

মহানবীর (সা) ইনতিকালের পর হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা)-এর রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার সন্ধান হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে পাওয়া যায়। তিনি প্রথম থেকেই হযরত আলীর (রা) সঙ্গে একনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ভালোবাসা পোষণ করতেন। সাইয়েদেনা আলী মুরতাজাও (রা) তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হযরত কায়েসকে (রা) মিসরের গবর্নর নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মিসরের প্রশাসন চালালেন। কিন্তু কুফাবাসী নানা কারণে মিসরে হযরত কায়েসের (রা) গবর্নরী পসন্দ করেনি। তারা হযরত আলীর (রা) সামনে মিসরের অবস্থা এমনভাবে তুলে ধরলো যে, আমীরুল মু'মিনিন (রা) হযরত কায়েসকে (রা) মিসরের গবর্নরী থেকে সরিয়ে দিলেন এবং তাঁর স্থলে মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে (রা) মিসরের গবর্নর নিয়োগ করলেন। হযরত কায়েস (রা) মিসর থেকে মদীনা চলে এলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনায় তাঁর উপস্থিতি পসন্দ করলো না। সুতরাং তিনি কুফা চলে গেলেন এবং ইবনে আছিরের (র) বর্ণনা মুতাবিক সেখানেরই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। হযরত কায়েস (রা) হযরত আলীর (রা) অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর সিফ্ফীনের যুদ্ধে শরীক হন এবং কয়েকবার হযরত আলীর (রা) বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর খারেজীরা শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তখন হযরত আলী (রা) তাদের নির্মূলের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলেন। এই প্রসঙ্গে নাহরওয়ানের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সেই যুদ্ধে হযরত কায়েস (রা) নিজের সকল গোত্রের সঙ্গে হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে শামিল ছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হযরত আলী (রা) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হযরত কায়েসকে (রা) আলোচনা বা যুদ্ধ প্রদর্শনের জন্য খারেজীদের নিকট প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের পথ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা। আলোচনাকালে খারেজী সরদার আবদুল্লাহ বিন সানজার বললো, আমরা আপনাদেরকে সমর্থন করতে পারছি না। অবশ্য যদি ওমর (রা) বিন খাত্তাবের মত কোন ব্যক্তি হলে তার খিলাফত

আমরা মানতে পারি। হযরত কায়েস (রা) বললেন, "আমাদের মধ্যে আলী (রা) বিন আবি তালিব মওজুদ রয়েছেন। তোমরা তাঁর মর্যাদার কোন ব্যক্তিকে পেশ করো।" আবদুল্লাহ বিন সানজার বললো, আমাদের মধ্যে ঐ মর্যাদার কোন ব্যক্তিত্ব নেই। হযরত কায়েস (রা) বললেন, তাহলে তোমরা অবিলম্বে নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও। আমার যেন মনে হয় তোমাদের অন্তরে ফিতনা শিকড় নিচ্ছে। এই আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তাতে খারেজীদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু শাহাদাত পেলেন এবং সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় হযরত কায়েস (রা) তাঁর হাত হয়ে গেলেন।

সাইয়েদেনা হযরত হাসানের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে আমীর মুয়াবিয়া (রা) এক বিরাট বাহিনী সিরিয়া থেকে ইরাক প্রেরণ করলেন। হযরত কায়েস (রা) এই খবর পেয়ে পাঁচ হাজার অমিত বিক্রম যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে সিরীয় বাহিনীকে বাধাদানের জন্য আম্বার পৌছলেন। এসব যোদ্ধা মাথা কামিয়ে রেখেছিল এবং মৃত্যুর বাইয়াত করে প্রস্তুত ছিল। সিরীয় বাহিনী আম্বারের চারপাশ ঘিরে নিল। ইত্যবসরে ইমাম হাসান (রা) এবং আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। হযরত হাসান (রা) হযরত কায়েসকে (রা) লিখে পাঠালেন যে, আম্বার সিরীয়দের হাওয়ালা করে মাদায়েনে আমার নিকট এসে যাও। হযরত কায়েস (রা) এই পত্র পেয়ে খুব মনোকষ্ট পেলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে একত্রিত করে বললেন, এখন আমাদের দু'টোর মধ্যে একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা আমীর মুয়াবিয়ার (রা) বাইয়াত। সকল সঙ্গী একবাক্যে বললেন, বর্তমান অবস্থায় আমীর মুয়াবিয়ার (রা) বাইয়াত করাটাই উত্তম। অতএব, হযরত কায়েস (রা) তাদের জন্য আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট থেকে আমান বা নিরাপত্তা গ্রহণ করলেন এবং সকলকে নিয়ে মাদায়েন চলে এলেন। কিছুদিন পর মাদায়েন থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা করলেন। সফরকালে প্রতিদিন সঙ্গীদের জন্য নিজের একটি করে উট জবেহ করাতেন। মদীনা পৌছে তিনি সকল ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করলেন এবং নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে গেলেন। ৬০ হিজরীতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মদীনার অনেক মানুষ তাঁর নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঋণ পরিশোধের সামর্থ রাখতেন না। এজন্য হযরত কায়েসের (রা) শুশ্রূষার জন্য আসতে লজ্জা পেতেন। হযরত কায়েস (রা) তাঁদের অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তাঁদের ঋণের ক্ষমা সম্পর্কিত

www.bjilibrary.com

ঘোষণা প্রদান করালেন। এবং বললেন যে, কারোর কাছ থেকেই তিনি ঋণের অর্থ নেবেন না। এই ঘোষণা শুনে শহরবাসী সকলেই তাঁর শুশ্রূষার জন্য ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত কায়েস (রা) বালাখানাতে অবস্থান করছিলেন। মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ে বাসভবনের সিঁড়ি ভেঙ্গে পড়লো। হযরত কায়েসের (রা) এই অসুস্থতা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। অতপর তিনি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন। ইনতিকালের সময় এক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল আমের। তিনি নিজের পিতার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কায়েস (রা) ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস হাদীসগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এসব হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত আবু মাইসারাহ (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (র) এবং শা'বীর (র) মত উম্মাহর বিজ্ঞজনরা রয়েছেন।

হযরত কায়েসের (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা। রাসূল প্রেম, উদারতা এবং দানশীলতা, ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ, দক্ষতা, বিজ্ঞতা ও কৌশল প্রিয়তা এবং বীরত্ব। মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিশ্বনবীর (সা) প্রতি এত আদব প্রদর্শন করতেন যে, তাঁর (সা) বরাবর বসতেনও না। হুজুরের (সা) প্রতি ছিল অসীম ভালোবাসা এবং তাঁর (সা) খিদমতকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। এ কারণেই মহানবীর (সা) নৈকট্যলাভ করতে পেরেছিলেন। উদারতা এবং দানশীলতায় বাপ-দাদার সত্যিকার উত্তরাধিকার ছিলেন। চরিতকাররা এ ব্যাপারে একমত যে, উদারতা এবং দানশীলতায় তিনি ছিলেন উদাহরণ স্বরূপ। স্বয়ং মহানবী (সা) তাঁর দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। হযরত কায়েসের (সা) পরদাদা দুলায়েম, দাদা উবাদাহ পিতা সায়াদ (রা) এবং স্বয়ং নিজে সমকালের মশহুর দাতা ছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, দুলায়েম নিজের জীবিতকালে এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। এই ব্যক্তি বনু সায়েদার দুর্গ থেকে তাদের পক্ষ থেকে ডেকে ডেকে বলতো যে, যদি কারোর ভালো খাবার, গোশত এবং তেল খাওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে সে যেন তাদের দুর্গে যায়। বস্তুত তাদের বাড়ী আম মেহমানখানা হয়ে গিয়েছিল। দুলায়েম-এর পর উবাদাহ, উবাদাহর পর সায়াদ (রা) এবং সায়াদের (রা) পর হযরত কায়েস (রা) সেই প্রথা তেমনি কায়েম রেখেছিলেন।

একবার এক বৃদ্ধা তাঁর নিকট এলো এবং নিজের দারিদ্রতার কথা এভাবে প্রকাশ করলো যে, তার ঘরে কোন আনাজ নেই। বললেন, ঠিক আছে। যাও, এখন তোমার ঘরে শুধু আনাজ আর আনাজই দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে

www.bjilibrary.com

খাদেমদেরকে তার বাড়ী খাদ্য, তেল এবং অন্যান্য খাবার বস্তু দিয়ে পূর্ণ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, কাছির বিন সালত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি মারওয়ানকে লিখলো যে, তুমি কাছিরের বাড়ী কিনে নাও। যদি সে বিক্রি করতে অস্বীকার করে তাহলে আমার কাছ থেকে নেয়া ঋণের অর্থ ফেরতদানের দাবী করো। যদি সে ঋণ দিয়ে দেয় তাহলে তো ভালো। নচেৎ বাড়ী বিক্রি করে দেবে। মারওয়ান কাছিরকে ডেকে তিনদিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন নচেৎ বাড়ী বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে বললেন। সে বাড়ী বিক্রি করতে চাচ্ছিল না এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ৩০ হাজার পরিমাণ প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত পেরেশানী অবস্থায় হযরত কায়েসের (রা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর নিকট ত্রিশ হাজার ঋণ চাইলো। তিনি নির্দ্বিধায় তা দিয়ে দিলেন। সে এই অর্থ নিয়ে মারওয়ানের নিকট এলো। তখন মারওয়ানের অন্তর বিগলিত হলো এবং সে অর্থ ও বাড়ী উভয়ই তার হাওয়ালা করে দিল। সে সেখান থেকে সোজা হযরত কায়েসের (রা) নিকট গেলো এবং ৩০ হাজার পরিমাণ অর্থ তাঁকে ফিরিয়ে দিল। তিনি এই অর্থ নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি যা দিয়েছি তা আর ফেরত নেই না।

হযরত কায়েসের (রা) পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালের শুরুতে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। রওয়ানার পূর্বে তিনি নিজের সকল সহায়-সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। তার অংশতো তিনি বন্টন করে যাননি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত কায়েসকে (রা) পরামর্শ দিয়ে বললেন, সায়াদ (রা) সহায়-সম্পদ যেভাবে বন্টন করে গেছেন তা বাতিল করে নতুন করে ভাগ করুন। হযরত কায়েস (রা) বললেন, পিতা যেভাবে বন্টন করে গেছেন তা ঠিক থাকবে। অবশ্য আমি নিজের অংশ ছেড়ে দিচ্ছি। তা নবজাতককে দেয়া হোক।

তাঁর দানশীলতা এবং উদারতার আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। ইবাদাতের প্রতি আকর্ষণ এমন ছিল যে, বেশীর ভাগ সময়ই আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিতেন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফতের পর ইবাদাতের ব্যস্ততা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ফরজ ছাড়া নফলও অত্যন্ত পাবন্দীর সঙ্গে আদায় করতেন। বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, আশুরার দিনে রোযা রাখাকে তিনি নিজের নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তাদবির ও হিকমত প্রশ্নে তিনি আরবের নির্বাচিত কয়েকজনের একজন ছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, এই প্রশ্নে তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা), হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ, হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন বাদলের (রা) সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিজের বিজ্ঞতা, দানশীলতা এবং অন্যান্য সুন্দর গুণের বদৌলতে তিনি বনু সায়েদাতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং আনসারের অন্যান্য খান্দানও তাঁকে খুব সম্মান করতেন।

মহানবীর (সা) উত্তম আদর্শকে নিজের জন্য পথের মশাল হিসেবে জানতেন। একবার কাদেসিয়ায় হযরত সাহাল (রা) বিন হুনাইফার সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় একটি জানাযাহ অতিক্রম করলো। হযরত কায়েস (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা বললো, আপনি অহেতুক দাঁড়িয়ে গেছেন। এটাতো একটা অমুসলিমের (জিম্মী) জানাযাহ। তিনি বললেন, রাসূলও (সা) এক ইহুদীর জানাযাহ দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁকে (সা) বলা হয়েছিল যে, এটাতো ইহুদীর জানাযাহ। তখন নবীয়ে আকরাম (সা) বলেছিলেন, তাতে দোষের কি। সেও তো একজন মানুষ।

বীরত্ব ও বাহাদুরীর ব্যাপারে শুধু এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, মহানবীর (সা) যুগেও এবং তারপরও অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলেন। মোটকথা, হযরত কায়েসের (রা) জীবনের সকল দিকই ছিল প্রোজ্জ্বল।

www.bjilibrary.com

হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) আনসারী

রহমতে দো আলম (সা) বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা দিলেন। এ সময় মদীনার এক গৃহে বিশ্বপ্রকৃতি এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। হক পূজারী এক বৃদ্ধ পিতা এবং এক যুবক পুত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। পিতা পুত্রকে বলছিলেন, "পুত্র বাড়ীতে আমরা দুজন ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই। এ জন্য আমাদের দু'জনের একজন বাড়ী অবস্থান এবং অপরজনের জিহাদে শরীক হওয়া উচিত। তুমি যুবক এবং বাড়ী দেখা শুনার কাজ ভালোভাবে তুমিই করতে পার। এজন্য তুমি এখানে থাকো এবং আমাকে রাসূলের (সা) সঙ্গে যেতে দাও।" তার জবাবে ভাগ্যবান পুত্র পিতাকে বলছিলো, "আব্বাজান ! জান্নাত ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যাপার হতো, তাহলে বাড়ীতে অবস্থানের ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি ছিল না। আল্লাহ পাক আমাকে এতটুকুন শক্তি দিয়েছেন যে, তা দিয়ে আমি মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার হক আদায় করতে পারি। এজন্য আপনি বাড়ী থাকুন এবং আমাকে জিহাদে গমনের অনুমতি দিন। আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিতে পারেন।"

অনেক তর্কাতর্কির পর পিতা লটারী করার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং তাতে যার নাম উঠবে সেই লড়াইতে যাবে এবং অন্যজন বাড়ী থাকবে ফায়সালা হলো। পুত্র পিতার নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। লটারীতে পুত্রের নাম উঠলো। সে এত খুশী হলো যে, মাটিতে আর পা ধরে না। শাহাদাতের আবেগে উদ্বেলিত এই নেক পুত্রের নাম ছিল সায়াদ (রা) আর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম ছিল খাইছুমা (রা)।

হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমার (রা) সম্পর্ক ছিল আওসের আমর বিন আওফের খান্দানের সঙ্গে। নসবনামা হলো :

সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) বিন হারিছ বিন মালিক বিন কা'ব বিন নুহাত বিন কা'ব বিন হারিছা বিন গানাম বিন সালাম বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক বিন আওস।

হযরত সায়াদকে (রা) আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। মহানবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে যে তাঁর নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌছলো তখনি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাতে সাড়া দিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর সেই ৭৫জনের দলে শামিল হয়ে মক্কা গমন করেন যাঁরা বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রহমতে আলমকে (সা)

www.bjilibrary.com

ইয়াসরাব তাশরীফ আনার দাওয়াত দিলেন। হুজুর (সা) এ সময় হযরত সায়াদকে (রা) আমর বিন আওফ কবিলার নকিব নিয়োগ করলেন। তাঁর পিতাও সেই যুগেই ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর বিশ্বনবী (সা) কুবা আগমন করলেন। তখন আমর বিন আওফ গোত্রেরই এক বুযুর্গ হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদাম কয়েকদিনের জন্য মহানবীর (সা) মেযবান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সে যুগে যেসব ব্যক্তি হুজুরের (সা) সঙ্গে মুলাকাত করতে আসতেন তাদের সঙ্গে মহানবী (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমার (রা) বাড়ীতে মিলিত হতেন। হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত নেককার ছিলেন। এজন্য তাঁকে সায়াদুল খায়ের নামে ডাকা হতো। বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় যখন লটারীতে তাঁর নাম উঠলো তখন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে হুজুরের (সা) সঙ্গী হয়ে বদর পৌঁছলেন এবং কাফেরদের সঙ্গে প্রচন্ড বিক্রমে লড়াই করলেন। যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের এক সওয়ার তাঁর উপর হামলা করলো। তিনি যদিও মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন তবুও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে হামলাকারীর জবাব দিচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু ইত্যবসরে দুশমনের আঘাত কার্যকর হয়ে গেল এবং হযরত সায়াদ (রা) শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর হত্যাকারীর নাম তায়িমা বিন আদি এবং অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আমর বিন আবদিদুদ পাওয়া গেছে। সন্তানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনায় আছে যে, শাহাদাতের সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তবে কতিপয়ের কথামতে তিনি আবদুল্লাহ নামক এক শিশু পুত্র রেখে যান।

---

www.bjilibrary.com

হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনা আনসারী

খাজরাজ গোত্রের বিয়াদাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

যায়েদ (রা) বিন দিছনা বিন মাবিয়া বিন উবায়েদ বিন আমর বিন বিয়াদাহ বিন আমের যুবায়েক বিন আবাদি হারিছা বিন মালিক বিন জাশাম বিন খাজরাজ।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে বিস্তারিত বলেননি। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। সম্ভবত তিনি নবীর (সা) হিজরতের প্রথমে অথবা অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বদরের পর তিনি ওহোদের যুদ্ধে বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধের কিছুদিন পর আজল ওয়াকারা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে সাহাবীদের (রা) মধ্য থেকে কয়েকজনকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের নিকট প্রেরণের জন্য নিবেদন করলো। হুজুর (সা) তাঁদের নিবেদন বা দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মতান্তরে ছ' সাত অথবা দশ সাহাবী সমন্বয়ে একটি দল তাদের সঙ্গে দিয়ে ছিলেন। এই দলে হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনাও শামিল ছিলেন। যখন এই দল রাজি' নামক স্থানে পৌছলো তখন আজল ওয়াকারার লোকেরা গাদ্দারী করে বসলো এবং একশ' তীরান্দাজ দিয়ে এই দলের উপর হামলা করালো। মুসলমানরা এই গাদ্দারদের সঙ্গে বীর বিক্রমে মুকাবিলা করলো। কিন্তু হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদি এবং যায়েদ (রা) বিন দিছনা ছাড়া সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খুবায়েব (রা) এবং যায়েদকে (রা) মুশরিকরা বন্দী করলো এবং মক্কা এনে কুরাইশদের নিকট বিক্রি করে দিলেন। হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনাকে বদরে নিহত উমাইয়া বিন খালফের পুত্র সাফওয়ান পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৫০টি উটের বিনিময়ে কিনে নিল। এই ঘটনা যেহেতু হারাম মাসে (আশহারে হুরম) সংঘটিত হয়েছিল সেহেতু সাফওয়ান হযরত যায়েদকে (রা) নিজের গোলাম নাস্তাসের সোপর্দ করে দিল এবং হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার জিম্মায় রাখার নির্দেশ দিল। এই জিম্মায় থাকাকালীন অবস্থায় হযরত যায়েদ (রা) সারারাত ইবাদাতে ব্যস্ত থাকতেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখতেন। খাদ্যবস্তু যা তাঁকে দেয়া হতো তা থেকে গোশত না খেয়ে শুধু দুধ পান করতেন।

www.bjilibrary.com

সাফওয়ান একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, গোশত কেন খাও না। তিনি বললেন, যে জন্তু আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করা হয় তার গোশত আমি হারাম মনে করি।

হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মক্কার কাফেররা হযরত খুবায়েব (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) উভয়কেই শুলে চড়ানোর বন্দোবস্ত করলো। সুতরাং তারা হক পুরুষদেরকে তানয়িম নামক স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দু'টো শুল লটকিয়ে রেখেছিল। যখন সেখানে উভয় মজলুমের পারস্পরিক সাক্ষাত হলো তখন তারা পরস্পর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং একে অপরকে মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ওসিয়ত করলেন। অতপর কাফেররা উভয়কে পৃথক করলো। হযরত যায়েদকে (রা) যখন শুলে চড়ানো হচ্ছিল তখন আবু সুফিয়ান তাঁকে সম্বোধন করে বললো ঃ

"হে যায়েদ তোমার খোদার কসম ! সত্য সত্য বলতো, তোমার স্থানে যদি মুহাম্মাদের (সা) গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তুমি তোমার পরিবার-পরিজনসহ আরাম-আয়েশে থাকো—তাকি তুমি পসন্দ করবে ?"

একথার জবাবে এই হক পুরুষ যে ঈমান পূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ খোদার কসম ! মুহাম্মাদের (সা) পবিত্র পায়ে যদি কাঁটা ফোটে আর আমি নিজের ঘরে আরাম করে বসে থাকবো—তাও আমি সহ্য করতে পারবো না।"

মুশরিকরা এই জবাবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো এবং আবু সুফিয়ানের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেড়িয়ে পড়লো ঃ "মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গীরা তাঁকে যতখানি ভালোবাসেন দুনিয়ায় আর কোন মানুষ এ রকম ভালোবাসা পান না।"

তারপর জালেমরা হযরত যায়েদকে (রা) শুলে চড়ালো এবং তাঁর পবিত্র দেহকে বর্শার আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা করে ফেললো। এভাবে এ মরদে মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ্ বালবী

মহানবীর (সা) হিজরতের কয়েক বছর পরের কথা। একদিন রাসূলের (সা) এক সাহাবী (রা) রিসালাতের দরবারে হাজির হলেন। তিনি বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র চেহারার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ক্ষুধার্ত হওয়ার কারণে মহানবীর (সা) পবিত্র চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। মহানবী (সা) কতক্ষণ থেকে ক্ষুধার্ত রয়েছেন তা চিন্তা করে বেচাইন হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজেও ছিলেন অক্ষম ব্যক্তি। স্বগৃহে এমন কোন বস্তু ছিল না যা এনে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করতে পারেন। তারপরও হুজুর (সা) ভুখা থাকুন তা সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ কোন বস্তুর সন্ধানে তিনি উঠে গেলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদীর সঙ্গে দেখা। ইহুদীটি নিজের উটের পানি পান করাতে চাচ্ছিলো। তিনি তার নিকট কূপ থেকে পানি তুলে দেয়ার বিনিময়ে প্রতি বালতিতে এক ছোহারাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। সে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলো। সুতরাং তিনি কয়েক বালতি পানি তোলার পর কয়েকটি ছোহারাহ জমা হলো। এ সময় তিনি দৌড়ে দৌড়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ছোহারাহগুলো পেশ করলেন। হুজুর (সা) খুব খুশী হয়ে এই ছোহারাহ খেয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী—যিনি মহানবীকে (সা) এত ভালো-বাসতেন এবং নিজের অক্ষমতা ও দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাঁকে (সা) ভুখা দেখা অসহ্য ছিল—তিনি ছিলেন হযরত কা'ব (রা) আজুরাহ।

হযরত আবু মুহাম্মাদ কা'ব বিন আজুরাহর সম্পর্ক ছিল বাল্লী (কাজায়াহ) কবিলার সঙ্গে এবং এই কবিলা আনসারের মিত্র ছিল। নসবনামা হলো ঃ

কা'ব (রা) বিন আজুরাহ্ বিন উমাইয়া বিন আদি বিন উবায়েদ বিন খালেদ বিন আমর বিন আওফ বিন গানাম বিন সওয়াদ বিন মারি বিন ইরাছাহ বিন আমের বিন উবাইলা বিন কাসিল বিন ফাররান বিন বাল্লি বিন আমর বিন হারিছ বিন কাজায়াহ।

হযরত কা'ব (রা) হিজরতে নববীর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নবী (সা) যুগে সংঘটিত প্রায় সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শরীক হন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই জীবনবাজি রেখে লড়াই করেন। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন, এক যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করার সময় তাঁর একটি হাত শহীদ হয়ে যায়।

সহীহাইনে হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হুদায়বিয়া ছিলাম এবং মক্কায় প্রবেশ করিনি ; এমন সময় আমার নিকট দিয়ে

www.bjilibrary.com

মহানবী (সা) অতিক্রম করলেন। আমি সে সময় ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম এবং হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। উকুন ঝরঝর করে আমার চেহারার উপর পড়ছিল। হুজুর (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উকুন কি তোমাকে কষ্ট দেয়। আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি (সা) বললেন, "মাথা টাক করে ফেলো এবং এক ফরক খাদ্য (তিন সাতে এক ফরক হয়) ৬জন মিসকিনকে খাইয়ে দাও। অথবা তিনটি রোযা রাখো অথবা একটি জানোয়ার জবেহ্ করার যোগ্য হলে জবেহ্ করে দাও।"

হযরত কা'ব (রা) হুজুরের (সা) নির্দেশ তামিল বা পালনার্থে নিজের মাথা টাক করে ফেললেন। অর্থাৎ চুল চেঁছে ফেললেন। এর ফিদিয়াতে তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) তা পরিষ্কার করা হয়নি।

মুসনাদে আহমাদে (র) বর্ণিত আছে যে, একদিন বিশ্বনবী (সা) খুতবা দিলেন। এই খুতবা বা ভাষণে তিনি ভবিষ্যতে মুসলমানদের মধ্যেকার গৃহ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করলেন। হযরত কা'বও (রা) শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) খুতবায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং এমন অনুভব করলেন যে, গৃহযুদ্ধের ভয়ংকর যুগ যেন তাঁর সামনে এসে গেছে। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি চাদর উড়িয়ে সেখানে এলেন। হুজুর (সা) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সেদিন এই ব্যক্তি হকের উপর থাকবেন। কা'ব (রা) একথা শুনে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির বাহু ধরে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যক্তি ?"

হুজুর (সা) বললেন, হাঁ। এতক্ষণে হযরত কা'ব (রা) তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন। তাকিয়ে দেখলেন যে, সেই ব্যক্তি হলেন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা)।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ্ মদীনা মুনাওয়ারাতেই মুকিম ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কুফাতে বসতি স্থাপিত হলে তিনি সেখানে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ী হন। তকদির লেখক তার ওফাত লিখে রেখেছিলেন হাবিবের (সা) গৃহে। ৫১ হিজরীতে তিনি মদীনা আসেন এবং এখানেই ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় চার পুত্র ইসহাক, মুহাম্মাদ, রবি এবং আবদুল মালিককে রেখে যান।

হযরত কা'ব বিন আজুরাহ মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর থেকে ১৪৭টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), আবদুল্লাহ বিন আমর

www.bjilibrary.com

(রা) বিন আস, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা), তারিক বিন শিহাব (র), আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (র), ইবনে সিরিন (র) এবং মুহাম্মাদ বিন কা'ব কারজি (র)-এর মত জালিলুল কদর সাহাবী শামিল ছিলেন।

হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস ইবাদাত ও আখলাক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেসব হাদীসের মধ্যে কতিপয় ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কতিপয় বাক্য আছে যা প্রতি ফরয নামাযের পর উচ্চারণকারী সওয়াব প্রাপ্তি থেকে নিরাশ হয় না। সেসব বাক্য হলো ঃ ৩৩বার সুবহান আল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার বলা।

(২) রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ ওজু করে সে যেন ভালোভাবে ওজু করে। তারপর নামাযের ইরাদাতে মসজিদের দিকে গমন করবে এবং নামাযের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে খেলা করবে না। তাহলে এই খেলাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযই মনে করা হবে।

(৩) একবার মহানবী (সা) বনু আবদুল আশহালের মসজিদে তাশরিফ নিলেন এবং সেখানে মাগরিবের নামায পড়লেন। লোকেরা যখন মাগরিবের নামায পড়া শেষ করলো তখন হুজুর (সা) দেখলেন যে, সে নফল পড়ছে। মহানবী (সা) বললেন, এই নামায (নফল) বাড়ীতে পড়ার বস্তু।

(৪) একবার রাসূলে আকরাম (সা) বাড়ী থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট তাশরীফ রাখলেন। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উপর সালাম প্রেরণ তো আমরা জেনেছি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে প্রেরণ করা যাবে। তিনি (সা) বললেন এভাবে বলো ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

(৫) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সকলে মিম্বরের নিকট এসো। সুতরাং আমরা সবাই হাজির হলাম। তিনি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা

রাখলেন তখন আমীন বললেন। তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন তখন আমীন বললেন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে চড়লেন তখন আমীন বললেন। তিনি যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন তখন আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আজ আপনার নিকট থেকে এমন কথা শুনেছি যা আমরা শুনিনি। তিনি বললেন, (যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি) জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমার সামনে এলেন এবং বললেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে যে, রমযানের মাস পেয়েছে অথচ তাকে ক্ষমা করা হয়নি। আমি বললাম, আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার নিকট আপনার কথা উল্লেখ করা হয় আর সে আপনার উপর দরূদ প্রেরণ করে না। আমি বললাম, আমীন। আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলাম তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হবে যে ব্যক্তি বার্ধক্য অবস্থায় নিজের মাতা-পিতাকে পেল অথবা তাদের মধ্যে একজনকে পেল এবং সেই মাতা-পিতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলো না। আমি বললাম, আমীন। (হাকীম ইবনে হাব্বান এবং তিবরানী)

(৬) মহানবী (সা) বলেছেন, বরতন বা পাত্র ভেঙ্গে ফেলার কারণে বাঁদী বা দাসীদেরকে মার-পিট করো না। কারণ, তোমাদের বয়সের মত বরতনের বয়সও নিকৃষ্ট থাকে। [মুসনাদে আল ফিরদাউস লিদদায়লামী (র)।]

www.bjilibrary.com

হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা (রা) বাজলী

খন্দকের যুদ্ধ (পঞ্চম হিজরী) মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিটি পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন। তারা নিজেদের সংকল্প, অটলতা ও ধৈর্যের এমন উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় রেখেছিলেন যা চিরকালের জন্য তাওহীদপন্থীদের পথের মশাল হিসেবে কাজ করবে। সেই যুদ্ধে ১৫ বছরের এক যুবক এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করেছিল যে, লোকজন বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বনবীও (সা) তাঁর বাহাদুরী এবং জীবন উৎসর্গের আবেগের প্রশংসা করেছিলেন এবং কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি নিজের নাম বললে হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ভাগ্যবান করুন।" অতপর অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁর মাথার উপর পবিত্র হাত বুলালেন।

রহমতে দো আলমের (সা) ভাগ্যবান হওয়ার দোয়া প্রাপ্ত এই সৌভাগ্যবান যুবক ছিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা। (ইবনে আছির)

হযরত সায়াদ (রা) যিনি ইবনে হাবতা নামে মশহুর ছিলেন। তিনি বাজিলা গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং বনি আমর বিন আওফের মিত্র ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন বুজায়ের বিন মাবিয়া বিন মুফায়েল বিন সাদুস বিন আবদি মান্নাফ বিন আবি উসামাহ বিন লাহমাহ বিন সায়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাজাজ বিন মাবিয়া বিন যায়েদ বিন গাওছ বিন আনমার বিন আরাশ।

হযরত সায়াদের (রা) পিতা বুজায়ের ইসলামের যুগ পাননি। অবশ্য তাঁর মাতা হাবতা (রা) বিনতে মালিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি আওস কবিলার আমর বিন আওফ বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) তাঁর নামের নিসবতেই ইবনে হাবতা (রা) নামে মশহুর হয়েছিলেন। যে যুগে তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে সময় তাঁর ছিল শৈশবকাল। তা সত্ত্বেও তিনি মায়ের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন, ইবনে হাবতা (রা) বদর ও ওহোদ কম বয়স হওয়ার কারণে অংশ নিতে পারেননি। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ১৫ বছর হয়ে গিয়েছিল। এজন্য হুজুর (সা) যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দেন। খন্দকের পর তিনি অন্যান্য যুদ্ধেও হুজুরের (সা) সঙ্গী ছিলেন।

www.bjilibrary.com

ইবনে হাবতা (রা) একজন বাহাদুর সিপাহী ও ভালো ঘোড় সওয়ার ছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর উয়াইনিয়া বিন হাছান ফাযারী মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে এক চারণভূমিতে হামলা করে হুজুরের (সা) উটনীগুলো ভাগিয়ে নিয়ে চললো। ঘটনাক্রমে মশহুর সাহাবী হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া এবং অন্য একজন সাহাবী সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত সালমা (রা) প্রথমে নিজের সঙ্গীকে এই ঘটনার খবর দেয়ার জন্য মদীনা পাঠালেন এবং এক টিলার ওপর উঠে ইয়া ছাবাহাহ (হে সকাল বেলার মুসিবত) স্বরে আওয়াজ দিলেন। অতপর একাই ফাযারী লুটেরাদের মুকাবিলায় লেগে গেলেন। আরববাসী "ইয়া ছাবাহাহ"-র নারা বা ধ্বনি তখনই দেয় যখন তারা কোন মুসিবতে নিপতিত হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করে।

হযরত সালমার (রা) নারার আওয়াজ সর্বপ্রথম বনু আমর বিন আওফের মহল্লায় পৌছলো। সেখান থেকে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) এবং ইবনে হাবতা (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত সালমার (রা) সাহায্যের জন্য পৌছে গেলেন এবং লুটেরাদেরকে নিজেদের বর্শার খোরাক বানালেন। ইত্যবসরে আরো কিছু সওয়ারও পৌছলো। তাদেরকে হুজুর (সা) মদীনা থেকে প্রেরণ করেছিলেন। এসব বীর লুটেরাদেরকে ভেগে যেতে বাধ্য করলেন। হযরত সালমা (রা) দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের পিছু নিয়ে হুজুরের (সা) উট নিয়ে ফিরে এলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইনতিকালের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা মদীনা মুনাওয়ারাতেই মুকিম ছিলেন। অবশ্য যখন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসনকালে কুফা আবাদ হলো তখন তিনি কুফাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং কয়েক বছর পর সেখানেই আখিরাতের সফরে যাত্রা করেন। হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম জানাযার নামায পড়ান এবং ইসলামের এই মহান ব্যক্তিকে কুফার মাটিতে দাফন করা হয়।

ইনতিকালের সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা চার সন্তান রেখে যান। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন পুত্র এবং একজন কন্যা হযরত ইমাম আবু হানিফার (র) জালিলুল কদর শাগরেদ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র) সায়াদ (রা) বিন হাবতার বংশধরদের মধ্যেই ছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা (রা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ্ আনসারী

মহানবীর (সা) হিজরতের পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সা) কতিপয় জাননিছার সাহাবী (রা) সহ বসেছিলেন এবং তাদেরকে নিজের পবিত্র অমিয় বাণী শুনাচ্ছিলেন। হুজুর (সা) তাদেরকে এই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, কোন মাসয়ালার ব্যাপারে তাঁরা যদি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে তাঁরা নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট তার ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। এই মজলিসে এক ব্যক্তি মসজিদে কুবা প্রসঙ্গে নাযিলকৃত। (সূরায়ে তাওবাহর) এই আয়াত পড়লেন ঃ

"তাতে সেইসব লোক রয়েছেন যারা পবিত্রতাকে খুব ভালোবাসে এবং আল্লাহও এমন পবিত্র মানুষকে ভালোবেসে থাকেন।"–(সূরা আত তাওবা)

অতপর হুজুর (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যেসব লোকের দিকে ইশারা করেছেন ; তারা কারা ?"

ইরশাদ হলো ঃ "তাদের মধ্যে একজন মরদে সালেহ হলেন উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ।"

সাইয়েদেনা আবু আবদুর রহমান উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ-এর আল্লাহর মাহবুব বা প্রিয় হওয়া সম্পর্কে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুন এবং মহান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। আওস কবিলার আমর বিন আওফ শাখার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ বিন আয়েশ বিন কায়েস বিন নু'মান বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

আমর বিন আওফ খান্দানের বসতি ছিল কুবাতে। এই খান্দান মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো। বংশটির বেশীর ভাগ সদস্য মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহও ছিলেন। নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছর আগের

www.bjilibrary.com

একটি ঘটনা। এই বছরের পর হজ্জের মওসুমে মদীনা মুনাওয়ারার ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তি মক্কা গেলেন এবং রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। এই প্রোজ্জ্বল বাইয়াত ইতিহাসে "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা" "বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা" এবং "বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া" নামে মশহুর হয়ে আছে। এই বাইয়াতে মদীনার সেই ৭৫জন জওয়ান মরদ মক্কার দুররে ইয়াতিম নবীর (সা) মদীনা আগমনের দাওয়াত দিলেন এবং পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁরা মহানবীকে (সা) জান, মাল ও সন্তানসহ সাহায্য এবং হেফাজত করবেন। এই কাজ করতে তাঁরা সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছ পা হবেন না বলেও ঘোষণা প্রদান করেন। হযরত উয়ায়েম (রা)-ও সেই হকপন্থীদের একজন ছিলেন।

বিশ্বনবী (সা) প্রথমে কুবা এবং তারপর মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত উয়ায়েমও (রা) অন্যান্য আনসারের সঙ্গে হুজুরকে (সা) ইসতিকবাল করার জন্য সামনে সামনে ছিলেন। কিছুদিন পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তখন হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাকে হযরত হাতিব (রা) বিন বালতায়ার দ্বীনি ভাই বানালেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদা প্রিয় নবীর (সা) সফর সঙ্গী হননি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসা এমন এক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তিনি হক পথে জীবনের বাজি নাগানোর লক্ষ্যে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন ঝাণ্ডা উঁচু করতেন ; উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ সবসময় তার ছায়ায় থাকতেন।

রাসূল (সা) প্রেম ও জিহাদের প্রতি উৎসাহ ছাড়া হযরত উয়ায়েম (রা)-এর যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে মহানবীর (সা) দরবারে প্রিয় করে রেখেছিল, তাহলো তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন প্রিয়তা। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। এক বর্ণনায় আছে, মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসতিনজাতে পানি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁকে দেখে অন্যান্য মুসলমানও তাঁর অনুসরণ করতে লাগেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর এই কাজ কবুল হয় এবং তিনি প্রকাশ্য ভাষায় তাঁকে তার সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করেন। সে সময় বিশ্বনবী (সা) হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ এবং তাঁর মত অন্যান্য পরিচ্ছন্ন প্রিয় সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"তোমরা তাহারাত বা পবিত্রতার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকো। আল্লাহ জাল্লে শানুহু তোমাদের প্রশংসা করেছেন ?"

তাঁরা আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের নিয়ম হলো আমরা জানাবাতের সময় গোসল করি এবং পানি দিয়ে ইসতিনজা করে থাকি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা খুব ভালো কার্যপদ্ধতি এবং সকলকেই এই পদ্ধতি মানা দরকার।"

অন্য আরেক সময় কেউ হুজুরকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কারা যাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা প্রিয়তার জন্য আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। এ সময় মহানবী (সা) জবাবে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ থেকে হযরত উয়ায়েমের (রা) মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়।

একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ইনতিকালের পর আনসাররা সাকিফায়ে বনি সায়েদাতে একত্রিত হলেন। তাঁদের বেশীর ভাগের মত ছিল সাইয়েদুল খাজরাজ হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে খলিফা বানানো হোক। মুহাজিররা এই খবর পেয়ে একত্রিত হলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) ও কতিপয় অন্য সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সাকিফায়ে বনি সায়েদার দিকে রওয়ানা দিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, পথিমধ্যে আমাদের সঙ্গে দু'জন নেক্‌কার আনসার দেখা করলেন। তাঁরা আনসারদের সমাবেশ ও তাদের ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?" আমি বললাম, আমরা আমাদের আনসার ভাইদের নিকট সাকিফা যাচ্ছি। তাঁরা বললেন, সেখানে গিয়ে আপনারা কি করবেন ? খিলাফতের প্রশ্নে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন। আমি বললাম, না, আমরা সেখানে অবশ্যই যাবো।

মুহাজিররা সাকিফায়ে বনি সায়েদা পৌঁছতেই পরিবেশ বদলে গেল এবং কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর জমহুর বা সাধারণ মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত প্রশ্নে ঐকমত্য ঘোষণা করলেন। ইমাম জুহরী (র) এবং অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস লিখেছেন, যে দু' ব্যক্তি বনি সায়েদার রাস্তায় মুহাজিরদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ এবং হযরত মায়ান (রা) বিন মা'দী। তারা আনসারদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের ব্যাপারে মুহাজিরদেরকে আনসারদের

www.bjilibrary.com

উপর অগ্রাধিকার দিতেন। এ কারণেই তাঁরা আনসার সমাবেশ থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোন দিকে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনা হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার সঠিক মত সম্পন্ন হওয়া এবং দূরদর্শিতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ধর্মদ্রোহিতার ভয়ংকর যুগে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদা খলিফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাহু হিসেবে কাজ করেন এবং অন্যান্য আনসারের সঙ্গে মিলে মদীনা মুনাওয়ারার হিফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইসলামের এই মহান ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে মহাকালের দিকে যাত্রা করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। আমীরুল মু'মিনিন (রা) জানাযায় শরীক ছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "এ সময় দুনিয়ায় কোন ব্যক্তিই (কতিপয় বৈশিষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে) তাঁর থেকে উত্তম হওয়ার দাবী করতে পারে না।"

হযরত উয়ায়েম (রা) ইনতিকালের সময় দু' পুত্র রেখে যান। একজন হলেন উতবাহ এবং অপরজন উবাইদাহ। তাঁর থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার গুণাবলীর মধ্যে ছিল ইসলামে অগ্রগামিতা, জিহাদের আকাংখা, রাসূল প্রেম, পরিচ্ছন্নতা প্রিয়তা, সঠিক রায় এবং সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন হওয়া। এক রেওয়ায়াতে আছে রহমতে আলম (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "সে আল্লাহর নেক বান্দাহ এবং পরহেজগার ব্যক্তি।" হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার মহানত্বের ব্যাপারে এর থেকে বড় দলিল আর কি হতে পারে যে, মহানবী (সা) তাঁকে "নেক ও পরহেজগার" বান্দাহ হিসেবে নিজের জবানে সম্বোধন করেছেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত ইবাদ (রা) বিন কায়েস আনসারী

কেউ কেউ তাঁর নাম উবাদও লিখেছেন এবং কেউ কেউ আব্বাদ। খাজরাজ গোত্রের আদি বিন কা'ব বংশোদ্ভূত। নসবনামা হলো ঃ

ইবাদ (রা) বিন কায়েস বিন আবসাহ বিন উমাইয়া বিন মালিক বিন আমের বিন আদি বিন কা'ব বিন খাজরাজ।

আনসারের সাবিকুনাল আওয়ালীন বা প্রথম অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে হিশাম তাঁর নাম সেই ৭৫জন সাহাবায়ে কিরামের তালিকাভুক্ত করেছেন যারা নবুওয়াতের তের বছর পর মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকবাতে মহানবীর (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার গৌরবলাভ করেছিলেন এবং হুজুরকে (সা) মদীনা তাশরীফ আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন।

ইবাদ (রা) হক পথের একজন জানবাজ সিপাহী ছিলেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে সর্বপ্রথম তাঁর তরবারি বদরের যুদ্ধে বাতিলের বিরুদ্ধে খাপ থেকে বের হয়। তারপর তিনি ওহোদ, খন্দক, খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী হন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই বীরত্বের নিপুণতা প্রদর্শন করেন। অষ্টম হিজরীতে মাওতার রক্তাক্ত যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হন।

মশহুর ফকিহ সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা) হযরত ইবাদ (রা) বিন কায়েসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আমর (রা) বিন আখতাব আনসারী

মহানবীর (সা) হিজরতের পরের কথা। একদিন বিশ্বনবী (সা) জাননিছার সাহাবীদের (রা) এক বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে দ্বীন ও দুনিয়ার আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনাকালে হুজুরের (সা) পিপাসা লাগলো। তিনি (সা) সাহাবীদের (রা) নিকট পানি চাইলেন। একজন সুদর্শন সাহাবী (যিনি সামান্য খুঁড়িয়ে হাটতেন) তাড়াতাড়ী করে উঠলেন এবং পাত্র ভরে পানি আনলেন। তিনি এই পানিতে একটি চুল দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ী তিনি তা বের করে ফেলে দিলেন এবং পরিষ্কার পানি হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। বিশ্বনবী (সা) খুব খুশী হলেন এবং সেই সাহাবীর মাথাও চেহারার ওপর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তাকে তুমি সুদর্শন করে দাও।"

মাহবুবে রব জুল জালালের (সা) দোয়ায় এই তাছির হলো যে, বার্ধক্যেও সেই ব্যক্তির চেহারায় যৌবনের দীপ্তি এবং একশ' বছর বয়সেও তাঁর মাথা এবং দাড়ির সকল চুল কালো ছিল।

সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) সুদর্শন হওয়ার দোয়া প্রাপ্ত এই ভাগ্যবান সাহাবী ছিলেন হযরত আমর (রা) বিন আখতাব আনসারী। সাইয়েদেনা হযরত আবু যায়েদ (রা) বিন আমর বিন আখতাবের সম্পর্ক ছিল খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

আমর (রা) বিন আখতাব বিন রাফয়াহ বিন মাহমুদ বিন ইয়াসির বিন আবদুল্লাহ বিন সায়েফ বিন বায়াম্বর বিন আদি বিন ছালাবাহ বিন আমর বিন আমের মাউসসামা।

হযরত আমর (রা) বিন আখতাব মহানবীর (সা) হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে। তিনি সবসময় হক পথে নিজের জীবন কুরবান করার জন্য অস্থির থাকতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, তিনি রাসূলের (সা) যুগে ১৩টি যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি মহানবীকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন এবং মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। যখনই সময় পেতেন তখনই প্রিয় নবীর (সা) ফয়েজ লাভের জন্য রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হতেন। জীবন উৎসর্গের আবেগ, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঈমানী আবেগের কারণে তিনি হুজুরের (সা) স্নেহের পাত্র হয়ে যান। মুসনাদে

www.bjilibrary.com

আহমদেরই এক বর্ণনায় আছে, একদিন হুজুর (সা) নিজের পবিত্র পিঠ থেকে কুরতা উঠিয়ে বললেন, আমর ! আমার পিঠের ওপর তোমার হাত বুলাও। তিনি নবীর (সা) ইরশাদ বা নির্দেশ পালন করলেন। পবিত্র পিঠের ওপর হাত মহরে নবুওয়াতের ওপর পৌছতেই তা ভালোভাবে দেখে নিজের চোখকে আলোকিত করলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইনতিকালের পর কয়েক বছর মদীনা অবস্থান করেন। বসরা বসতি স্থাপিত হলে সেখানে গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং সেখানেই ১২০ বছর বয়সে ওফাত পান। সে সময় মাথার মাত্র কয়েকটি চুল পেকেছিল। ওফাতের সময় এক পুত্র এবং এক কন্যা রেখে যান।

হযরত আমর (রা) বিন আখতাব থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। এসব হাদীস সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়।

---

www.bjilibrary.com

হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহ্দাহ্ বালবী

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস) রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলে একদিন এক মাদানী জাননিছার সাহাবীর (রা) ওফাতের খবর পেলেন। এই খবর শুনে প্রিয় নবী (সা) গভীর শোক ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সাহাবীদের সহ (রা) জানাযার জন্য তাশরীফ নিলেন। যখন তাঁর দাফন সম্পন্ন হলো তখন ঘোড়া তলব করে সওয়ার হলেন এবং বললেন ঃ

"বেহেশতে ছোহারার যত শাখা আছে তার সবই ইবনে দাহদার জন্য ঝোলানো হয়েছে।"

এই ইবনে দাহদাহ (রা) যাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ মহানবী (সা) নিজের পবিত্র মুখ দিয়ে দিয়েছেন। তিনি হলেন হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ।

হযরত আবুদ দাহদাহ ছাবিত (রা) বিন দাহদার স্থান অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে নিরুপিত হয়ে থাকে। তাঁর সম্পর্ক ছিল বাল্লী গোত্রের আজলান অথবা আনিফ খান্দানের সঙ্গে। এই খান্দান আওস কবিলার শাখা আমর বিন আওসের মিত্র ছিল। নসবনামা হলো ঃ

ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ বিন নায়িম বিন গানাম বিন আয়াস [কতিপয় বর্ণনায় হযরত ছাবিতের (রা) পিতার নাম আদ-দাহদাহও বলা হয়েছে]।

হিজরতের পর মহানবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারা শুভ পদার্পণ করলে আওস ও খাজরাজ এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে যারা তখনো ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তারাও দ্রুততার সঙ্গে ইসলামের বেষ্টনীতে প্রবেশ করতে লাগলেন। হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহও সেই যুগে ইসলামের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। কোন বর্ণনায় এটা পাওয়া যায় না যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে অথবা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। যা হোক, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর নাম নেই। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলে হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। যে সময় কোন একটি বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লো তখন হযরত ছাবিত (রা) সামনে অগ্রসর হলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে আনসাররা ! এদিকে এসো, এদিকে এসো। আমি হলাম ছাবিত বিন দাহদাহ। প্রিয় নবী (সা) যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে আল্লাহ জীবিত আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তোমাদের ফরয হলো দীনের জন্য লড়াই করা। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিজয় দান এবং সাহায্যদানকারী।"

হযরত ছাবিতের (রা) কণ্ঠস্বর শুনে কয়েকজন আনসার জানবাজ তাঁর চারপাশে একত্রিত হলেন এবং সকলে মিলে মুশরিকদের হামলা প্রতিহত করলেন। অন্যদিক থেকে আরেকটি হামলা এলো। তাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইকরামা বিন আবু জেহেল, জিরার বিন খাত্তাব এবং আমর বিন আস-এর মত কুরাইশের নামকরা যোদ্ধা শামিল ছিলেন। তারা আনসার জানবাজদেরকে ঘিরে নিলেন। হযরত ছাবিত (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুকাবিলা করলেন। ইত্যবসরে খালিদ বিন ওয়ালিদ অগ্রসর হয়ে হযরত ছাবিতের (রা) উপর বর্শা নিক্ষেপ করলেন এবং গুরুতর আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন এবং তিনি ছিলেন ওহোদের যুদ্ধের সর্বশেষ শহীদ। কিন্তু অন্য মজবুত দলিল সম্পন্ন বর্ণনায় সে সময় তাঁর শাহাদাতের ঘটনা প্রমাণিত হয়নি। এসব বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধের পর আহত ও শহীদদের অনুসন্ধান চালানো হলে লোকেরা দেখলো যে, হযরত ছাবিত (রা) যদিও গুরুতর আহত হয়েছেন তথাপি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। সুতরাং তাঁকে উঠিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর দৃশ্যত ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং কয়েক বছর তিনি সুস্থ এবং ভালো ছিলেন। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর একদিন এই ক্ষত পুনরায় দেখা দিল এবং তার ব্যাথায় তিনি ওফাত পান। ওফাতের সময় কোন সন্তান জীবিত ছিল না এবং সম্ভবত স্ত্রীও ইনতিকাল করেছিলেন। এজন্য হুজুর (সা) সম্পত্তি তাঁর ভাগিনা হযরত আবু লুবাবাহ রাফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযারকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইখলাস ফি দ্বীন, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, ঈমানী আবেগ ও জীবন কুরবানী করার স্পৃহা উল্লেখযোগ্য। নিজের এসব গুণের কারণে তিনি মহানবীর (সা) দরবারে প্রিয় হতে পেরেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

"কে আছে যে, আল্লাহকে ভালো কর্জ দেবে। যাতে আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ বর্ধিত করে তা ফেরত দেবেন এবং তার জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১১)

www.bjilibrary.com

এ সময় হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহ্‌দাহ্ হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আল্লাহ্ তায়ালা কি আমাদের নিকট কর্জ চান ?"

হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ, আবু দাহ্‌দাহ্।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অনুগ্রহ করে আপনার পবিত্র হাত আমাকে দেখান।"

হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে এগিয়ে দিলে তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি আমার বাগান আল্লাহ্ তায়ালাকে কর্জ দিলাম।"

এই বাগান যা হযরত ছাবিত (রা) হকপথে সাদকাহ্ করে দিলেন তা কোন সাধারণ বাগান ছিল না। বরং তাতে ছ'শ' খেজুর গাছ ছিল এবং তাতেই তাঁর বাড়ী ছিল। হুজুর (সা)-এর সঙ্গে একথা বলে তিনি সোজা বাড়ী পৌঁছলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ

"দাহ্‌দাহ্‌র মা, ঘর থেকে বের হয়ে এসো। আমি এই বাগান আমার রবকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।"

তাঁর স্ত্রী [হযরত উম্মে দাহ্‌দাহ্ (রা)] বললেন ঃ "আবু দাহ্‌দাহ্ তুমি লাভজনক ব্যবসা করেছ।" একথা বলে নিজের সামান ও শিশুকে (দাহ্‌দাহ্) নিয়ে বাগানের বাইরে বের হয়ে এলেন। এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা যায় যে, হযরত ছাবিত (রা)-এর দাহ্‌দাহ্ নামক একটি পুত্র ছিল। পরে সে তাঁর সামনেই মৃত্যুবরণ করে।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় এই ঘটনা অন্য আরেকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূলের আকরামের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ; "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি আমার বাড়ীর প্রাচীর তুলতে চাই। মধ্যখানে অমুক ব্যক্তির খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। আপনি যদি ঐ ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন যে, সে এই বৃক্ষ আমাকে দিয়ে দেবে ; তাহলে আমি আমার প্রাচীর বৃক্ষের সঙ্গে লাগিয়ে খুব সহজে নির্মাণ শেষ করতে পারি।

হুজুর (সা) সেই ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার বৃক্ষ তাকে দিয়ে দাও। তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ দান করবেন।

সেই ব্যক্তি বৃক্ষ দানে ওজর করলো। হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ্ (রা) [ছাবিত (রা)] একথা জানতে পেরে সেই ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"ভাই ! তুমি তোমার খেজুর গাছ আমাকে দাও এবং বিনিময়ে আমার খেজুরের বাগান নিয়ে নাও।"

সেই ব্যক্তি এই কথায় রাজী হয়ে গেল। তারপর হযরত ছাবিত (রা) বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি সেই ব্যক্তির নিকট থেকে সেই খেজুর বৃক্ষ আমার বাগানের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি। এখন আমি তা আপনাকে দান করছি। আপনি বাড়ীর প্রাচীর তৈরীকারী ব্যক্তিকে তা দিয়ে দিন।"

একথা শুনে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন এবং কয়েকবার বললেন ঃ "আবুদ দাহদাহর জন্য জান্নাতে খেজুরের কত বড় এবং ভারী কাঁধি রয়েছে।"

তারপর হযরত ছাবিত (রা) স্ত্রীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁকে বললেন ঃ "হে উম্মে দাহদাহ ! এই বাগান থেকে বের হয়ে এসো। আমি এই বাগান জান্নাতের খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছি।"

ভাগ্যবতী স্ত্রী বললেন ঃ "এটাতো খুব লাভজনক ব্যবসা হয়েছে।"

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন যখন সূরায়ে আল হাদীদের উপরে বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত ছাবিত (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের নিকট কর্জ বা ঋণ চান ?"

হুজুর (সা) যখন ইতিবাচক জবাব দিলেন তখন তিনি নিজের মাল সাদকা করে দিলেন।

এই বর্ণনায় মালের ব্যাখ্যা করা হয়নি। হতে পারে যে, হযরত ছাবিত (রা) বাগান ছাড়াও অন্য মাল সাদকা করেছিলেন। যাহোক, এসব বর্ণনা হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহর ঈমানী আবেগ এবং দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠতার প্রমাণ বহন করে।

www.bjilibrary.com

হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম আনসারী

বিশ্বনবীর (সা) হিজরতের পূর্বে এবং অব্যবহিত পর মদীনাবাসীদের যেসব লোক ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক খাজরাজের বনু সালমা বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। সেই সালমা সাহাবীদের মধ্যে হুমাম বিন জামুহর (বিন যায়েদ বিন হারাম) ভাগ্যবান পুত্র উমায়েরও (রা) ছিলেন। ইসলাম তাঁর মধ্যে শাহাদাতের রূহ ফুঁক দিয়েছিল এবং তিনি মহানবী (সা)-এর সেইসব জাননিছারের মধ্যে শামিল হয়ে যান যাঁরা তাঁর (সা) সামান্য ইঙ্গিতেই জীবন কুরবান করাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব কায়েম হলে হুজুর (সা) হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমামকে জালিলুল কদর মুহাজির হযরত উবায়দাহ (রা) ইবনুল হারিছের দ্বীনি ভাই বানিয়ে ছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত উমায়ের (রা) সেই ৩১৩ পবিত্র আত্মার মধ্যে শামিল ছিলেন ; সে সময় যাঁরা রহমতে দো আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিলেন।

লড়াই শুরুর পূর্বে বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ বুজর্গ বরতরের কসম, যার কুদরতি কবজায় মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে ! যে কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হকের দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে মারা যাবে, তার বেহেশত নসিব হবে।"

হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে নিজের কাতার থেকে বের হয়ে হুজুরের (সা) সামনে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর পথে শহীদ হওয়াতে কি সেই জান্নাত পাওয়া যাবে যে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, তার লম্বা ও প্রশস্ততা আসমান এবং যমিনের সমান হবে।"

ইরশাদ হলো ঃ "হাঁ, উমায়ের ! সেই জান্নাত যার সম্পর্কে আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু" বলা হয়েছে।"

একথা শুনে হযরত উমায়েরের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বাহ বাহ শব্দ বের হয়ে পড়লো এবং তিনি পুনরায় আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি কি সেই জান্নাতের হকদার হতে পারি।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি অবশ্যই সেই জান্নাতে দাখিল হবে।"

www.bjilibrary.com

সে সময় হযরত উমায়ের (রা) খেজুর খাচ্ছিলেন। যেই মাত্র মহানবীর (সা) যবান দিয়ে এই বাক্য বের হলো তখনি তিনি খেজুর ফেলে দিয়ে বললেনঃ

"আমার জন্য এখন সেই সময়টুকুও কষ্টকর যা খেজুর খাওয়ার জন্য ব্যয় হবে। আমার এবং জান্নাতের মধ্যে এখন কোন জিনিস বাধা হতে পারে না।"

অতপর তরবারি চালাতে চালাতে বীরবিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করলেন এবং কুরাইশের মিত্র খালিদ ইবনুল আলমের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত যিয়াদ (রা) বিন সাকান আশহালি

হযরত যিয়াদ (রা) বিন সাকান আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালিনদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ যেসব আনসার প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি আওস গোত্রের বনু আবদুল আশহাল বংশের নয়ন মনি ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

যিয়াদ (রা) বিন সাকান বিন রাফে' বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল।

হযরত যিয়াদ (রা) বিশ্বনবীকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। ইবনুল কালবির বক্তব্য মতে তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। ওহোদের যুদ্ধেও হুজুরের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো তখন এক নাজুক মুহূর্তে হুজুর (সা) বললেন ঃ "কে আছে যে আমার জন্য নিজের জীবন আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করবে।" হযরত যিয়াদ (রা) বিন আস সাকান কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। যেই তাঁর কানে হুজুরের (সা) কথা প্রবেশ করলো অমনি তিনি চারজন আনসার সাথীসহ এই বলে লাফ দিয়ে আগে অগ্রসর হলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা হাজির।" অতপর তিনি হুজরের (সা) ওপর হামলাকারী মুশরিকদের দলে ঢুকে পড়লেন এবং এমন জীবনবাজি রেখে লড়াই করলেন যে, মুশরিকদের মুখ ফিরে গেল। কিন্তু এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে হযরত যিয়াদ (রা) গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বিশ্বনবী (সা) তাঁকে নিজের পবিত্র পায়ের সঙ্গে ভর দিয়ে দাঁড় করালেন। সে সময় হযরত যিয়াদ (রা) শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং নিজের জীবন মহান আল্লাহর নিকট সপে দিলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত আম্মারাহ (রা) বিন যিয়াদ (রা) আশহালি

হযরত আম্মারাহ (রা) হযরত যিয়াদ (রা) ইবনুস সাকানের ভাগ্যবান পুত্র ছিলেন। তিনিও বুজর্গ পিতার সঙ্গে ওহোদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তার পূর্বে তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ওহোদের দিন এমন বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন যা নজীরবিহীন। তেরটি আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। অবশেষে ১৪তম আঘাতের পর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লোকজন মনে করলো যে, শহীদ হয়ে গেছেন। হুজুরকে (সা) খবর দেয়া হলে তিনি বললেন ঃ "আম্মারাহর (রা) লাশ আমার নিকট আনো।" সাহাবীরা (রা) তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে দৌড় দিলেন। গিয়ে দেখলেন যে, তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। উঠিয়ে এনে হুজুরের (সা) সামনে রাখলেন। কথা বলার শক্তি ছিল না।

হুজুর (সা) তাঁর মাথা নিজের পবিত্র কদমের উপর রাখলেন এবং তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে মহানবীর (সা) পবিত্র পায়ের উপর রেখে জান্নাতের দিকে যাত্রা করলেন।

আল্লাহ ! আল্লাহ !! ভক্তি শ্রদ্ধার এই আবেগ ! সৌভাগ্য কাকে বলে ! শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মাথা রয়েছে মাহবুবের পায়ের ওপর। মাহবুব কে ছিলেন ? ফখরে মওজুদাত মহানবী (সা)।

কতিপয় বর্ণনায় আছে হযরত আম্মারাহ (রা) বিন যিয়াদ বদরের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছিলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত ছা'লাবা (রা) বিন গানমাহ্ আনসারী

খাজরাজ গোত্রের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

ছা'লাবাহ (রা) বিন গানমাহ বিন আদি বিন হানি বিন আমর বিন সওয়াদ বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ।

মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর মদীনার অন্যান্য হকপন্থীর সঙ্গে হজ্জের লক্ষ্যে মক্কা গমন করেন। সে সময়ই বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা (লাইলাতুল উকবা) সংঘটিত হয়। এই বাইয়াতের সময় তিনি রহমতে আলমের (সা) দর্শন লাভ করে নিজের চোখকে আলোকিত করেন এবং তাঁর (সা) বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা ফিরে আসার পর ঈমানী আবেগ এমন ছিল যে, অন্যান্য যুবকের সঙ্গে মিলে স্বগোত্রের মূর্তি ভেঙ্গে বেড়াতেন। চরিতকাররা তাঁর সাথীদের মধ্যে হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় শুভাগমন হলে অন্যান্য আনসারের সঙ্গে হযরত ছা'লাবাও (রা) হুজুরের (সা) কাছে নিজের মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হযরত ছা'লাবা (রা) বদরের যুদ্ধে বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তী বছর তিনি ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। খন্দকের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যোগ দেন এবং এই যুদ্ধেই বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে নিজের জীবনকে হকপথে কুরবানী করে দেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ (রা) আনসারী

(ছাহিবুল আযান)

রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শুভ পদার্পণের কিছুদিন পর মসজিদে নববী নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর মহানবী (সা) একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলেন। জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়ের জন্য সাধারণ মুসলমানকে নামাযের সময়ের কিছু সময় আগে কিভাবে খবর দেয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। হুজুর (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, এই লক্ষ্যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক হবে ? কেউ আরজ করলেন যে, কোন উঁচু স্থানে আগুন জ্বালিয়ে আলো করা যায়। আবার কেউ বা মত দিলেন যে, নামাযের সময় সন্নিকটে হলে মসজিদের ওপর ঝাণ্ডা উঁচু করে দেয়া যায়। অন্য কেউ পরামর্শ দিলেন যে, ইহুদী-খৃষ্টানরা যেমন তাদের ইবাদাতখানায় সিঙ্গা ফুঁকায় তেমনি আমরাও নামাযের ঘোষণার জন্য করতে পারি। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) তাদের কারোর প্রস্তাবের ওপরই মুতমায়েন হলেন না এবং এই প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে তিনি সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। তখনো সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। পরবর্তী দিন খুব ভোরে আনসারী সাহাবী (রা) মহানবীর (সা) নিকট হাজির হলেন এবং এই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! রাতে স্বপ্নে আমার সামনে এক ব্যক্তি এলো। তার হাতে ছিল সিঙ্গা। আমি তাকে বললাম, "হে আল্লাহর বান্দা ! তুমি এই সিঙ্গা বিক্রয় করো ?" সে বললো, "তুমি সিঙ্গা কি করবে ?" আমি বললাম, "আমরা তা বাজিয়ে লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকবো।" সে বললো, "আমি কি তোমাকে এমন বস্তুর কথা বলবো না, যা এই লক্ষ্যে সিঙ্গা বাজানোর পরিবর্তে উত্তম হবে ?" আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই বল।" সে বললো বলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ

www.bjilibrary.com

عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

এই সম্পূর্ণ কালাম বলে সেই ব্যক্তি আমার থেকে কিছুটা পিছু হটে গেল এবং কিছুক্ষণ পর সে বললো ঃ অতপর যখন নামায কায়েম করবে তখন এভাবে ইকামাত বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ [১]

বিশ্বনবী (সা) এই স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, "এটা সত্য স্বপ্ন। ইনশাআল্লাহ ! তুমি বেলালের (রা) সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বাক্যসমূহ রপ্ত করিয়ে দাও। যেসব কালেমা তুমি স্বপ্নে দেখেছ এবং সে আযান দেবে। কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার থেকে উঁচু।" তাঁরা হুজুরের (সা) হুকুম তামিল করলেন এবং সেই দিন থেকে এই আযান কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রীতিতে পরিণত হয়েছে। রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা), যিনি এই মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সা) তাঁর স্বপ্নকে সত্য স্বপ্ন বলে আখ্যায়িত করে চিরকালের জন্য তাঁর ওপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন —তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারী। তিনি এই সম্মানের ভিত্তিতে "ছাহিবুল আযান" উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন।

---

১. এই বর্ণনা সুনানে আবি দাউদ এবং মুসনাদে দারেমী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সহীহাইনে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে, এক হাদীসেও ইকামাতের বাক্য একবারই বলার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নিসায়ী, মুসনাদে দারেমী, সুনানে ইবনে মাজাতে হযরত আবু মাহযুরার (রা) এই বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা) আমাকে ইকামাতের ১৭টি কালেমা শিখিয়েছেন। আল্লাহু আকবার চার বার, আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দু'বার, আশহাদু আনন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাস সালাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাল ফালাহ দু'বার, কাদকামাতিস সালাহ দু'বার, আল্লাহু আকবার দু'বার এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার।

ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম সুফিয়ান ছওরী (র), আবদুল্লাহ বিন মুবারক (র) এবং কুফার অন্যান্য ফকিহ এই মতের ওপরই আমল করেছেন। তাদের মত হলো, যেসব হাদীসে ইকামাতের কালেমা একবার বলার কথা উল্লেখ রয়েছে তা সেই প্রাথমিক যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। সে সময় কেবলমাত্র আযান ও ইকামাতের প্রচলন শুরু হয়েছিল। বেশ কিছুদিন এই কার্যপদ্ধতিই চালু ছিল। কিন্তু সাত-আট বছর পর (অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে) হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর হুজুর (সা) হযরত আবু মাহযুরাহ (রা)-কে আযান এবং ইকামাতের তালকিন দেন। এই তালকিনে তিনি (সা) ইকামাতেও প্রতিটি কালেমা দু' দু'বার বলার শিক্ষা দিলেন। এজন্য পরের নির্দেশ হওয়ার কারণে এই মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদের সম্পর্ক ছিল খাজরাজের হারিছ বিন খাজরাজ খান্দানের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ বিন ছা'লাবা বিন আবদি রাব্বিহি বিন ছা'লাবা বিন যায়েদ বিন হারিছ বিন খাজরাজ।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত নেক ও পবিত্র অন্তরের মানুষ ছিলেন। মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তাঁর কানে হকের দাওয়াত পৌছে। তখন তিনি চিন্তা-ভাবনা না করে মন-প্রাণ দিয়ে তা কবুল করে নেন। নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর হজ্জের মওসুমে মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকবাতে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াতে ধন্য হন।

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলে মসজিদে নববী নির্মাণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) "ছাহিবুল আযান" হওয়ার মহান সম্মানে ভূষিত হন। সুনানে আবি দাউদ এবং মুসনাদে দারেমীতে এই ঘটনা স্বয়ং তাঁর জবানীতে উল্লেখ রয়েছে। তাতে অতিরিক্ত একথাও আছে ঃ [যখন বেলাল (রা) তাঁর তালকিন অনুযায়ী আযান দিয়ে ফেললেন] তখন ওমর (রা) ইবনুল খাত্তাব নিজের ঘর থেকে চাদর হিচড়াতে হিচড়াতে বের হয়ে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক সহ প্রেরণ করেছেন। আমিও তেমন স্বপ্নই দেখেছি যেমন আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ দেখেছেন। প্রিয় নবী (সা) তখন বললেন, "ফালিল্লাহিল হামদু।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিশ্বনবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস জাননিছার ছিলেন এবং হকপথে নিজের জান ও মাল কুরবানী করার অদম্য আকাংখা সবসময়ই তাঁর অন্তরে জাগরুক থাকতো। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে বদর, ওহোদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বীরত্ব দেখিয়েছেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর (সা) হারিছ বিন খাজরাজ কবিলার ঝাণ্ডা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদকে প্রদান করেছিলেন।

বিদায় হজ্জের সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরো একটি মহান সম্মানের অধিকারী হন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, বিদায় হজ্জে বিশ্বনবী (সা) অনেক বকরী লোকদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহও (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন বকরী দেননি। তারপর মহানবী (সা) পবিত্র গোফ কাটালেন। এই গোফের কিছু হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদকে দিলেন। মেহেন্দীতে রঞ্জিত এই পবিত্র গোফ

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহর (রা) জন্য এমন এক নিয়ামত ছিল যে দুনিয়া জাহানের সম্পদ তার সামনে কিছুই ছিল না। তিনি স্বয়ং সারাজীবন এই পবিত্র গোফ নিজের বুকে লাগিয়ে রেখেছিলেন এবং তারপর তাঁর খান্দান এই মহাসম্পদ নিজেদের নিকট বরকত স্বরূপ সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহকে (রা) উদারতা এবং দানশীলতার গুণেও গুণান্বিত করেছিলেন। ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদের নিকট সাধারণ ধরনের মাল-মাত্তা ছিল। তা দিয়ে নিজের ও পরিবার-পরিজনের পেট পালতেন। কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর পথে খরচের সওয়াব ও প্রতিদানের বিষয় জানতে পেলেন নিজের সকল মাল-মাত্তা হকের পথে দান করে দিলেন। তাঁর পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন ছা'লাবাও সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলেন। হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি হাজির হলে বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমার দান কবুল করেছেন। কিন্তু এখন পিতার উত্তরাধিকারের নামে তোমাকে ফেরত দিচ্ছেন —তা গ্রহণ করো।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ৩২ হিজরীতে হযরত ওসমান গনির (রা) শাসনকালে ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর। আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান (রা) নামাযে জানাযা পড়ান এবং এই মহান মর্যাদাবান সাহাবীকে কবরে নামান। মৃত্যুকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রেখে যান।

ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম তিরমিযী (র)-এর নিকট হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদের থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি আযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজর (র) তাহজিবুত তাহজিব গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সাতটি হাদীস স্থান দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু উসায়েদ (রা) আনসারী

নাম ছিল মালিক। আবু উসাইদ কুনিয়াত বা ডাক নাম। তিনি ডাক নামেই প্রসিদ্ধ হন। খাজরাজের বনি সায়েদাহ বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

মালিক (রা) বিন রবিয়াহ বিন বদন বিন আমের বিন আওফ বিন হারিছা বিন আমর বিন খাজরাজ বিন সায়েদা বিন কা'ব বিন খাজরাজ আকবার।

প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন যুবক। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় তাশরীফ নিলে হযরত আবু উসায়েদ (রা) যেন সাতরাজার ধন হাতে পেলেন। নবীর (সা) ফায়েজে খুব করে অভিষিক্ত হলেন। মহানবীকে (সা) খুব ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন এবং সবসময় তাঁর (সা) জন্য জীবন কুরবানী করার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকতেন। সর্বপ্রথম তাঁর তরবারীর চমক প্রদর্শিত হয় বদরের ময়দানে। তারপর ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই জীবন হাতে রেখে লড়াই করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বনু সায়েদার ঝাণ্ডা প্রদান করেছিলেন। বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর তিনি কি করতেন ? চরিত গ্রন্থসমূহ এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। হাঁ, এতটুকুন জানা যায় যে, তিনি ৬০ হিজরীতে পরপারে যাত্রা করেন। সে সময় বয়স ছিল ৭৮ বছর এবং সকল বদরী সাহাবী তাঁর আগেই ওফাত পেয়েছিলেন। যেন তিনি হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষে বা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শেষ সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর ওফাতে বদরের যুদ্ধের শেষ নিশানাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। ওফাতের সময় হামিদ, যোবায়ের, মানযার এবং হামরা নামক চার পুত্র রেখে যান। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও পাওয়া যায়। এসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত সাহাল (রা) বিন সায়াদ, আবু সালমা (রা) এবং ইবরাহীম বিন সালমার (র) নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

[illegible]

১. সহীহ বুখারী (র)

২. সহীহ মুসলিম (র)

৩. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র)

৪. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল (র)

৫. মুসনাদে আবু দাউদ (র)

৬. জামে' তিরমিযী (র)

৭. মুসতাদরাকে হাকিম (র)

৮. সিয়ারে আলামুন নুবলা—হাফেজ জাহাবী (র)

৯. আল মাগাযি—ওয়াকেদী (র)

১০. ফতহুশ শামস—ওয়াকেদী (র)

১১. আত তাবকাতুল কুবরা—ইবনে সায়াদ (র)

১২. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—তাবারি (র)

১৩. আল কামিল—ইবনে আছির (র)

১৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—হাফেজ ইবনে কাছির (র)

১৫. আস সিরাতুন নববীয়া—ইবনে হিশাম (র)

১৬. উসদুল গাব্বাহ—ইবনে আছির (র)

১৭. ফতুহুল বুলদান—বালাজুরি (র)

১৮. আনসাবুল আশরাফ—বালাজুরি (র)

১৯. আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)

২০. আল ইসাবা ফি তামাইয়িযুস সাহাবা (রা)—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

২১. তাহজিবুত তাহজিব—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

২২. আল আখবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী

২৩. দায়েরায়ে মায়ারিফি ইসলামিয়া—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. তারজুমানুস সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র)

২৫. হায়াতুস সাহাবাহ (রা)—মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দুলুভী (র)

২৬. মিশকাতুল মাসাবিহ—শেখ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খতীব উমরি

২৭. সিরাতে কুবরা—মাওলানা আবুল কাসিম রফিক দিলাওয়ারী (র)

www.bjilibrary.com

২৮. আল মাশাহিদ—হাকিম রহমান আলি খান মরহুম

২৯. মুহাজিরিন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শাহ মুয়িনউদ্দীন আহমত নদভী (র)

৩০. সিয়রে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) মাওলানা সাঈদ আনসারি মরহুম

৩১. আল ফারুক—শিবলি নুমানী (র)

৩২. আহলি কিতাব সাহাবা (রা) ওয়া তাবেয়ীন—হাফিজ মুজিবুল্লাহ নদভী (র)

৩৩. সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খণ্ড)—শাহ মুয়িনুদ্দীন আহমদ নদভী (র)

৩৪. উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) মাওলানা আবদুস সালাম নদভী (র)

৩৫. তারিখে ইসলাম—মুনশী গোলাম কাদের ফসিহ মরহুম

৩৬. তারিখে ইসলাম—শাহ মুয়িনদ্দীন আহমদ নদভী (র)

৩৭. রাহমাতুল লিল আলামীন (দ্বিতীয় খণ্ড)—কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানসুরপুরি (র)

www.bjilibrary.com

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ২৫ ১৭ ৩১

বিক্রয় কেন্দ্র
- ১০, আদর্শ পুস্তক বিপনী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
- ৫৫, খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা
- ৪৩, দেওয়ানজী পুকুর লেন, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম